প্রকাশক
শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৫৭

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রী ফণীন্দ্র সাহা

ছেপেছেন
শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন
শ্রী যতীন্দ্র বৈদ্য
গীতা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬৭ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯

বিভূতিরঞ্জন দাশগুপ্ত

পূজনীয়েষু

প্রসঙ্গত

সংগৃহীত হওয়ার আগে এই প্রবন্ধগুলি নানা সাময়িকী বা সংকলনে ছড়িয়ে ছিল। গ্রন্থাকারে সাজিয়ে নেওয়ার সময় তেমন কোনো অদলবদল করিনি। ভয় ছিল রচনাকালীন সেই উৎকণ্ঠা বুঝি খুইয়ে বসব।

প্রবন্ধ রচনা, লিরিকের মতোই, কোনো একটি মুহূর্তের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তা সত্ত্বেও লিরিকে মুহূর্তই যখন প্রধান শর্ত, গদ্যগ্রন্থনায় তাকে বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতেই হয়। এই সংগ্রহে অন্তর্গত অধিকাংশ রচনা কোনো শক্তিশালী মহৎ উপলক্ষের দ্বারা দীক্ষিত। সৃষ্টিধর্মী রচয়িতার চরিতমানসের অভিব্যক্তি ও রূপান্তরের সংগ্রামী সমস্যাই হয়তো বইটির অন্যতম বিভাব। গদ্যে আধারিত এই সমস্ত সন্ধানের যদি কোনো তাৎপর্য আমার কাছে থেকে যায় সে হলো কয়েকটি ধ্রুব বিষয় ও মুহূর্তের আস্বাদন এবং উদ্‌যাপন।

স্বপন মজুমদারের আগ্রহে এ-বই প্রকাশ করা সম্ভব হলো। রচনাগুলির সময়নিরিখ ও সাময়িকীসূত্র এখানে দেওয়া হলো।

১

দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি। এক্ষণ, দান্তে বিশেষ সংখ্যা ১৩৭২

শেক্সপীয়র ও আধুনিক বাংলা কাব্যজিজ্ঞাসা। অমৃত, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭১

ব্লেকের স্বভাব ও কবিস্বভাব। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪

শিল্পাচার্য শিলার। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬

সন্ধিক্ষণের সাধক : ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। যুগান্তর, ভাদ্র ১৩৭১

একটি শতবার্ষিকীর জন্য। পরিচয়, চৈত্র ১৩৭১

উপেন্দ্রকিশোর। অমৃত, ২৬ বৈশাখ ১৩৭০

'আলোর ফুলকি' ও অবনীন্দ্রনাথের গদ্য।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬

সুন্দর ও কার্ল মার্কস। এক্ষণ, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৫

২

ব্রাহ্মমুহূর্তের সন্ধিক্ষণে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ, সংখ্যা ৩-৪

তোমার সৃষ্টির পথ। চতুষ্কোণ, শারদসংকলন ১৩৬৮

কবিতার অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ। একতা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮

উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রায়ণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৪

৩

ভক্তিরসের কবিতা। মানস, শারদসংকলন ১৩৬৮

যুদ্ধ, যুগমুহূর্ত ও আমরা। জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৭০

শ্রোতৃসাযুজ্য। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি আয়োজিত নাট্যোৎসবের

দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মস্কো স্টেট ম্যুজিয়ামে রবীন্দ্রনাথের যে-চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হয়েছিল সেই উপলক্ষে একটি ছবির প্রসঙ্গে কোনো সমালোচক ও কবির কথোপকথনের একটি অংশ :

সমালোচক— আপনার চিত্রাবলির কি কোনোই নাম নেই ?

কবি— কোনো নামই নেই। কোনো নামের কথা আমি আদৌ ভাবতে পারি না। কী ক'রে আমার ছবি বর্ণনা করা যায় সেটা আমার জানা নেই।

সমালোচক— এই পোর্ট্রেট কি দান্তের ?

কবি— না, এটি দান্তের পোর্ট্রেট নয়। গত বছরে জাপান থেকে ফিরবার মুখে স্টিমারে এঁকেছি। আমার খেয়াল আমার লেখনীকে অনুসরণ ক'রে চলেছিল ব'লেই এই ছবিটি এখন আপনাদের সামনে রয়েছে।

কবি-চিত্রী স্বয়ং এ-কথা বললেও ১৯৩২-এ ২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-শিল্প প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ১৩২ সংখ্যক ছবিটির নাম 'দান্তে'। মস্কোতে যে ঐ নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল উদ্যোক্তারা নিশ্চয় সে-খবর জানতেন। এবং ছবির নাম প্রসঙ্গে ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য নিশ্চয় সেই নির্ধারণ অপ্রমাণ করে না :

ছবির নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব · রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নামসৃষ্টি অপরের!

এ-অঙ্গীকার অনৃতকথন না হলেও দ্ব্যর্থদ্যোতক। কবিতার নামকরণ সম্পর্কে মালার্মের সেই কুণ্ঠা রবীন্দ্রনাথের সপ্রতিভ এই সৌজন্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ। নাম শুধু কবিতাকেই নয়, ছবিকেও পরিসরের মধ্যে সংকুচিত করে, তাকে বাড়তে দেয় না। তাছাড়া শিল্পীর রহস্যময় উদ্দেশ্যকেও সে বিকৃত করে। দান্তের যে-কোনো আলেখ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁদের পক্ষে সন্দেহ করবার সুযোগ নেই

রবীন্দ্রচিত্রিত ঐ প্রতিকৃতি দান্তের মুখাবয়বের বিশ্বস্ত সাক্ষ্য। সেক্ষেত্রে ছবিটিতে দান্তের নাম উৎকীর্ণ ক'রে দিলে হয়তো সত্য কথা বলা হতো, কিন্তু সাঙ্কেতিকতার মর্যাদা থাকতো না। শিল্পে-সাহিত্যে সত্যভাষণের প্রাতিভাসিক উপায়টি উদ্দেশ্যের শুধু সমার্থকই নয়, কখনো কখনো অতিশায়ী। রবীন্দ্রনাথ যতোই ভূমা আনন্দ ইত্যাদির অকপট ভাষ্যকার হিসেবে কীর্তিপতাকা বহন করুন না কেন, ছবি ও গানের প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য তাঁর অবমানসের মহা-অজানাকেই নন্দিত করে। রবীন্দ্রনাথের রচিত দান্তেচিত্র তাঁর মনের অনাবিষ্কৃত প্রবণতা ও অভিমুখিতার একটি স্মৃতিধার্য নিদর্শন।

অন্তত সতেরো বছর বয়স থেকেই এই গোপন গঙ্গোত্রীর সূত্রপাত। সেই সময়ে 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫) প্রবন্ধটি যে নিছক আকস্মিক বিস্ময় থেকে রচিত হয়নি, উদ্ধৃতির সাহায্যে সেটি প্রমাণ করা যেতে পারে :

> ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচে। বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন কাব্যের নায়িকা! বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবনকাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে— তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচেরই আরাধনা ; ইহার কিয়দ্দূর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল— তাঁহার মনঃপূত হইল না ; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রিচেকে দূর স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না।

অতিকল্পনার আশ্রয় না নিয়েও এই সিদ্ধান্তে নীত হওয়া সম্ভব, এই পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যমীমাংসার অস্থির সূচনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমত, জীবন ও কবিতাকে একটি অবিভাজ্য রচনাকর্ম হিসেবে গণ্য করার যে-আগ্রহ পরবর্তী কালে তাঁর নন্দনতত্ত্বে অন্যতম উচ্চারণ হয়ে উঠেছে, এখানে তার পূর্বলেখ দেখতে পাওয়া যায়। দুই, প্রদত্ত বিশ্লেষণের শেষ অংশের ঘনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে এটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব যে এখানে জাতক-কবিগুরুর অতৃপ্ত, আত্মবিব্রত, সংগ্রামলাঞ্ছিত মনের উত্তরণের কান্না সংহত হয়ে আছে। অতঃপর এই উত্তেজনার শান্তায়ন (sublimation) ঘটেছে এবং দান্তের কাব্যে কবির

রূপকসন্ধান ও 'ভিটা নুওভা' থেকে তাঁর তর্জমা পর পর পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি নিজেও এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন :

> ১ রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন-একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।
>
> ২ তিনি (বিয়াত্রিচে) রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম।

পবিত্রতা বিষয়ে আমাদের কবি যে কোনো পূর্বসংস্কারের দ্বারা অভিভূত হননি, সে-কথা এর চেয়ে আরো উৎকীর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। অপেক্ষাকৃত উত্তর-কালে অবশ্যই সৌন্দর্যবোধ ও কল্যাণের এই সম্পর্ক ভিন্নতর আকার নিয়েছে। সৌন্দর্য তার নিজের গরজেই মঙ্গলকে আমন্ত্রণ করে, তখনো এ-রকম একটি অভীপ্সা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু এর পরে— সমীক্ষাধর্মী কথাশিল্পের কিছু এবং শেষ পর্যায়ের পদাবলী বাদ দিয়ে অনায়াসেই বলা যায়— সৌন্দর্য আপেক্ষিক একটি পারমিতা এবং তাঁর কবিতার আনুষ্ঠানিক আরম্ভের আগে 'সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ' যখন নিবিড় সমগ্রতায় রবীন্দ্রনাথের মনন অধিকার করেছিল তার প্রেরণা অব্যবহিত শিল্প-সর্বস্ব আন্দোলন থেকে আসেনি, এসেছিল পিছুটানের সংস্পর্শে অবিশ্রাম অতীত পর্যটনের মধ্য দিয়ে এসে অবশেষে রোমান্টিকতার পুনরুত্থান যুগের মন্ত্রণায়। দান্তে, যিনি 'তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত ইউরোপমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন' এবং বয়ঃক্রমে অত্যন্ত কনিষ্ঠ গ্যেটে, যিনি 'নাটক লিখিয়া মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে ইউরোপ-মণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন'— তাঁরা সেই ভ্রাম্যমাণ কবির কাছে অতীত ও আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম দুই যোজক। প্রসঙ্গত আরো একজন তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিলেন : পেত্রার্কা। তিনজনেই সম্ভবত এক-এক অর্থে আধুনিক কালের আপেক্ষিক বোধের প্রবর্তক। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য তথ্য, এই তিনজনের মধ্যে দান্তে তুলনান্বিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কখনো তিনি লক্ষ্য করেছেন পেত্রার্কার সঙ্গে দান্তের 'অনেক বিষয়ে··· সৌসাদৃশ্য ছিল' (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫); কখনো আরো গভীর সাদৃশ্যের সন্ধানে বলেছেন :

গ্যেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পেত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎ কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ্য করেন— যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গ্যেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে নিজ হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রিচের প্রতি অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারো মুখে সাজিত না। (ভারতী, কার্তিক ১২৮৫)

নাটক ও কবিতার প্রাকরণিক এই পার্থক্যনির্দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে দোলাচলে বিচলিত কবিসত্তার অভিক্ষেপ।

কবিকিশোরের অপরিণত মনের দ্বারা দান্তে ও গ্যেটের দ্বৈতত্বের এই নির্ধারণ নিঃসন্দেহে সেই মনেই নির্মীয়মাণ কার্যক্রম আভাসিত করছে। বাস্তব ঘটনাকে আদর্শ জগতে উন্নীত করবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রহৃদয়ের আরব্ধ দায়িত্ব যার পরিপ্রেক্ষিতে এই তুলনা অর্থময়।

বাংলা ভাষায় দান্তের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাণিত বোধ করেছিলেন। ইংরেজির মধ্যস্থতায় এই অসম্পূর্ণ ভাষান্তর সাধিত হয়েছিল ব'লে এক সময়ে তিনি পরিতাপ করেছেন, **'When I was young I tried to approah Dante, unfortunately through an English translation, I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.'** কিন্তু এই শোচনা শিল্পনিপুণ ছদ্মভাষণ। যদিও তাঁর সামগ্রিক কৃতিত্বের পাশে দান্তে তর্জমার দৃষ্টান্ত এমন-কিছু অবিস্মরণীয় নয়, এবং সেই কাজ বিশেষত বাল্যকালেই সম্পন্ন, তবু এর এমন একটি তির্যক সার্থকতা আছে যা উপেক্ষণীয় নয়। আক্ষর অনুবাদের একটি অংশ :

জীবনের মধ্য পথে দেখিনু সহসা
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কি ভীষণ অতি দারুণ গহন
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক।

অতঃপর যখন লিখলেন :

আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
... ...
আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে
দেখিতে না পাই—
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায় ফুল ফোটে ৺
পথ জানি নাই। ('নিশীথজগৎ', ছবি ও গান)

তখন বোঝা গেল দিভিনা কম্মেদিয়া থেকে নিছক পুনরনুবাদ তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। আত্মপ্রতিকৃতির প্রয়োজনেই দান্তের আঁকা নরকনিসর্গ তিনি আবার আরেক রঙে আঁকতে চেয়েছেন, যেখানে নিজেই তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

২

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের আবহে দান্তের আবির্ভাব প্রকাশ্যে প্রবলরূপে অভিনন্দিত হয়নি। শেক্সপীয়রের প্রেরণায় প্রথা ভেঙেছিলেন গ্যেটে এবং আমাদের ইয়ং বেঙ্গলের দ্রোহদর্পণে Sturm und Drang-এর ঝোড়ো হাওয়ার শ্বাসবাষ্প নিশ্চয় লেগেছিল। এরি মধ্যে দান্তের জন্য একটি প্রত্যাশাভূমি গঠিত হচ্ছিল। 'চির অস্থির উদাত্ত এক শান্তি / যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে' (বিষ্ণু দে)—গত শতকের ক্রান্তিক্ষণে ঝড়তুফানের মধ্যেও কেউ কেউ আত্মস্থতার আর্তিতে দান্তের দিকে তাকিয়ে বিবেকের তানপুরা বেঁধে নিচ্ছিলেন। মধুসূদন 'কবিগুরু দান্তে'কে নিয়ে যে-স্তব লিখেছিলেন তার মৌলতা একই বিষয়ে টেনিসনের প্রণীত কষ্টকল্পিত স্তুতির বৈষম্যে অনুভব করা যায়। ভিক্টোরীয় রাজকবির সাত লাইনের পদ্যপ্রস্তাবটি— কবির স্বীকৃতি অনুযায়ী— 'written at the request of Florentines' এবং তাতে শেষ দু-ছত্রে অভিনীত বিনয়ের প্রদর্শন থাকলেও অন্তরঙ্গ দৃষ্টির অভাব ছিল। কিন্তু মধুসূদন দান্তেকে স্বরচিত কবিতার পটভূমিতে প্রাসঙ্গিক ব'লে উপলব্ধি করেছিলেন :

নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।

জানিনা, শেলিং দান্তে সম্বন্ধে যে-সমীক্ষণ করেছিলেন, এই চতুর্দশপদী লিখবার মুহূর্তে মধুসূদন সে-সম্পর্কে জাগর ছিলেন কিনা। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, ইনফের্নোর তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীত চিত্রকল্প তিনি সনেটে সংহত করবার আগেই মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে তাঁর অভ্রান্ত তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন :

আগ্নেয় অক্ষরে লেখা, দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে— 'এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখভোগে—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

রবীন্দ্রনাথ— যিনি বারংবার মধুসূদনের অন্যমেরুর কবি ব'লে কীর্তিত— যে-অনুবাদ করেছেন, মধুসূদনের প্রভাবে নিমজ্জিত :

দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে ;
মোর মধ্য দিয়া যাও চির-দুঃখভোগে ;—
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে।
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের।
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত—
অনন্ত-পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্তকাল দহিতেছি আমি।
'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের মাইকেলমনস্কতার উচ্চারিত ও আভ্যন্তর অভিজ্ঞান। ইতিপূর্বে 'ছবি ও গান' থেকে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে মধুসূদনের 'নাহি ডাকে পাখী / নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে / না ফোটে কুসুমাবলী বনসুশোভিনী'র আন্তর আত্মীয়তা স্পষ্ট। সন্দেহ নেই, মধুসূদনের দ্রঢ়িষ্ঠ নৈরাশ্য উদীয়মান উত্তরসূরীর হাতে অবারিত বিষাদ ও প্রার্থিত আশাবাদের মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। সদ্যপ্রদত্ত দুটি উদ্ধৃতি দুই কবির এই সম্পর্ক বিশদ ক'রে দেয়। রবীন্দ্রনাথ দান্তেঅনুবাদ-কালে মধুসূদনের একটা গোটা লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছেন ব'লেই নয়, এ-কথা মনে করবার সংগত কারণ আছে, পূর্বসূরীর কবিতার প্রচ্ছন্ন অনুষঙ্গ মেলে ধ'রে সেই অনিবার্য প্রভাবকে ব্যবহার করছেন। অতঃপর সচেতন হয়ে তিনি তাঁর উপরে মাইকেলের ঐ প্রভাব অস্বীকার করতে চেয়েছেন, কিন্তু ততোক্ষণে স্বকীয় কবিতার মর্মে সেটি অনুস্যূত হয়ে গিয়েছে। আরো দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করা যায়:

১ অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে ! (অষ্টম সর্গ)

২ কবি বর্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া একস্থানে লইয়া গেলেন— সেখানে— দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—

তারকা অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার
করতালি— কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চারিদিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণুসম ফিরিছে সতত ! (রবীন্দ্রকৃত তর্জমা)

কড়ি ও কোমলে সমন্বিত মধুসূদনের প্রতিভা যেখানে মুহূর্তের পরিসরে প্রলয়শঙ্খ বাজিয়ে দিতে পেরেছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাবর্ণনাধর্মী যন্ত্রণায় সেই মহিমা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু, শুদ্ধ অনুভবের সরলীকরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নন্দন-জিজ্ঞাসার বৈপ্লবিক যে-পরিচয় এখানে লুকিয়ে আছে সেটি হলো অন্তর্বিক্ষোভকে

চূর্ণ-চূর্ণ ক'রে অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে তাকে জানা এবং পরিশেষে তার ভিতর থেকে দর্শকের ভঙ্গিতে বিবিক্ত হওয়া। যাঁরা মিলটনের সঙ্গে মাইকেলের সগোত্রতার তদন্তে তৎপর তাঁদের কাছে প্যারাডাইস লস্ট বিষয়ে জনসনের বক্তব্য আপত্তিকর হলেও পুনর্বার বিবেচ্য ব'লে মনে হয়। মিলটনের মানব মানবীরা সকলেই স্বীয় সন্তাপের মধ্যে অবরুদ্ধ— একজনের পক্ষে আরেকজনের যন্ত্রণাময় অবস্থান পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়; পাঠকের পক্ষেও পারাপারের সহানুভব-সেতুটি খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই— জনসনের এই নিরীক্ষণ অন্তত অংশত সত্য। মধুসূদনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তো অপেক্ষাকৃত অনেকবেশি সত্য। মধুসূদন তাঁর মিলিত নরনারীর সুখদুঃখের সঙ্গে একান্ত জড়িত, তাদের জন্য সমবেদনায় আর্ত। এখানেই মিলটনের সঙ্গে তাঁর মানসিকতার ব্যবধান যোজনব্যাপী। রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব-উপন্যাসের জনক, সহানুভূতির (sympathy) চেয়েও সমানুভূতি (empathy) আশ্রয় করেছিলেন। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই অজস্র বস্তু-বিভাব (objective correlative) ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্রসৃষ্টি ক'রেই সেই বিভাবগুলিতে প্রাণময়তা এনেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে ক্রমশ যতোই অনাত্ম-অহং বা anti-self কার্যকরী হয়েছে, মধুসূদন ততোই আত্ম-স্বরূপের কাছে বিষণ্ণভাবে ধরা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বেদনাকে সুন্দর আধারে সুরক্ষিত করতে পেরেছিলেন ব'লে যিনি ব্যক্তিগত বেদনাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথের অবচেতন প্রলোভন এবং দুর্দমনীয় সংস্কার মধুসূদন। দান্তের কাছে মধুসূদন গোপনে পাঠ নিয়েছিলেন। দান্তের কবিতার ভাবাসঙ্গ ও চরিত্রায়ণ তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাই কেরন আর অ্যাকেরন হয়ে উঠেছে কৃতান্তচর ও বৈতরণী নদী। দান্তে অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার আগে দেখেছিলেন উতরোল গঙ্গায় মধ্যদিনের সূর্য। কিন্তু দান্তের কবিতার ঐ ভারতীয়তা মধুসূদনকে ততোটা আলোড়িত করেনি যতোটা দিভিনা কম্মেদিয়ার পাপ ও প্রতিবিধানের ধারণা! বঙ্কিমচন্দ্র যখন শৈবলিনীকে শাস্তি দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'শৈবলিনী দেখিল সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই— দুকূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে' তখন ইনফের্নোতে বর্ণিত ফ্লেগেথনের ছবি তাঁর মনে ছিল। এবং বঙ্কিমের বর্ণনার প্রেরণা মধুসূদন, যিনি পাপপুণ্যের অনেক চিত্রকল্প দান্তের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় কবি দান্তে এবং আধুনিক যুগের খৃষ্টীয় কবি মধুসূদনের পাপ-

বোধের প্রকৃতি এক ছিল না। কিন্তু দুজনেই পাপের সঙ্গে সৌন্দর্যের রহস্যময় যোগাযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। দান্তের নরক যতো সুন্দর স্বর্গ তার কাছে নিষ্প্রভ এবং মধুসূদনের চিত্রিত নরকেও 'দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসন্ত'।

পাপের মধ্য থেকে যে-সুন্দরের জন্ম পরিশীলনের মধ্য দিয়ে মহাসুন্দরে তার স্খালন হতে পারে। লৌকিক কবিতা এবং ত্রুবাদুর বাউলদের সঙ্গে পরিচিত দান্তে সে-কথা জানতেন। তাই তাঁর অন্তিম সুন্দর জ্যোতির্ময় স্বর্গীয় গোলাপের প্রতীক ও সংজ্ঞায় উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের কবিতায় অকল্যাণের অসিত আবহ উদ্‌ঘাটিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। মানসীতে এই প্রবণতা শেষবারের মতো প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথের দান্তে দ্বন্দ্বজটিল উত্তরণের শিক্ষক। এই দ্বন্দ্ব মধুসূদনের চেয়েও জটিল, কেননা মধুসূদন স্বচ্ছতার প্রয়োজনে বিসংবাদী বৃত্তিগুলিকে ঐহিক পরিসীমার ভিতরে সংকুচিত ক'রে তুলেছিলেন, বিচিত্রের সমবায়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পারমার্থিক-মরমী ঐক্যের অনুশীলন করেননি।

এই সমস্যার সাহায্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর শোচনীয় অখ্যাতির অন্ধকার থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়। তাঁকে আমরা সাধারণভাবে জানি বিদ্রূপক্ষম এবং বিদ্রূপার্হ একজন পদ্যকর্তার ভূমিকায় যিনি মধুসূদনের আলোয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছায়াময়ী উনিশ শতককে তার বহিরাশ্রয়িতা থেকে অন্তর্জগতের অনিকেত পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করেছিল। গত শতকের প্রথম তিন দশকে ইংল্যাণ্ডে দান্তের যে-পুনঃপ্রবর্তনা ঘটেছিল, ছায়াময়ীতে সমালোচক হরেন্দ্রমোহন তারি ছায়া লক্ষ্য করেছেন। ভারতীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আত্মিক গবেষণাগুলির ফলশ্রুতিসত্ত্বেও ছায়াময়ী ভূতুড়ে গল্পের মতো এবং কবিতার চাহিদা মেটাতে অক্ষম ; বরং এরি দু-বছর আগে দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা 'স্বপ্নপ্রয়াণে' দান্তেসংস্পর্শ আরো সার্থক—সমালোচকের এই সমস্ত নিরূপণ মেনে নিয়েও এই কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রতিহত মানসের অসংখ্য সঞ্চারী সম্ভাবনা চোখে পড়ে। দিভিনা কম্মেদিয়া হেমচন্দ্রের কাছে 'অদ্বিতীয় কাব্য'। দান্তের 'ভাবের রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ' করেছেন তিনি। পাওলো-ফ্রাঞ্চেস্কার কুটিল সমর্পণের রক্তিম রূপকথা অথবা মাতেল্‌দার নিবেদিত সারল্যের টানাপোড়েনে দান্তের ভাবের যে-রচনাপ্রণালী গ'ড়ে উঠেছিল হেমচন্দ্রের লেখায় তার আভাসমাত্র নেই। সাতটি পল্লবে সম্পূর্ণ এই কাব্যের অনেকগুলি পল্লবই জীর্ণ হয়ে এসেছে। শুধু রচনাদোষে নয়, দান্তের কবিতায় সর্গ থেকে সর্গে অনুভূতির বিন্যাসে বিজ্ঞানসম্মত যে-বিবর্তন

পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে সেই ভাবক্রম ধরতে পারেননি ব'লে হেমচন্দ্রের পরাভব ঘটেছে। কিন্তু নরকচিত্রণে উৎসাহী হেমচন্দ্র আত্মার পরিবেশ রচনার সামর্থ্য দেখিয়েছেন :

১ প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণি রব, একত্র মিলিছে সব,
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।
নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে।
পত্র ঝর-ঝর স্বরে, সর্বদিক পূর্ণ করে,
তেমনি অস্ফুটনাদ. ঘন স্বর সবিষাদ।
বহে স্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

২ না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত শীর্ণকায়া সেই সব জীব-ছায়া
নিশ্চল—নির্বাক—যেন ভুজঙ্গ তুষারে।

এবং স্বর্গপথে বেয়াত্রিচের প্রতিরূপ—

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী
কিরণের রেখা-মত শোভা করি নীল পথ
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি
... ...
গগনের সেই দেশে যেখানে নক্ষত্রদেশে
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।

এইসব বিচ্ছুরিত সমারোহের মধ্যে থেকে থেকে আছে ভাবগত ছন্দপতন এবং সবশেষে 'ওড্ টু দি নাইটিঙ্গেলে'র স্বপ্নজাগর, হতচকিত চিত্তাবস্থার প্রতিধ্বনি। মনে রাখা আবশ্যক, কীট্‌সে এই অবরোহণ রোমান্টিক কবিতার প্রতি অন্যান্যের মতো হেমচন্দ্রেরও আসক্তি প্রমাণ করে। রোমান্টিক মনস্তাপের মধ্যেই হেমচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং তারি মধ্যে হঠাৎ কখন সত্তার উত্থানপতনের বৃত্তান্তটি একাকার হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। প্রাচীন বিশ্বপরিক্রমার শেষে উনিশ শতকের রোমান্টিকদের কাছেই থেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে সেই রোমান্টিকতা পুনর্জাত হয়েছিল। রোমান্টিক কবিতাকে হেমচন্দ্র ভালোবেসেও এই কারণে বিশ্বাস করতে পারেননি যে তার সহায়তায় ভাবীভাষণ চললেও

যুগ, সভ্যতা বা সমাজের চেহারা পাল্টে দেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ স্থির ক'রে নিয়েছিলেন শুধুমাত্র আত্মসংস্কৃতিই তাঁর উদ্দিষ্ট। তাই হেমচন্দ্রের মতো ব্যবহারিক উচ্চাশার কবলে কবিতাকে অসাড় পঙ্গু না ক'রে তিনি তাঁর রোমান্টিকতাকে ব্যক্তিত্বের পুনর্বিন্যাসের দিকে সঞ্চালিত করেছিলেন। রোমান্টিক কাব্যাদর্শ তাঁকে শিখিয়েছিল সম্পূর্ণ নিজের মতো হতে এবং তারপর তিনি নিজেকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। সেখানে, অর্থাৎ আত্মবিদারী অস্তিত্বের বিশাল মানচিত্র খুলে ধরার বেগবন্ত প্রক্রিয়ায় দান্তের সঙ্গে তার সাদৃশ্য তুচ্ছ করবার মতো নয়। দুজনের জীবনই প্রতীকনাট্যের প্রধান চরিত্র। ঐ নাটক শেষ হয়েছে দুজনেই যেখানে চরিত্র থেকে সূত্রধারের ভূমিকায় স'রে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন :

> একি রহস্য একি আনন্দ নূতন ভুবন জুড়ে
> মহান্ বৃত্ত— দিব্য প্রতিমা তারি পরে সমাসীন,
> ডানা মেলে নয়, উত্তরণের সৌরশিখরচূড়ে
> এসেছি সহসা রৌদ্রাভিসারে, দেখেছি অন্তহীন
> আবর্তরত আলোকচক্র নিহিত বহতা ধারা
> অন্তরে সুধা সঞ্চিত ক'রে দিগন্তে বিস্তৃত
> প্রেমের মন্ত্রে চলে চরাচর সূর্য চন্দ্র তারা।

গীতাঞ্জলিকে এজ্‌রা পাউণ্ড 'পারাদিসো'র সঙ্গে তুলনা কেন করেছিলেন তার যুক্তি এখানেই।

৩

> মহাভারতের তুলনায় দান্তের পটভূমি ছোট ; কমেদিয়ার ভাবনা বেদনা শ্লেষ ধিক্কার আগুন ও গভীরতা সত্ত্বেও আমায় মনে হয় একটা প্রায় অনিঃশেষ ক্রন্দসীকে আলিঙ্গন করে মহাভারত বেশি গভীর। কিন্তু দান্তে সময়ের দিক দিয়ে আমাদের ঢের নিকটে। ঠিক আধুনিক পৃথিবীতে বাস না করলেও আধুনিক ভাবপৃথিবীর (সব দিকের নয়, খুব কম দিকের নয় তবুও) পিতা হবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল।
>
> —জীবনানন্দ দাশ, 'কি হিসেবে শাশ্বত', কবিতার কথা।

এই পর্যন্ত ব'লেও 'কালপ্রবাহী দান্তের অমরতা সম্পর্কে জীবনানন্দ অনুযোগ উত্থাপন করেছেন, তাঁর কাব্যে তখনকার ইতালীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের

ঘনঘটা বড়ো বেশি। 'উপলব্ধি প্রকাশের অদ্বিতীয় পদ্ধতি— যা আদি আধার ও আধারের মিলনীদেশের অনির্বচনীয় সত্যেরই সামিল প্রায়— সে রকম স্থান হিসেবে তাঁর কাব্য বেঁচে রয়েছে', জীবনানন্দের এই উচ্চারণ গূঢ়ার্থজ্ঞাপক। দান্তে কোনো বিরাট তত্ত্ব দিয়ে গেছেন ব'লেই যে তিনি মহাকবি তা নয়। তা যদি হতো তাহলে তাঁর চিন্তাবস্তুর জন্য টমাস অ্যাকুয়েনাস প্রমুখ মনস্বীকেই কৃতজ্ঞতা জানালে চলত। কিন্তু পাপ-অপাপ, প্রেম-অপ্রেম, আলো-অন্ধকার, উপায়-উদ্দেশ্যকে দান্তে সতেজ নতুনত্ব নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখেছিলেন এবং কবিতার প্রকরণকে তার বিষয়বস্তুর উৎস ও মোহানার সঙ্গে সমীকৃত ক'রে দিতে পেরেছিলেন। বিষয়ের অত্যন্ত কাছে কণ্ঠস্বরকে সন্নিবেশিত করার ক্ষমতা ছিলো তাঁর। আমরা জীবনানন্দে এই ক্ষমতা দেখেছি, যদিও তাঁর কবিতায় দান্তের চেয়েও শেক্সপীয়রের অভিঘাত প্রচুরতর। 'সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর/ নিষ্পেষিত মনুষ্যতার আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ/ ভাবা যাক, ভাবা যাক/ ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি/ ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত/ শত জলঝর্ণার ধ্বনি'— একটানা এই সংলাপে 'পুর্গাতোরিও'র (২৮।৮৫-৯৩ , ১২১-৩০) নিলীন ভাবনা খনন ক'রে তাঁর উপরে হয়তো দান্তের প্রগাঢ় প্রভাব আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু আত্মপ্রশ্ন ও দৃপ্ত প্রতীতির সমীকরণে জীবনানন্দ আঙ্গিক ও প্রসঙ্গকে যে-রকম কাছাকাছি এনেছেন সেখানে দান্তের প্রবর্তনা অনুসন্ধান করলেই পরিশ্রম সফল হবে ব'লে মনে হয়।

'অন্ধকারে সবচেয়ে সে শরণ ভালো/ যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গম্ভীর-ভাবে আলো'। দান্তে দেখিয়েছেন প্রজ্ঞান ও প্রেম জাগলে আলো ভাস্বরতায় অজস্রগুণ বেড়ে যায়। প্রজ্ঞান-প্রেম-আলোর পারস্পরিক এই সম্পর্ক দান্তের কবিতার প্রধান আকর্ষণ। দান্তে যখন বেয়াত্রিচেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরব্ধ প্রতিজ্ঞাগুলি যদি চরিতার্থ না হয়, মহৎ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই অপরাধের ক্ষতিপূরণ সম্ভব কিনা। বেয়াত্রিচে উত্তর দেবার আগে অমল সৌন্দর্যে দিগ্বিদিক আলো ক'রে তাঁকে নিরস্ত করলেন। কবিজীবনের প্রান্তিক উৎসর্গে জীবনানন্দও সেই নিরুত্তর আলোকবর্তিকার কাছে আনত হয়েছেন :

> মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
> মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
> লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
> দেহ হবে মন হবে— তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

শেক্সপীয়র ও আধুনিক বাংলা কাব্যজিজ্ঞাসা

'বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার মধ্যে শেক্সপীয়র সর্বপ্রধান।' ১৮৭৮-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই উক্তি করেছিলেন। ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই কেরী এবং তাঁর সতীর্থ-মণ্ডলী অনুভব করেছিলেন, ঈসপের মতো সদুক্তিতৃপ্ত লেখককেই নয়, শেক্সপীয়রের বক্রোক্তিজীবিত কবিতাকেও বাংলা ভাষায় অঙ্গীকার ক'রে নিতে হবে। তাঁদের সেই অভীপ্সামুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত শেক্সপীয়র নামক সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশের মতো বাংলাদেশও বারংবার আবর্তন করেছে। এবং স্বভাবতই বাংলা কাব্যেও সেই পৌনঃপুনিক আহ্নিক-অয়নের পুঞ্জিত অভিঘাত রয়ে গিয়েছে।

আমরা সেই প্রেরণার প্রথম দিন থেকেই শেক্সপীয়রকে ভালোবেসেছি। সেই ভালোবাসায় বোধকরি তখনো অনিশ্চিত মোহের চেয়েও গার্হস্থ্য বিবাহময়তা কিছু বেশি পরিমাণে কাজ করেছিল। তাই রোমিও-জুলিয়েট নলিনী-বসন্তের প্রাক্-দাম্পত্য সংস্করণে মেদুর এবং মার্চেণ্ট অব ভেনিস ভানুমতী-চিত্তবিলাসের প্রহসনে আসক্ত মসৃণ হতে পেরেছিল। যদি কোনো তুলনাশিকারী জর্মন কবিতায় শেক্সপীয়রের নববর্ষা পাশাপাশি আনতে চান, তাঁর সাদৃশ্যের মৃগয়া অচিরেই হয়তো ভ্রমাত্মক ব'লে প্রতিপন্ন হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো সুখদ ভ্রান্তিবিলাসে তিনি অপরূপভাবে আশ্রিত হতেও পারেন। জর্মন কবিরা একদিন পাগলের মতো শেক্সপীয়র তর্জমা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। সেই যুগক্রান্তির ভালোবাসায় বিচক্ষণতার অভাব ছিল, কিন্তু অভিযুক্ত ভুল মূল্যায়নের মুদ্রাদোষের ভিতরে ক্রমশই সৌন্দর্য ধরেছিল এবং এক ধরনের কৌণিক স্বজ্ঞা এসে গিয়েছিল। এখানে মনে রাখা দরকার কোনো সেণ্টসবিউরি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এসে শেক্সপীয়রকে ভুলভাবে ভালোবাসার জন্য আমাদের দায়রা সোপর্দ করেননি, এবং আমাদের মধ্যে কোনো শ্লেগেলও ঐ ভালোবাসায় পরিমিতিবোধ রয়েছে ব'লে আত্মপ্রতীতি অনুভব করেননি। তবু এইসব নঙর্থক অনুষঙ্গ মনে রেখেও বলব: বাংলাদেশের কাব্যসমীক্ষায় শেক্সপীয়রের প্রতিফলন ঘটেনি, প্রতিসরণ ফ'লে উঠেছে স্বগত-হৃদয়ের শুদ্ধ অথবা শ্যামচ্ছায়াসান্দ্র অনুরূপ কোনো ঘিরে-রাখা জলাধারে।

এ-কথা অবশ্যই মনে করার সংগত কারণ নেই যে একজন পেলব শেক্সপীয়রকেই আমরা প্রবণতা অনুযায়ী বেছে নিয়েছিলাম। নির্বিঘ্ন উদাসীন অথবা বিধাতার মতো প্রতিবিধানপরায়ণ শেক্সপীয়রকেই আমাদের চোখে নিষ্ঠুর অথচ অতিথি নূতন লেগেছিল। কিন্তু সেই আত্মবিস্মৃত নির্মম দেবতাকে ঘরে আনবার মুহূর্তে আমরা নিজেদের সৌকুমার্যদোষে তাঁকে মমতার মুকুট পরিয়েছি। শেক্সপীয়র তর্জমার বৃত্তান্ত যদি কেউ রোমন্থন করেন দেখতে পাবেন বাংলা ভাষায় 'ম্যাকবেথ' অনূদিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কতো যে গৌণ কবি ঐ রক্তিম উচ্চাশায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। গিরিশচন্দ্রের আগে থেকে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রচেষ্টা পর্যন্ত কালক্রমিক একটা সংখ্যালেখ্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে অসংখ্য হরলাল রায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা নগেন্দ্রনাথ বসুর শ্রমসাধ্য অথচ শ্রদ্ধেয় ব্যর্থতা ঐ নাটকখানিকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

কিন্তু ভাষার অভাবই কবির প্রধান অভাব। মধুসূদন দত্ত সেই কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন এবং শেক্সপীয়রকে একজন প্রয়োগনিপুণ ভাষাচার্য ব'লে তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিতে উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য ডক্টর জনসনের এই উপদেশটিকেই স্বর্ণাক্ষরে প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক দেশের একটি নিজস্ব ভাষায়তন (a certain mode of phraseology) আছে, আর প্রতিদিনের লোকায়তন থেকেই তার শব্দশরীরটিকে আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে। জনসন ঐ ব্যবহার্য ভাষাকে লাবণ্যশাণিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং শেক্সপীয়রকে তাঁর ঈপ্সিত ঐ আদর্শ ভাষার উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করেছিলেন। মধুসূদন জনসনের বাক্য উদ্ধৃত ক'রে পরক্ষণে বলেছেন : This advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction and that will be in the more tragic parts of the play—সন্দেহ হয় মধুসূদন এই মন্ত্রচালিত উচ্চারণের আগে একবারো ভাবেননি কার প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে আরেকভাবে সাজিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছিলেন, কেননা, তাঁর অভীষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত অলঙ্কৃতি অথবা সমুচ্চকথনের কম্বুকণ্ঠও শেক্সপীয়রের মধ্যেই আছে, তার সন্ধানে অন্যতর স্রষ্টার কাছে যেতে হয় না।

গল্পশিল্পীরা কিন্তু অবিলম্বে সে-কথা বুঝেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে পরিচ্ছেদের শিরোধার্য শেক্সপীয়রীয় উদ্ধৃতিগুলি নিঃসন্দেহে গাঢ়

পরিবেশ রচনার প্রয়োজনে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর অন্তিম পর্যায়ের উপন্যাসে নায়িকার ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য আঁকতে গিয়ে তিনি ও-রকম বাইরে থেকে উক্তি জ্ঞাপন করেননি, ঈষৎ ভিতরে গিয়ে অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রার রাত্রিখচিত সমারোহ সজোরে মুদ্রিত ক'রে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে গীতিসর্বস্ব আপাত-অনভিজ্ঞ স্বভাবী কবিটির বিষয়ে চূড়ান্ত নিশ্চেতন ছিলেন সেই বিহারীলালও অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রার চিরপরিচিত রূপবর্ণনায় অকপট প্রতিধ্বনি তুলতে পেরেছিলেন :

আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে ;
চিরদিন সুর-কুসুম অনুপ
সমান নূতন ফুটিয়া রবে।

তাঁর বঙ্গসুন্দরীর তৃতীয় সর্গ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করলাম। এই সর্গের গোড়াতেই কবি কালিদাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কালিদাস এবং শেক্সপীয়রের এই সমাহার চেষ্টা সম্পর্কে দু-একটি অনুমান আরোপ করার সুযোগ নিলে তবেই পর্যালোচনার পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারবো। সুতরাং এই সমন্বয়-প্রবণতার মনস্তত্ত্বটি ঈষৎ বিশ্লেষণ করতে চাই।

মধুসূদন তাঁর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কালিদাস এবং কীট্সের পংক্তিপ্রবাহ ব্যবহার করেছেন, সে শুধু প্রধানত পরিমণ্ডল রচনার প্রয়োজনে। তাঁর আগ্রহ ছিলো দৃশ্যমূর্তনে। বিহারীলাল দৃশ্যরচনায় অনিপুণ হলেও তাঁর হাতে এক এক সময় প্রত্যক্ষধর্মী ছবি যে আঁকা হয়ে গেছে—'সহসা প্রগাঢ় মেঘ ব্যাপিল অম্বরতলে' প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহ অমূর্তন। তাঁর অমূর্তন কখনো কখনো অনচ্ছ ভাবোচ্ছ্বাসে বিগলিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সফলক্ষেত্রে মগ্ন আবেদন রচনা করেছে। যদি বলি সেইসব জায়গা 'ভারতীয়তা' ব'লে কথিত ধ্যানধারণারই অভিক্ষেপ, অনৃতায়ন হবে না। সদ্য আগে উদ্ধৃত চার ছত্রে কি সেই মূর্ত-অমূর্তের বৈদ্যুতিক সন্নিবেশ ঘ'টে যায়নি।

শেক্সপীয়রের ভিতরেই এক ধরনের বিবিক্ত চেতনা কাজ করছে, রবীন্দ্রনাথ এভাবেই তাঁকে বুঝেছিলেন। তা না হলে 'রাজা' নাটকের কেন্দ্রগ তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে সি. এফ. এণ্ডরুজকে বলতেন না :

The human soul has its inner drama which is just the same as anything else that concerns Man and Sudarsana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature.

অবচ্ছিন্ন অন্তর্জীবনের এই রূপকটিই তাঁর ভাষায় 'বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্য' লাভ ক'রে মূর্ত শরীর নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের ঐ রহস্যময়, দুরবগাহ ব্যক্তিসত্তার উপর জোর দিলেন বা মূর্তকে অমূর্ত এবং অমূর্তকে মূর্ত ক'রে : 'শেক্সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এইজন্য যে, সেটা তাঁর অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মত-পাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এইজন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।'

শেক্সপীয়রের রচিত চরিত্রে, কিংবা সমগ্রভাবে নাটকে, অন্তর্জীবনের সেই গুহাহিত আত্মগত রূপটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিতায় বাংলা কাব্যেও সংক্রমিত হলো। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, উনিশ শতকে শেক্সপীয়র-সমালোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে মুখ্যতম প্রবণতা দেখতে পাই তাঁর নাটকের স্বগতোক্তির উপর মনঃসম্পাত। তাঁর অধিকাংশ নাটকের সমূহ সলিলকি স্বতন্ত্র মনোযোগে পড়া হতে লাগলো ব'লেই ব্রাউনিঙের নাটকীয় মনোকথন (dramatic monologue) এবং টেনিসনের মনোনাট্য (monodrama) উদ্ভূত হলো। ঐ মনোকথনগুলিতে আসলে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ রূপায়িত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটিকাগুলিতে যে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিকোণের বিন্যাস দেখতে পাই, সে-জন্য ব্রাউনিঙকে অগ্রসূরী বললে শেক্সপীয়রকেও অগ্রগণ্যতা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জনে'র শেক্সপীয়র-সর্বস্বতা থেকে রাজা-ডাকঘর-অচলায়তনের অর্জিত স্বকীয়তায় পৌছুতে গিয়ে যে সংযোজক কর্ণকুন্তীসংবাদ-গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি নাটিকাগুচ্ছ পাই সেটিও মূলত শেক্সপীয়রপ্রেরিত সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতায় দৃষ্টিকোণের বিন্যাসে কি একই অর্থে শেক্সপীয়রীয়তা দৃষ্টিগোচর ? এক ও অনেক শেক্সপীয়র, অনেক ও এক রবীন্দ্রনাথ। প্রথমোক্ত কবিতে একটি উৎস অজস্র কৌটিল্যে বিচ্ছুরিত ; শেষোক্ত কবিকে বলতে

হয়েছে 'একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের নর্মবাঁশি'। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী কবিরাও কি বিচিত্র এবং একের মধ্যে নিরন্তর আন্দোলিত হননি ?

অমিয় চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের মতোই, শেক্সপীয়রের বৃহত্তর অস্মিতার কথা বলেছেন, এবং লক্ষ্য করেছেন, 'য়ুরোপীয় সাহিত্যে বোধহয় শেক্সপীয়রের কোরায়ালনাস নাটকে এই যুগ্মদৃষ্টির পরিচয় সবচেয়ে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে।' অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই যুগ্মদৃষ্টি খুঁজলে আরেক দিক থেকে একটা পথ মিলবে, সেটি রবীন্দ্রপ্রণীত। কেউ যদি তাঁর 'সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে' সংলাপিকায় অথবা সংলাপধর্মী আরো কোনো কোনো কবিতায় শেক্সপীয়রীয় সমীক্ষা অপেক্ষা করেন, তাঁর আদ্যোপান্ত ঐকিক নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই সেই ভুল স্পষ্ট হবে।

স্টোয়িক কবি সুধীন্দ্রনাথের পাঠক আপাতসাধর্ম্যের উদাহরণে আরো বিচলিত হবেন। আত্মসচেতনতা এবং আত্মঅনুভাব—শেক্সপীয়রের উপর স্টোয়িক চিন্তাব প্রভাবনির্ণয়প্রসঙ্গে এলিয়টের আবিষ্কৃত এ-দুটি সূত্র সুধীন্দ্রনাথে আদ্যন্ত উপস্থিত, কিন্তু শেক্সপীয়রের অপ্রকট আত্মতা তাঁর উপাস্য ছিল না। শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর স্থাপত্যরুচি ও চৈত্যগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপীয়রের সংবৃত হৃদয়ের সাঙ্কেতিকতার বদলে তিনি এক ধরনের (অদ্ব্যর্থ অথচ সংযত) আত্মবিবৃতি দিয়েছিলেন। যে-সনেট ছিল দ্ব্যর্থসঞ্চারী তাকে তিনি নিরঞ্জন বাচ্যার্থে নিয়োজিত করার আগে যে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন তার আভ্যন্তরিক প্রমাণ বিদ্যমান। ক্রন্দসীর 'অকৃতজ্ঞ' কবিতাটির মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে 'No longer mourn for me when I am dead' শীর্ষক সনেটটি। কবিতাটির প্রথম স্তবক :

> আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি—
> সাধিলাম কী সুকৃতি, হব যার প্রসাদে অমর ?
> মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি ;
> সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর ॥

১৯৩৩-এর ২৩ জুন এই চোদ্দ স্তবকের কবিতা রচিত হয়েছিল, ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৪-এ তিনি চতুর্দশপদী তর্জমায় সম্ভবত আরো সংহত হলেন :

> আমার মৃত্যুর দিনে যতক্ষণ রোষরুক্ষ স্বরে
> রটাবে বিমর্ষ ঘণ্টা পরিহরি ঘৃণ্য নরলোক

প্রবিষ্ট হয়েছি আমি ঘৃণ্যতর কীটের কোটরে
চাও তো আমার জন্য ততক্ষণ কোরো তুমি শোক।

প্রকৃত প্রস্তাবে, চতুর্দশপদীর শেক্সপীয়রকে ভাষান্তরিত করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিহৃদয়ের অনাত্মসিদ্ধি খুঁজেছিলেন। ইয়েটসের রঁজার তর্জমা যেমন তাঁর আরো পাঁচটি মৌলিক রচনার পর্যায়ে পড়ে, সুধীন্দ্রের শেক্সপীয়রভাষান্তরও তেমনি তাঁর মৌলসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত। এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে শেক্সপীয়র যে 'মহাকবিদের মধ্যেও অদ্বিতীয়' তা এই কারণে যে, 'জ্ঞানত টেনিসন-জীবনের প্রভাব কাটিয়েও আইডিলস অফ দি কিং যেভাবে টেনিসনকে ধরিয়ে দেয়, প্রস্পেরো ততখানি বিশ্বাসঘাতকতা করে না।... নৈরাত্ম্য আর বৈচিত্র্য অন্যোন্য-নির্ভর।' সুধীন্দ্রের রচনায় এই অন্যোন্যনির্ভরতা নেই। তাঁর নির্মিত নৈরাত্মিক কবি-চরিত্রের ঐক্য যতোটা সুরক্ষিত, বৈচিত্র্য সে-অনুপাতে সক্রিয় নেই। ধ্রুপদী কবি হিসেবে তাঁর এই সীমাসুমিতি সমর্থনযোগ্য এবং সেখানেই শেক্সপীয়র প্রদর্শিত পথে কিছুদূর গিয়েও দুস্তর বর্ত্মের পার্থক্য।

প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত— এঁরা তিনজনেই, সুধীন্দ্রীয় ধরনে বলতে গেলে, incorrigibly romantic। সেই কারণে এঁদের কাছে শেক্সপীয়রের সনেট নিজত্বের বিন্যাস, অন্তত এই তিনজনের সনেট চর্চা (অথবা সনেট অনুবাদ চর্চা) দেখে সেটা মনে হয়। সনেটের বহিঃশরীরের দাবি সহজভাবে মিটিয়েও একটা থীমের মুক্তক কুন্তল অজিত দত্তের কাব্যে খুলে গিয়েছে। কোনো প্রভাব খনন না ক'রেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, শেক্সপীয়রীয় অর্ধনারীশ্বর বিভূতি অপেক্ষা নারীত্বের সুষমা সেক্ষেত্রে গোচর। বরং সেদিক থেকে বিষ্ণু দে ঐ যুগ্মতা অথবা ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে আরো এক স্তর অগ্রসর। তাঁর সনেট অনুবাদে শেক্সপীয়র এলিজাবেথীয় বাতাবরণে উপস্থিত, সেই বনেদি প্রত্নগন্ধে আমোদিত। শেক্সপীয়রের নাটকের অনুষঙ্গগুলি তিনিও তাঁর নিজের হৃদয়-বেদনার ছদ্মপ্রচ্ছদ (objective correlative) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো এই প্রচ্ছদবিক্ষেপ এত চতুর যে, ধরা মুশকিল হয় তাঁর ক্রেসিডা মূলত কার— চসারের, না, শেক্সপীয়রের। কিন্তু যেখানে তাঁর বেদনা এসে প্রাধান্য নিয়েছে, এই কবি উহ্য ও উচ্চারিত শোকাবেগকে কথিত ঐ যুগ্মতায় গ্রন্থনা করেছেন:

দেখেছি তাকে পথের মোড়ে, ভিখারী, শুনি, দুর্ভোগ—
পাগল নাকি! পাগল নয় মোটেই!

প্রবল বেগে দুহাত নাড়ে ঝড়ে ঝাউয়ের ঝাপটানি,
কিংবা যেন ঈগল দুটি বৈশাখীতে ছোটে।

... ...

লিয়র যেন, রাজ্য নেই, দেয়নি শঠে শাঠ্য,
পাগল নাকি, পাগল নয় মোটেই,
বিলিয়ে দিল হৃদয়টাই এই কি তার নাট্য—
রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে!

... ...

কান্না তার বিদ্যুৎ বা আগুনজ্বালা চিৎকার,
রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে
ভিখারী নাচে যেন বা সারা দেশেরই কোন লিয়র,
কান্না তার দুচোখে বাজ ছোটে ॥

('তিনটি কান্না', ৩, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

এই রূপান্তরকেই সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ 'নৈরাত্মের উপকরণে' 'স্বকীয়তার সৃষ্টি' অথবা 'ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে শেক্সপীয়রের বিশ্বমানবিক ছায়া' বলতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক কাব্যবিহারে যে-বিশ্বমানবিক ছায়া পড়েছে সেটি সম্পূর্ণই অ-শেক্সপীয়রীয়।

বাকি থাকেন অনন্য আরেকজন, জীবনানন্দ। কিন্তু তিনিই বোধ হয় শেক্সপীয়রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকে যে কৌণিক মন্ময়তার সূত্রপাত হয়েছিল তারই তীক্ষ্ণ, জ্যামিতিক পরিণতি জীবনানন্দ। গত শতকের শিল্পী-সংস্কারকের যে-সহাবস্থান দেখেছি, এই কবিতে তারো পিছুটান থেকে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন সংস্কারকের হাত থেকে শিল্পীর মুক্তি ঘটল। তিনি কীট্স-কথিত সেই শেক্সপীয়রে পরিদৃষ্ট Negative Capability-র আশ্রয় নিলেন, সুধীন্দ্রনাথ যার প্রতিশব্দ ক'রে গিয়েছেন 'নঙর্থক ক্ষমতা'। নিকটতর প্রতিশব্দ সম্ভবত, 'স্বতশ্চল সামর্থ্য'। কীট্সের ভাষায়, অনিশ্চিত, রহস্যময়তা, সংশয়ের মধ্যে নিজেকে রাখা, বস্তুতথ্য ও যুক্তির বিরক্তিকর অনুসৃতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সামর্থ্য। শেলির প্রতি কীট্সের বিখ্যাত সেই সস্নেহ ধিক্কার, মহানুভবতা থেকে শুদ্ধ-অনুভাব প্রত্যাবর্তনের সেই পরামর্শ স্মরণীয়। সন্দেহ নেই, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি চরিত্রেরই সম্প্রসারণ দৃশ্যমান। সে-কারণে কবি-চরিত্রের সেই অযুত পাত্রপাত্রীময়তা সেখানে নেই। তাঁর অর্কেস্ট্রা

আসলে একান্তবিহ্বল গীতিবিচিত্রা বা বাস্তবৃন্দের ছন্দহিন্দোল। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দের জলের মতো একা ঘুরে ঘুরে মেলডিতে কথা বলতে বলতে ক্রমশই দ্বীপময়তা এবং সমুদ্রের বিরোধাভাসে পৌঁচেছিলেন। পশ্চিমী সঙ্গীতের পরিভাষায় একে হয়তো Theme metamorphosis বলা যায়। Liszt-এর সিম্ফনিধর্মী কবিতায় এই ঐক্যময়তার নব নব ছদ্মবেশ দেখা গিয়েছে।

তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে বলব, কীট্‌সের দৃষ্টিতেই জীবনানন্দ তিক্ত-মধুর, সংজ্ঞাতিশায়ী শেক্সপীয়রকে নিরীক্ষণ ও স্বীকরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশ-কালের আপেক্ষিকতাকে, অথবা আধুনিক বাঙালী কবির রবীন্দ্র-সাপেক্ষতা তিনি অস্বীকার করেননি। তাই তাঁর মনে হয়েছে, 'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে ফিরে শেক্সপীয়রের কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে।' কিন্তু প্রায় পরক্ষণেই শেক্সপীয়রের দেশকালোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, কেননা, 'শেক্সপীয়রের পরে অনেক সাহিত্যিকই খুব বিশ্রুত-ভাবে আলোকপাত করলেও বিশ শতক পর্যন্ত কোনো দ্বিতীয় শেক্সপীয়র এসে দাঁড়াতে পারে নি আমাদের মধ্যে।...পাঁচ-সাতশো—এক হাজার বছর পরে শেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় প্রকাশপদ্ধতি বেঁচে থাকলেও দান্তেকে উল্লঙ্ঘন করে তিনি সত্যিই ব্যাপকভাবে অধীত হয়ে আধার ও আধেয়ের একটি অবিনাশ সত্যস্বরূপের অনির্বচনীয়তায় অমর হয়ে থাকবেন—আশা করা যেতে পারে হয়তো। দান্তের চেয়ে শেক্সপীয়র মহাভারতের...আদি দিকপতির মতো গভীরতা ও আকাশের ওপারে আকাশ, পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবীকে বেশি হৃদয়ঙ্গম করে আধুনিক কালের প্রয়োজনে বেশি শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও সকলের গোচরে এনে নিজের বইগুলোর ভিতর গ্রথিত করে রেখেছেন।'

কথাগুলি নিছক স্তুতিকথন নয়। আমরা একজন ইয়েট্‌সমুগ্ধ জীবনানন্দকে জেনেছি। তাঁর সম্পর্কে ঐ অভিধা অস্বীকার করছি না, কেননা, ইয়েট্‌সকে তিনি কখনই এড়িয়ে যেতে পারেননি। দুজনের মধ্যে একটি সারূপ্যসূত্র, দুজনেই কীট্‌সের অনুরক্ত। কিন্তু শেক্সপীয়রকে নিয়ে ইয়েট্‌সের অস্বস্তি এখানে স্মরণ-যোগ্য। শেক্সপীয়র তাঁর কাছে কিছু সমুজ্জ্বল ভগ্নাংশের সমষ্টিমাত্র। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দের কাছে শেক্সপীয়রের উপলব্ধি নিঃসন্দেহে 'অর্ধসত্যের চেয়ে বেশি সত্য'। তাহলে অন্তত এটা ধ'রে নিলে অন্যায় হয় না, জীবন সম্পর্কে ধারণায় জীবনানন্দ শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রভাবনিরূপণ এখানে বড়ো

কথা নয়।[১] তাই যদি এ-রকম দেখা যায় জীবন বিষয়ে শেক্সপীয়র প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাটি তিনি গ্রহণ ক'রে বাকি অর্ধসত্যটিও সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে জ্ঞাপন করেছিলেন, তাহলে সম্ভাব্য প্রভাব উদ্ঘাটনের দরকার হতে পারে। শেক্সপীয়র যাকে 'degree' বলেছেন, সত্যের সেই বিভিন্ন সঞ্চলমান মাত্রা সম্পর্কে জীবনানন্দ যে কতোদূর অবহিত ছিলেন, তা তাঁর 'সত্য, তবু শেষ সত্য নয়' ইত্যাদি ধ্রুবপদে প্রমাণিত। 'রণরক্ত সফলতা' অথবা 'রক্তিল বিন্যাস' থেকে 'কল্লোলিনী তিলোত্তমার' কাছে স'রে যেতে যেতে যে-সত্য আকার থেকে অমূর্ত, অথবা অমূর্তের আকার হয়ে ওঠে, জীবনানন্দে সেই বৃত্তকামী ব্যাসার্ধগুলির অপরূপ উন্মোচন আছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপির 'অবসরের গান' জীবনানন্দের স্বোপলব্ধির প্রথম ক্রান্তিলেখ। সত্যেন্দ্র-নজরুলের স্বভাব কবিত্ব প্রিরাফায়েলিক পূর্বসংস্কার এবং ইন্দ্রিয়প্রপঞ্চ রচনার সচেতন আগ্রহ থেকে মুক্ত এই কবিতায় কবির বিভোর স্বাচ্ছন্দ্যগুণ এবং অনায়াস নমনীয়তা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কবিতাটির চিহ্নিত অংশ তিনটি। এই তিনটি অংশে মৃত্যু-পার্বণ-শিল্পের নক্শা আছে। এই তিনটি বিষয় ঠিক পর পর বিন্যস্ত নয়, পারস্পরিকতায় ওতপ্রোত। এইটেই জীবনানন্দের সমস্ত কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এই পারস্পরিকতায় ওতপ্রোত হতে হতে আংশিক বৃত্তগুলির বৃহত্তর বৃত্তে অনুপ্রবেশ। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটক থেকে প্রস্বরসংগ্রহের ঐশ্বর্যে এই বৃত্তাংশগুলি কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব।

মৃত্যুচেতনার একটি বর্ণনা :

> আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
> যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
> মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নিচে পৃথিবীর তলে :
> ... ...
> অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
> কোনো এক সম্রাটের সাথে

১ ইতিহাসের একই মুহূর্তে যখন স্পেনীয় ক্যালডেরণ এবং ইংরেজ কবি শেক্সপীয়র জীবনকে স্বপ্ন ব'লে উচ্চারণ করেন প্রথমোক্তের *La Vida es Sueno*-র সঙ্গে অন্যজনের *Tempest*-এর প্রভাব-বিনিময় আবিষ্কারের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম দেখা যায় চিরদিনই অতীতকে আত্মিক প্রয়োজনে ভবিষ্যতের কবি ঢেলে সাজিয়েছেন।

মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে ;
যোদ্ধা-জয়ী-বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে— পাশাপাশি
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি ![২]

পাঠকের নিঃসন্দেহে মনে পড়বে হ্যামলেটের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দুই ক্লাউনের কথোপকথনে নিদারুণ জীবনরস। এবং করোটি হাতে হ্যামলেটের এই সংলাপ :

Alas ! Poor Yorick ! I knew him, Horatio ; a fellow of infinite just of excellent fancy.

তাছাড়া, হোরেশিওর কাছে সেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন : **'Dost there think Alexander looked of this fashion i'the earth ?** এবং হোরেশিওর উত্তর : **E'en so.**

ভাবানুষঙ্গের আকস্মিকতার চেয়েও যে নিশ্চিততর ব্যঞ্জনা নিয়ে উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত, তার কিনারা রিচার্ড দি সেকেণ্ডের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মেলে। এখানে সম্রাটের সন্তাপে আরেকটি ইঙ্গিত যুক্ত হয়েছে : **'Our sighs and they shall lodge the summer corn'.**

জীবনানন্দে লক্ষ্য করি, মৃত্যুর বিনিময়েই 'হেমন্তের ধান ওঠে ফলে'। রিচার্ড দি সেকেণ্ডের **'Night-owls shriek where mounting larks should sing'** জীবনানন্দে 'পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে' ইত্যাদি অংশে নতুন প্রচ্ছায়া বহন ক'রে এনেছে। জীবনানন্দ মৃত্যুর প্রতিদানে শস্যের জন্মের **ritual** বা পার্বণকে প্রোজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত অ্যাজ় ইউ লাইক ইট-এর দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশকে তিনি স্পর্শ করেছেন আর্ডেনের অরণ্যে যেখানে 'ভুলে গিয়ে রাজ্য-জয়-সাম্রাজ্যের কথা' 'হাতে হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে' নাচ আর গান আর 'নরম উৎসবে'র আয়োজন আছে। পাশাপাশি আরো একটি চাক্ষুষ প্রমাণ রাখা যায়। ঐ

২ সমাধিতে এই সহাবস্থান জটিল অথচ অনিবার্য আলেখ্যে পৌঁচেছে অন্তিম পর্বের জীবনধর্মী কবিতায়

না ভেবে মানুষ কাজ ক'রে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো-হো করে হাসে।
('মহিলা', বেলা অবেলা কালবেলা)

নাটকেরই চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হরিণ-শিকার নিয়ে একটি পার্বণানুষ্ঠান রয়েছে, যা আবার জুলিয়াস সিজারের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মানবপ্রসঙ্গে অনুরণিত হয়েছে। 'অবসরের গানে'র অব্যবহিত পরবর্তী 'ক্যাম্পে' নামক কবিতায় আক্ষর ও আন্তর অর্থে একই কৌমানুষ্ঠান। বনলতা সেন-এর 'শিকার' কবিতায় তা জটিলতর সাঙ্কেতিকতায় প্রবেশ করেছে। 'অবসরের গানে' মৃত্যুর মৃত্যুত্বের উপর কোথাও জোর পড়েনি, মৃত্যুকে বৃত্তাকারে উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে। এবং উইলসন নাইটের পর্যালোচনার সারার্থ গ্রহণ ক'রে দেখানো সম্ভব, উইণ্টার্স টেলের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে এবং কীট্‌সের 'Tasting of Flora and the country green / Dance, and Provencal song, and sun-burnt mirth'—এর মিশ্র অভিঘাত এখানে 'কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে। ফলন্ত ধ্যানের গন্ধে-রঙে তার—স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের দেহ'।

'অবসরের গানে' মৃত্যু ও পার্বণের ভিতর থেকে শেষ পর্যন্ত শিল্পের কল্পস্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীর মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয় ;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালবেসে।

অনিবার্য ভাবাসঙ্গ টেম্পেস্টের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য :

The isle is full of noises.
Sounds and sweet airs, that give delight and hurts not,
Sometimes a thousand twangling instruments
Will hum about my ears ; and sometimes voices,
That, if I then had work'd after long sleep,
Will make me sleep again.

শিল্প সত্য এবং অসত্যের সমাহার, জাগরণ ও সুপ্তি, চেতনা এবং ইন্দ্রজালের অন্বিত সম্মোহন। জীবনানন্দ 'অবসরের গানে' এই ধারণা মন্ত্রচ্ছলে জানিয়েছেন। কিন্তু উত্তরকালে এই সিদ্ধান্ত আরো ব্যাপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন ও বিষম স্তরের বাস্তবতাকে ধারণ ক'রে 'রাঙা নদী' বা 'উড়ো নদী'র বস্তু-পরাবস্তুকে মিলিয়েছে :

কেন না এখন তারা সেই দেশে যাবে যাকে রাঙা নদী বলে,
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দেখে— যতদিন মুখ দেখা চলে।

('লঘু মুহূর্ত', সাতটি তারার তিমির)

ধূসর পাণ্ডুলিপির যে-অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ পরে পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রথম দুটি কবিতা ('এই নিদ্রা', 'পাখি') ট্র্যাজিক প্রজ্ঞার শেক্সপীয়রীয় এষণায় মুখর। কবিতাগুলি পরিমার্জনের সুযোগ তিনি পাননি। তা সত্ত্বেও, কিংবা সেজন্যই হয়তো, কবির উদ্দেশ্য ঐ অশৃঙ্খল বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে স্পষ্ট। দ্বিতীয় কবিতাটি থেকে ঈষৎ অংশোদ্ধার করছি :

আমার বুকের পরে এই এক পাখি ;
পাখি না ফড়িং কীট ? পাখি না জোনাকি ?

... ...

অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি, আমারেও মুষড়ে ফেলিতে
দ্বিধা কেহ করিবে না ; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবে নাকো ছেড়ে।

মহাপৃথিবীর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির নিম্নোক্ত চিত্রকল্পে ভাবনাটি আরো অগ্রসর :

দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে।

এবং বেলা অবেলা কালবেলার 'দেশ-কাল-সন্ততি'তে চিত্রকল্পটি পূর্ণতা পেয়েছে :

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে ;
হয়ত তার দিন শেষ হয়ে গেল ; একদিন হতই তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার ; যতবার গভীর প্রয়াসে
বাঁধা ছিঁড়ে যেতে চায়— পরিচিত নিরাশায় ততবার হয় সে নীরব।

... ...

অলজ্ঘ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব ;
জানে তাহা কীটেরাও পতঙ্গেরা শান্ত শিব পাখির ছানাও
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায় ; হে সৃষ্টির বনহংসী কী অমৃত চাও ?

প্রথম প্রেরণা একমাত্র নির্দেশ্য অনুষঙ্গ কীং লীয়র-এর :

In the last night's storm I such a fellow saw
Which made me think a man a worm...

... ...

As flies to wanton boys, are we to the gods ;
They kill us for their sport. (IV, i)

এবং পঞ্চম অঙ্কে কীং লীয়রের সেই আপেক্ষিক মানবনিয়তির শান্ত শিবায়ন :

We two alone will sing like birds i'the cage ;
When thou dost ask me blessing, I'll kneel down,
And ask of thee forgiveness ! so we'll live
and pray, and sing, and tell old tales, and laugh
At gilded butterflies (V.iii)

চতুর্দিক থেকে সংরুদ্ধ মনুষ্যনিয়তিকে এখানে যে আজানু উপাসনাসঙ্গীতে পরিণত করা হয়েছে, জীবনানন্দ কঠিনের সেই অনন্য কোমলীকরণকে স্পৃষ্ট তাঁর উপর্যুক্ত বিবর্তনে তুলে নিয়েছেন। শেক্সপীয়রে এই রকম ধ্বংসাবশেষ মেদুরতা অন্যত্র খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। বরং গ্রীক নাটকে Sophrosyne-তে এই ধারণা সর্বব্যাপী, যা জীবনানন্দে কীং লীয়রের প্রদত্ত ইশারা ঘুরে 'দীনতা অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো'য় পরিণতি পেয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতার মধ্যপর্যায় থেকে অন্ত্যপর্যায় পর্যন্ত একটি জগৎ রয়েছে : মানুষের ভিতরে মানবেতর প্রাণীলোক। এটি শেক্সপীয়র থেকে গৃহীত এবং নবত্বে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষত ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা, কীং লিয়র এবং টাইমন অফ আথেন্সে লক্ষ্য করি এই ভয়াবহ অধোভুবন।[৩] মানুষ এবং পশুর তুলনা এবং 'The strain of man's bred out into baboon' জীবনানন্দ রূপকের তাৎপর্যে গ্রহণ ক'রে দেখিয়েছেন :

জীব হয়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই ত জীবন :
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে ;
নিপট আঁধার ;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।

৩ দ্রষ্টব্য, ব্র্যাডলির শেক্সপীয়রীয়ান ট্র্যাজেডি, পৃ ২৪৬, ২৬৬।

সবি আজো প্রতিশ্রুতি, তাই
দোষ হয়ে সব
হয়ে গেছে গুণ।
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন। ('উন্মেষ', সাতটি তারার তিমির)

জন্তু-জগতের অনপনেয়তা কীং লিয়ারের 'hog in sloth, box in stealth, wolf in greediness, lion in prey' প্রভৃতি উচ্চারণে অসংবৃত এবং শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন, জীবাত্মার পুনর্জাতকচক্র (transmigration of souls) আছে ব'লে পশুদের আত্মা একদিন কালক্রমে মানবশরীরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। জীবনানন্দ স্বরবৃত্তে এই চিন্তার তর্জমা ঘটিয়েছেন :

বাহক নেই,— দূরন্ত কাল নিজেই রয়েছে
নিজেরি শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।
('অনন্দা', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না কঠোপনিষদের একটি অংশকে (২।১৯) এরি মধ্যে একবার ছুঁয়ে গিয়েছেন। সেই নরক, আনন্দ, যেখানে কৃপণতার দোষে অথবা খণ্ডিত দানের অপরাধে পাপীকে যেতে হয়। আর সেই নরক থেকে উত্তীর্ণ হবার পথরেখাও :

চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরক কীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মত হয়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়ত হৃদয়ে। (ঐ)

শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন :

It will come
Humanity must perforce prey on itself
Like monsters of the deep.

কিন্তু জীবনানন্দ স্নিগ্ধতর। তিনি বিলয়াত্মক উপসংহারে বিশ্বাস করেন না, রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে উত্তরণকে মানেন। তাই,

অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথে পথান্তরে ;
তবু ঐ নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয় ;
হাতে তার তুলাদণ্ড ;
শান্ত— স্থির ,
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।

('অভিভাবিকা', সাতটি তারার তিমির)

দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার। এক, শেক্সপীয়রের ভাববস্তুকে নিয়ে মানবসত্তার ঊর্ধ্বায়ন ; দ্বিতীয়ত, 'নীল' রঙের প্রতীক। ঈষৎ আগে উদ্ধৃত 'নীল নরক' এবং এখানে 'নীলাভ বৃত্তি' নীল রঙকে পাপ ও করুণার অসাধারণ দ্বৈতাভাস দিয়েছে। এই প্রতীকের মধ্যে অমূর্ত আকার পরিগ্রহ করেছে। আরো একটি কথা ঘাতকের আত্ম-উত্তরণ। জীবনানন্দের ভাষায়, 'হৃদয় আছে বলেই' ঘাতকের শোচনা। রিচার্ড দি থার্ডের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের দুই ঘাতক (অপরাধ এবং অপরাধবোধ) এবং ম্যাকবেথের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথের উল্লিখিত 'শুভ্র হৃদয়ের অস্বস্তি' জীবনানন্দ তাঁর যুদ্ধোত্তর ও দাঙ্গাদুর্গতিপর্যায়ের কবিতায় বারংবার প্রয়োগ করেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা ভালো, উইলসন নাইট কথিত 'Pilgrimage of Hate' এবং রিচার্ড দি সেকেণ্ডের অন্তিম 'Voyage to the holy land' মিলিয়ে দেবার প্রয়াসে যেন শিশু-তীর্থের নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন।

শিশু-তীর্থের নতুন ভাষ্যে ব্লেকের ভাষায় Marriage of Heaven and Hell ঘটেছে নিশ্চয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে নিষ্পন্ন করতে চাই। জীবনানন্দ এক পর্যায়ের কবিতায় শিশুর মতো প্রকৃতিময় সহজাত অনাবিল প্রাণদ জীবনী-শক্তি এঁকেছেন :

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন :
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে
মহিলার প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল—

জানি না সমর্পণের আগে হেলেন প্রসঙ্গে ডক্টর ফস্টাসের 'Was this the face that launched a thousand ships' ইত্যাদি সংলাপ জীবনানন্দের

সচেতনতায় ছিল কিনা। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে জীবনানন্দ সেই পরিণতি খুঁজছিলেন যেখানে নারীপ্রকৃতি তার স্বাভাবিক প্রকৃতির নিছক প্রসাদগুণকে অতিক্রম করে। বেলা অবেলা কালবেলায় এই মনন-'নিশিত নারী মুখে'র কথা আছে। 'চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহলে' যার আহ্বানে সমবেত নাবিকযুবার অর্জিত, পরিণামী মৃত্যু :

তবুও সব রণক্লান্ত নাবিক ফিরে আসে ;
তারা যুবা, তারা মৃত, মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল

উৎসসূত্রে জাগে পেরিক্লিসের এই ক-টি লাইন :

To show his sorrow he'd correct himself ;
So puts himself unto the shipman's toil,
With whom each minute threatens life or death. **(1, iii)**

এবং পেরিক্লিসের কন্যকা যে **'like patience gazing on King's graves and smiling / Extremity out of act'**, যে মিরান্দার সারল্য থেকে অভিজ্ঞতা ঘুরে মারিনার নারীত্বে জটিল সারল্য পেয়েছে, জীবনানন্দ তাকেই 'আজকের এই অন্ধজগতে' পটভূমির মর্যাদা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গ আরো একটু প্রসারিত ক'রে দেখি উইন্টারস টেলের পারডিটার চরিত্রণ জীবনানন্দের প্রিয়। ঐ নাটকে 'নিজের মতো ক্ষমতায় প্রকৃতিস্থ প্রকৃতি' (**'Great creating Nature'**) 'পবিত্র-অগ্নি-সূর্য' (**'the fire-rob'd god, golden Apollo'**) 'আর সূর্যের বনিতা তপতী' 'নারীসবিতা' (**'Perdita'**) যে বিশ্বময় ব্রতের উদ্‌যাপন করেছে, জীবনানন্দ বেলা অবেলা কালবেলায় তার ফসল ফলিয়েছেন। এবং ঋতুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, প্রৌঢ়তার সঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতির প্রজ্ঞাময় অভিযোজনসূত্রে **Perdita** যে বলেছে :

Sir, the year growing ancient,
Not yet on summer's death, nor on the birth
Of trembling winter, the fairest flowers of the season
Are our carnations···
Here's flowers for you :
The marigold, that goes to bed with the sun,
And with him rises weeping ; these are flowers
Of middle summer, and I think they are given
To men of middle age. **(IV, iv)**

বনলতা সেন-এর 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এবং 'মহাপৃথিবীর জার্ণাল : ১৩৪৬' (পরে শ্রেষ্ঠ কবিতাসঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত) কবিতায় তারই অনুসরণে নারীর 'স্পষ্ট নির্লিপ্তি' দেখানো হয়েছে যার পটভূমিকায় 'নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব' এবং বলা হয়েছে, 'কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে করে', তাকে 'সময়ের মুখপাত্রী' ব'লে প্রৌঢ় প্রেমিকটি প্রস্তুত হয়ে উঠছে। অবহিত পাঠক জানেন, ইয়েট্সের *Crossways* পর্যায়ের 'The Falling of the leaves' এবং 'Ephemera' কবিতার ক্লান্ত নির্বেদ এবং অনন্তের অভিমুখে অনিশ্চিত প্রস্থান-ভূমির কথা জীবনানন্দে আছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিযোজনের স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে স্বর্লোকে উত্তরণের ইঙ্গিত শেক্সপীয়র থেকেই এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু উত্তরণের উন্মীলিত স্তরপর্যায় নয়, এক অদ্ভুত সময়-চেতনা জীবনানন্দে আছে। তিনি এক ধরণের পথচারী, ভিখারী কিংবা নির্বোধের মুখে আশ্চর্য প্রজ্ঞার কথা বসিয়ে গিয়েছেন। এখানেও শেক্সপীয়র তাঁর প্রদর্শক। প্রসঙ্গ ছুঁয়ে পাঠকের মনে পড়বে সিঞ্জ, ইয়েট্স, রিলকে অথবা ইঙ্গমার বের্গমানে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে-বসা নির্ধন পথচারীর সার্থক স্পর্ধা, অথবা ভিক্ষুকের নিদারুণ কাণ্ডজ্ঞান। থ্রী বেগার্স-এর সঙ্গে আপাতসাযুজ্যে অর্থময় লঘু মুহূর্তের 'আধো আইবুড়ো ভিখারী', সময় নিয়ে যে প্রবল দার্শনিকতা করে তাদের সঙ্গে প্রকৃত সাদৃশ্য অ্যাজ় ইউ লাইক ইট-এর সেই motley fool— যার মনে হয়েছে :

'It is ten o'clock ;
Thus we may see', quoth he 'how the world wags :
'Tis but an hour ago, since it was nine ;
And after one hour more 'twill be eleven ;
And so, from hour to hour, we ripe and ripe,
And then, from hour to hour we rot and rot.
And thereby hangs a tale'. (II/vii)

এবং কীং লীয়রের সেই নির্বোধ যে বোঝে

Fortune, that arrant whore,
Ne'er turns the key to the poor. (II/vi)

আর তাই জানে সে

Must make content with the fortunes fit
Though the rain it raineth every day

আধো আইবুড়ো ভিখারীরা বোঝে :

ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।
বলে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ মেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব করে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এই শাকচুন্নিকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার করে করে দিল আরেক গেলাস :
'আমাদের সোনারূপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস।'

এবং এরাই 'জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে ব্যবহার করে নিতে' গিয়ে 'পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়' এবং মানুষের মৃত্যুর বিষয়ে গবেষণা ক'রে অতঃপর কালোত্তীর্ণ পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। সাতটি তারার তিমিরের 'কবিতা' নামক কবিতাটিতে এই কথাটিকে তিনি মন্ত্রের মতন বাজিয়ে দিচ্ছেন :

বানরী ছাগল নিয়ে যে ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।

সুতরাং জীবনানন্দের সময়চেতনা অনন্তের বোধে সমীকৃত। শেক্সপীয়র যেখানে সময়ের চোরাবালির ভিতর নিস্তব্ধ চৌর্যবৃত্তি দেখে বলেছেন :

Ah ! yet doth beauty, like a dial-hand.
Steal from his figure, 'and no pace perceiv'd. (Sonnet 104)

জীবনানন্দ, জানি না সেজানের সেই সিখ্যাত ছবির সাদৃশ্যে কিনা, দেখেছেন :

ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয়
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে। ('আবহমান', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এবং অনুভব করেছেন :

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
করে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে

বুঝেছি অকূলে জেগে রয় :

ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ-হৃদয়। ('রাত্রিদিন', ঐ)

শেক্সপীয়রকে অবলম্বন ক'রে জীবনানন্দের এই আবিষ্কার, অপ্রেম ও প্রেমকে তুল্যমূল্য দিয়ে 'জয়জয়ন্তীর সেই সূর্য'কে জানা যাকে 'শত শত রূপান্তর ভেঙে' পেতে হয় , এবং এই উপলব্ধি যে :

অন্ধকারে সব চেয়ে সে-শরণ ভালো :

যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

('যতদিন পৃথিবীতে', বেলা অবেলা কালবেলা)

সন্দেহ নেই, জীবনানন্দ তাঁর পরবর্তী বাংলা কবিতায় সবচেয়ে অপব্যবহৃত প্রতিভা। কোথাও কোথাও চল্লিশ পঞ্চাশের কোনো কোনো কবির শেক্সপীয়রের সনেট তর্জমায় একরকম কমনীয় একাগ্রতাগুণ দেখা যাচ্ছে, সেটি আশার কথা। এই সূত্রে মণীন্দ্র রায় অনূদিত 'শেক্সপীয়রের সনেট পঞ্চাশৎ' (১৩৭০) উল্লেখযোগ্য। আবার যদি কোনো তরুণ কবি মেটারলিঙ্কের কণ্ঠে শেক্সপীয়রীয় বস্তুবিশ্বকে তিরস্কার করেন সেটি এই কারণেই আশাপ্রদ যে তা শেক্সপীয়রকে মূল্যায়ন ক'রে নব্য প্রতীক-প্রস্থানের সম্ভাবনায় আভাময়। দীপিত হবার আরো একটি কারণ আছে। জীবনানন্দ যাকে ভবিষ্যকথন ক'রে গিয়েছিলেন 'কবিতায় নাট্য' : 'ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি দেশী ও গ্রীক (কারো হাতে) ও বেশি শেক্সপীয়রীয় (অপরদের হাতে — কিন্তু নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রী ধারণ করে) বাংলাদেশে খুব শিগগির না হলেও সৃষ্টি হবে একদিন ; কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।' সেই দূরতর ভবিষ্যৎ এখনো আসেনি, খণ্ড কবিতার ক্লান্তি থেকে নিষ্ক্রমণের আর্তি এখনো দেখা যায়নি , কিন্তু খণ্ডকবিতায় কৌণিক মন্ময়তার কিছু নকশা এরি মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যা সংলাপিকার লক্ষণান্বিত। কিছু স্বগত সংলাপিকাও যে পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়। এবং আধুনিক বাংলা কাব্য-ভাবনায় সেই আত্মনাট্যের মুদ্রাটুকুও রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং 'ইংল্যাণ্ডের দিক্প্রান্তের কবির' বিমিশ্র উপহার।

ব্লেকের স্বভাব ও কবিস্বভাব

যীশু হাত বাড়িয়ে বললেন : 'তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে ঐ গর্তের মধ্যে নেমে গিয়ে হারানো মেষশাবকটিকে তুলে আনবে ? তোমাদের মধ্যে কি কেউই নেই ?' —বাইবেল

'ছবি ও গানে, শিল্পে ও জীবনে মধ্যযুগের জেগে ওঠার নামই রোমান্টিকতা। কিন্তু রোমান্টিক কবিতার জন্ম তো যীশুর ধর্মে ; যীশুর রক্তের মধ্য থেকে যে-আগুনঝরি ফুল ফুটে উঠল, তারই নাম রোমান্টিক কবিতা।' —হাইনে

মার্গারেট মার্শালের *The Subtle Knot* বইখানি হাতে এসেছে। বইটির বিষয়, এক কথায় সতরো শতকের ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সন্দেহবাদ। কিংবা বলা যায় ঐ শতাব্দীর মনন-প্রণেতা কয়েকজন ভাবুক মানুষের ভাবনা বিশ্লেষণ ক'রে শ্রীমতী মার্শাল স্বাভাবিক যুক্তিসূত্র ধ'রে আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে অবরোহণ করেছেন। একান্ত মানবিক ও অমিশ্র আধ্যাত্মিক চৈতন্য কখনোই সেতুসাধ্য কিনা, এই প্রশ্নের আঘাতে সেই মনীষীদের রচনাবলী বিচলিত। জোসেফ গ্র্যানভিলের *Scepsis Scientifica* (লণ্ডন, ১৬৬৫) থেকে একটি প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা এখানে আবার উত্থাপিত হলো :

'স্বর্গত প্লেটো ব'লে গেছেন যে মানুষ প্রকৃতির একটি বৃত্ত ; উপরের দিকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা শুদ্ধসত্ত্বের খেলা, নীচের ভূমণ্ডলে মানুষের শারীরিক অস্তিত্ব। এই দুটি ভাগ যে একেবারেই দ্বিধানির্দিষ্ট, এ-কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু কি ক'রে ঐ চিন্ময় অংশের সঙ্গে এই মৃন্ময় অংশ মিলবে, ভেবে পাই না। কোন্ সিমেন্টে স্বর্গ আর মাটিকে জোড়া লাগাবে, আলো আর অন্ধকারের মতো চিরস্বতন্ত্র দুটি নিয়মকে ? এই সমস্যার বোধহয় কখনো কোনো সমাধা নেই। কি ক'রে একটি ভাবনা মার্বেলের প্রতিমূর্তির সঙ্গে সংলগ্ন হতে পারে, কিংবা সূর্যরশ্মি একতাল কাদার সঙ্গে ?'

বলা বাহুল্য, এই দুশ্চিন্তা শুধু প্লেটোনিক নয়, আন্তর্জাতিক। উপনিষদে এ-সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে তা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধান্তের মতোই ব'লে দেওয়া হয়েছে, এমন-কি কোনো দ্বন্দ্ব উত্থাপনের সুযোগও সেখানে দেওয়া হয়নি :

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

—কঠোপনিষৎ। দ্বিতীয় বল্লী

স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি প্রেয়কেই গ্রহণ করেন, এ-কথা বললে সমস্ত সমস্যার লঘুকরণ হলেও সমাধান হয় কিনা— ব্লেক আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের মধ্যে এই প্রশ্নের পৌরোহিত্য করেছিলেন। এই প্রশ্নের অনুষঙ্গেই তাঁর জীবন কেঁপে উঠেছিল এবং তাঁর কবিতা একই আলোড়নের সঙ্গে সমারব্ধ।

দেহাত্মদ্বৈততত্ত্বের জিজ্ঞাসা বেয়ে ব্লেকের কাছে সেই কথাটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল, গ্যেটে সম্বন্ধে কার্লাইল যে-কথা তুলেছিলেন, অর্থাৎ তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'গ্যেটে মানুষ হিসেবে কিরকম? ভিতর থেকে তিনি কেমন মানুষ?' টমাস বাট্‌স ব্লেককে লিখেছিলেন: 'তুমি বড়ো শিল্পী বা বড়ো কবি হবে কিনা জানি না, কিন্তু তুমি যে একজন মহত্তর মানুষ হবে এ-কথা নিঃসন্দেহে ব'লে দিতে পারি।' ব্লেক এর উত্তরে একটি কথাই জোর দিয়ে বলেছিলেন: 'ভবিষ্যতে আমি ধর্ম ও প্রপন্নার্তির একজন সবল সমর্থক হব।' এই ধর্মও তাঁর কাছে কোনো অনুশাসনের দৌরাত্ম্য নয়, ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'forma' বা রূপকল্পের অর্থে প্রাণদ শক্তি।

ব্লেকের বিষয় হলো সমগ্র মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষ; তার জন্ম, তার প্রাণময় ও মৃত্যুময় জীবন এবং পুনর্জন্ম। মানুষের বিনিঃশেষ ধাতুরূপ ও ঈপ্সিত শিল্পরূপের মধ্যে অননূদিত দূরত্বের যন্ত্রণা ও মানবিকতার পুনর্বিচার— ব্লেকের স্থায়ী বেদনা এখানেই বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে। 'The subtle knot that makes us man' কথাটা প্রথম পর্যাপ্ত চতুরালির সঙ্গে বলেছিলেন ডান্। মৃত্যুর অনিবার্যতা ও সৃষ্টির অর্থহীনতা ডানের কাছে পরিচিত দুঃস্বপ্নের মতো দেখা দিয়েছিল। মানুষ সেই দারুণ দোটানায় নিতান্ত এক করুণাস্পদ জীবমাত্র, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমীকরণে যার করুণ আগ্রহ নিয়োজিত। ডান্ শেষ পর্যন্ত মানুষের কান্নায় যতোটা কেঁদেছিলেন, যতোখানি সাড়া দিয়েছিলেন, মানুষের মানবিক উপাদানে তার এক কণাও ভরসা স্থাপন করতে পারেননি। তাঁর শেষজীবনের প্রার্থনা-পদাবলীতে তাই একরকম সুন্দর ও শোচনীয় অধ্যাত্ম বিধুরতা ফুটে উঠেছিল, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে যার একমাত্র তুলনাস্থল শেষবয়সের বিদ্যাপতি।

ডান্ থেকে দান্তের কাছে ফিরলেও একজন মানুষ যতোটা বিস্মিত হবেন, সেই পরিমাণে তিনি কখনোই আশান্বিত হতে পারবেন না। দান্তে যে-টমাস অ্যাকুয়ানাসকে গুরু হিসেবে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের ঈশ্বর-মানুষের পৌনঃপুনিক নিত্যলীলার প্রসন্ন প্রতিশ্রুতি নেই, আছে নিষ্ঠুর বিচারকের আকস্মিক সম্মতিদান। জগৎ বা জীবন বিশ্বময়ের বুক থেকে এসে

তাঁরই বুকে ফিরে যাচ্ছে, প্রত্যেক মানুষও ফিরে যেতে পারে, কিন্তু সে ফিরবার সুযোগ মাত্র একবারের জন্য পাবে, তার বেশি নয়। ঐ একবারের শীর্ণ সুযোগের ভিতরেই তাকে তার মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিতে হবে— টমাস অ্যাকুয়ানাস মানুষের সদ্‌গতির (sublimation) জন্যে এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। দান্তেও প্রথম থেকেই একজন সংশোধিত মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন এবং মানুষ ও ভগবানের মাঝখানের ব্যবধানের ঘোরানো সিঁড়িগুলি মেনে নিয়েছিলেন।

মিলটনের কাছে মানুষের পতন কিংবা আত্মার ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত বিষয় হয়েই এসেছিল, তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর রচনার পথ ও পরিণতি *Samson Agonistes*-এর প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে 'On His Blindness' সনেটের যে-সাদৃশ্য আছে, তা অসাবধান পাঠকের চোখেও ধরা পড়বে। অথচ মিলটন এই সাদৃশ্যকেই রূপান্তরিত করবার জন্যে কলম ধরেছিলেন। ব্যক্তিগত মানুষের ট্র্যাজেডি তিনি স্বীকার করেননি, সব মানুষের বিপর্যয়ই তাঁর লক্ষ্যবিষয় ছিল। তিনি পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে চেয়েছিলেন মানুষমাত্রের উপরেই একটি নির্বিশেষ অধ্যাত্ম অস্ত্রোপচার হোক। তাঁর রাজনৈতিক রচনায় মানুষের অধিকারের প্রত্যাশাজ্ঞাপন সত্ত্বেও নিছক একজন মানুষকে কখনোই সম্ভাবনা ও শক্তির বিচারে তিনি বিশ্বাস করেননি, দুর্বল ব'লে মমতা করেছিলেন।

ব্লেক মানুষকে বিশ্বাস করেছিলেন, তার সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন। টমাস্ এ কেম্পিস্-কে পাঠ ক'রে রবীন্দ্রনাথের যে-অস্বস্তি হয়েছিল, ব্লেকের কাছেও সে-রকম অস্বস্তি হয়তো অবিদিত ছিল না। জীবন-দেবতা যীশুকে অনুসরণ ক'রে সমস্ত জীবনকে বিবিক্ত নীরক্ত শান্ত রসে পরিণত করার চেয়ে সমগ্র জীবনে যীশুর প্রতিসরণই তিনি কামনা করেছিলেন। মিলটন চেয়েছিলেন :

'To justify the ways of God to men.'

ব্লেক নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন :

'To justify the ways of men to God.'

The Book of Urizen থেকে ব্লেকের এই আকাঙ্ক্ষার মূর্তরেখা লক্ষ্য করা যেতে পারে। চিরন্তন দেবতাদের সংঘ থেকে একজন আদিম পুরোহিত নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেন। ইউরিজেন ব'লে এই পুরোহিতের আত্মচিন্তার পটভূমি অপার শূন্য। দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভে আত্মসন্ধিৎসু এই পুরোহিত প্রত্যেক দেবতার

জন্য নির্দিষ্ট একটি সর্বজনীন সমতান বা সুনিয়মকে অবিশ্বাস করলেন। তিনি বললেন প্রত্যেক দেবতার এক নিজস্ব জগৎ আছে যার নিজস্ব নিয়ম থাকা উচিত :

> one command, one joy, one desire,
> one curse, one weight, one measure
> one King, one God, one law.

—দ্বিতীয় অংশ, ৪৭-৪৯ ছত্র

চিরন্তন দেবতারা স্বভাবতই ইউরিজেনকে সহ্য করতে না পেরে নির্বাসন দিলেন। আগুন ঝড় ও রক্তের নানা পরীক্ষায় ইউরিজেন কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর সেই বিচ্ছিন্ন চিন্তার ভিতরে মানুষের জগৎ সূচিত হলো একদিন। সৃষ্টির পথ ক্রমবিভাজিত। ইউরিজেনের মধ্য থেকে লস্ (Time) ও এনিথার্মন্ (Space)— এই দুজন মানব-মানবী এলেন। এনিথার্মনকে সুইনবার্নের কথা মতো 'Universal or typical woman' বললে অনেক কথাই বাকি থেকে যায়। তিনি লস্ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেন, এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টি 'চিরন্তন থেকে বিশ্লিষ্ট' ('rent from Eternity') হতে লাগল। এই বিচ্ছিন্নতা এত নিদারুণ যে তার প্রাচীরের আড়াল থেকে ভালোবাসা নয়, দয়াই সম্ভব :

> It is not love I bear to Enitharmon : It is Pity
> She hath taken refuge in my bosom and I cannot cast her out

Four Zoas । প্রথম রাত্রি

এনিয়ন হলেন লস্ ও এনিথার্মনের জননী। তিনি একজন ছায়াময়ী নারী এবং বর্ষীয়সী এই জননীর কান্না ব্লেকের পৌরাণিক কবিতাবলীর পশ্চাৎপট আচ্ছন্ন ক'রে আছে। *Four Zoas* নামে আখ্যায়িকায় মানুষের এই মৌল ঐক্য থেকে নির্বাসন ও পুনর্মুক্তির সংকেত আছে। ইউরিজেন বিবেকী বুদ্ধি, উর্থোনা বা লস্ সত্ত্বশক্তি, লুভাহ্ সংরাগ এবং থার্মেস্ শরীরী শক্তির প্রতীক— প্রত্যেকে পারস্পরিক সংহতির কাজে লাগতে পারলেই মানুষের পথের অনিশ্চিতি কেটে যাবে। সুইডেনবোর্গ ও ব্যোহমের ধারণা, বিশেষত দ্বিতীয় জনের যন্ত্রণাময় আত্মসন্ধান ও বিশ্বচেতনার[১] বোধ থেকেই ব্লেকের এই পৌরাণিক

১ *The works of Jacob Boehme* । চার খণ্ডে অসম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ। প্রকাশ : ১৭৬৪-৮১, লণ্ডন ; প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

চেতনার আভাস এসেছিল। ব্যোহমে লিখেছিলেন 'আমার মধ্যে আমি তিনটি জগৎ খুঁজে পেলাম। একটি জ্যোতির্বিশ্ব, আরেকটি অগ্নিময়, নারকীয় ; সর্বশেষ জগৎটি হলো ঐ দুই অন্তর্মুখী এবং আত্মিক স্তরেরই বহির্জাত রূপ মাত্র। তখন আমি বুঝলাম মন্দ-ভালোর মধ্যে কী অভিন্ন শক্তি আছে ; দুয়েরই অব্যর্থতা বুঝতে পেরে অনন্তের জঠর থেকে নিষ্ক্রান্ত নানাজন্মের রহস্য আমি বুঝতে শিখলাম'— ব্লেকের মধ্যে সারাজীবন ধ'রে এই কথাগুলির অনুরণন আছে। সেমেটিক পুরাণগুলির সঙ্গে ব্লেকের ঘনিষ্ঠতা যে নিতান্ত প্রাথমিক ছিল না, তা বোঝা যায় মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বে উল্লিখিত সর্বনির্মাতা রা-আতুমের শূন্যকাতর আত্মবিভক্ত অস্তিত্বের সঙ্গে ইউরিজেনের পরিকল্পনায় বহুলাংশিক সারূপ্যে। তাঁর বিমিশ্র চেতনার সঙ্গে সবচেয়ে আত্মীয়তা বোধহয় জালালুদ্দিন রুমী-র, যাঁর 'মসনভী'র দ্বিতীয় খণ্ডে পাপীদের স্বর্গ-অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও 'দিবান-ই সামস্-ই-তব্রিজে' আছে একই সঙ্গে একক ও যৌথ মানুষের কথা। ব্লেকের 'All Religions are one' মূলত সেই এক সুরেই বাঁধা। ব্লেক রুমী থেকে খুব সম্ভব কিছু গ্রহণ করেননি, দুজনের মনের মিলের কথাই এখানে বলা হয়েছে। *Four Zoas*-এর অনেক আগে থেকেই ব্লেকের মনে আলো-অন্ধকারের যে-টানাপোড়েন চলেছিল, তার প্রতিলিখন থেকে বোঝা যাবে নিজের কথা বলবার জন্য বিভিন্ন পুরাণকে ব্লেক কিভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন :

Then tell me, 'what is the Material World, and what is it dead ?'
He, laughing, answer'd : 'I will write a book on leaves of flowers,
If you will feed me on love-thoughts, and give me now and then
A cup of sparkling poetic fancies ; so, when I am tipsy,
I will sing to you to this soft lute, and show you all alive
The world, and every particle of dust breaths forth its joy.'

—*Europe—A Prophecy*

আমার মনে হয়, মিশরীয় পুরাণে মানবীয় নিয়তির অনুলেখক থথ্ (গ্রীক হার্মেস) ব'লে যে-দেবতাকে দেখি স্বর্গের বৃক্ষের পাতায় পাতায় প্রত্যেক মানুষের জীবন লিখে রাখছেন— এখানে তিনিই প্রতিশ্রুতিব্যঞ্জক হয়ে নতুন পোশাক প'রে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমত, ব্লেকের জীবনের অন্যতম দ্বন্দ্ব— কবির সঙ্গে ভাবীকথকের দ্বন্দ্ব— এখানে ফুটেছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক 'বিশেষ' মানুষের অন্তর্নিহিত যে-অপরিমিত আলো এবং প্রত্যেক 'বিশেষ' মানুষের অন্তর্নিহিত যে-অপরিমিত আলো এবং প্রত্যেক 'বিশেষ' ধূলিকণায় বিশ্ববীক্ষণের যে-

সম্ভাবনা—এখানে ব্লেককে তাই চিন্তিত করেছে এবং এখানকার মতো একাধিকবার প্রচলিত হেলেনীয়, সেমেটিক ও খৃষ্টীয় ধর্ম-পুরাণের গৃহীত কাঠামোকে বদলাতে প্রবুদ্ধ করেছে। হুইট্‌ম্যানও অণুতম বালুকণা ও সর্ব-সাধারণের মধ্যে পূর্ণকে অনুধাবন করেছিলেন। ব্লেকের 'Memorable Fancy' পর্যায়ের সুরেলা গদ্যরীতির সঙ্গে হুইটম্যানের কিছুটা স্বরসাম্য থাকলেও সমধর্মিতা ঠিক ছিল না, তার কারণ বিশেষীকরণের চেয়ে সাধারণীকরণেই তাঁর আগ্রহ ছিল। তাছাড়া অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ যেভাবে 'Old Age Echoes'-এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তা পৌরাণিক চিত্রকল্প ব্যবহারে হুইটম্যানকে উৎসাহিত করেনি।

'নিরালা মানুষের বেদনা'— চেস্টরটন কথাটা সম্ভবত কথাচ্ছলে বলেছিলেন। ব্লেক এই বেদনাকে জেনেছিলেন। নাস্তিময় ইঙ্গিতে মানুষের মধ্যে তা 'Spectre' হয়ে কাজ করে, যাকে দ্রবীভূত ক'রে না দিতে পারলে শাস্তি নেই। অন্যদিক থেকে, বিচিত্র বিষম মানুষের রূপাবলী দেখতে ব্যগ্র ছিলেন ব'লেই ব্লেক চসারের রচনার ছবি এঁকে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখেছিলেন, কেননা চসার, তাঁর ভাষায়, বিচিত্রকে বন্দনা করেছেন ও চিরন্তন ('eternize') ক'রে গেছেন। জেরেমি টেলারের মতো তাঁরও মননের একটি লক্ষ্য ছিল 'To secure the persons' ; অন্যথা, বিচিত্রকে না দেখে নিজেকেই যিনি দেখেন ব্লেকের কাছে তিনি অন্ধ গড়নির্ণয়ের ('ratio') অপরাধে অপরাধী। হপ্‌কিন্সের 'Singularity' ব্লেকের চেতনা বহন করছে। হপ্‌কিন্সের কবিতা আজকের পাঠকের কাছে সার্থক ছন্দোনিরীক্ষার নমুনা হিসেবেই সম্মানিত। কিন্তু সেই নিরীক্ষার আড়ালে তাঁর যে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব কাজ করেছিল, সে-কথা আমরা ভুলে যাই। হপ্‌কিন্স, অন্তত সেই দিক থেকে, ব্লেক ও আজকের যুগবেদনার মধ্যে একটি যোজকের মতো কাজ করছেন।

ব্লেকের প্রথম পর্বের রচনা *Songs of Innocence* ও *Songs of Experience*— একটি আরেকটির বিপ্রতীপ। প্রথমটিতে আছে প্রতিধ্বনিময় সবুজের ব্যঞ্জনা, দ্বিতীয়টিতে ব্যঞ্জনাহীন কান্না ; প্রথমটিতে শিশুর আনন্দ ও ধাত্রীর প্রশান্তি, দ্বিতীয়টিতে শিশুর আনন্দেও ধাত্রীর বিরক্তি। কিন্তু এই দুই বিপ্রতীপ কোণ ব্লেকের মনে পরস্পর সমান হয়ে তাঁর পরবর্তী রচনা তথা আধুনিক কবিতার সঙ্গে যোগসেতুর মতো কাজ করছে। 'Contraries meet in one' ব'লে ডান্ মানুষের সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার জন্যে অনুতপ্ত প্রার্থনা

কবিতা, ছবি ও গান ওঠে বা নামে তার উপরে। মানুষের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল শুধু শিল্প, প্রজ্ঞা আর বিজ্ঞান।' ব্লেকের অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসম। দ্বিপদী রচনায় আশ্চর্য সফল ব্লেক্ আয়তনিক রচনায় অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর যুগে কবিপ্রসিদ্ধির রূপবন্ধ 'সনেট' সম্ভবত একটিও লেখেননি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি তাঁর অনেক বক্তব্য সংকুচিত ক'রে সুমসৃণ হতে রাজি নন। ব্লেকের কবিতা তাঁর জীবনের ধারাবাহিক আত্মবিবরণী। অনেক সময়ে কোনো চিঠি লিখতে গিয়ে কবিতা সেই চিঠির মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। সেদিক দিয়ে দেখলে তাঁর কবিতাও পত্রধর্মী, কেননা সেখানে চিঠির বর্ণনাগুণ ও প্রত্যক্ষতা দুয়েরই প্রাচুর্য।

'লিরিক' থেকে তাঁর বিবর্তন 'লিটারারি এপিকে'র রূপবৈচিত্র্যে এবং তাঁর এই রূপান্তর তাঁকে বুঝবার সহায়তা করে। রূপকল্পের ঐ পার্থক্য মাত্রাগত, কেননা 'ব্যক্তিগত' ব্লেকই আপ্রাণ নিজের সঙ্গে যুঝে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর *Book of Thel* (১৭৮৯) থেকে *The Ghost of Abel* (১৮২২)— দীর্ঘ তেত্রিশ বছর এই অন্তর্যুদ্ধের পরিচয় রক্তাক্ত মানচিত্রের মতো তিনি এঁকে গিয়েছেন। নিজেকে ও সব মানুষকে দেখতে চাওয়ার আলোয় তাঁর কাছে প্রকৃতিবিশ্বও মানুষের মূর্তিগ্রহ করেছে; আবার সেই প্রকৃতিকেই তিনি অজস্রবার তাঁর রচনায় লাঞ্ছিত ক'রে মানুষকে তার স্বাশ্রয়ী শিল্পচৈতন্যে জেগে উঠতে বলেছেন। ওআর্ডস্বার্থ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে পরা-প্রকৃতির যে-নভোমণ্ডলে পৌঁছেছিলেন ব্লেক থেকে তার অবস্থান দূরে নয়:

> Life, I repeat, is energy of love
> Divine or human, exercised in pain,
> In strife, in tribulation ; and ordained,
> If so approved and sanctified to pass,
> Through shades and silent race, to endless joy.
>
> —*The Pastor*। পঞ্চম সর্গ

ব্লেক মানব-প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে এই একই জায়গায় পৌঁছেছিলেন:

All Human Forms identified, even Tree, Metal,
Earth and Stone ; all
Human Forms identified, living, going forth and returning wearied
Into the Planetary lives of Years, Months, Days and Hours ;
reposing

And then awaking into His bosom in the life or Immortality.
And I heard the name of their Emanations ; they are named Jerusalem.

—*Jerusalem*-এর সর্বশেষ অংশ

বাইবেলের একদিকে Job-এর সংঘাতময় আত্মসমীক্ষা, অন্যদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের স্নিগ্ধ 'Covenant' বা আনন্দময় গ্রন্থিবন্ধনী। ব্লেক পাপ এবং প্রেম— এই দুটি পরশপাথরেই ব্যক্তি ও বিশ্বময়কে পরীক্ষা ক'রে নিয়েছিলেন। কোলরিজের অপ্রাকৃত অনিশ্চিত, ব্লেকের অপ্রাকৃত অনন্ত। এবং ব্লেক প্রাত্যহিক ও মানবিক প্রয়োজনে সেই পরা-প্রকৃতকে ব্যবহার করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রসঙ্গে শুধু সেই বিস্ময়স্তব্ধ ছোটো মেয়েটির প্রথম প্রশ্ন ছিল 'মা, ঈশ্বর কি তখন থেকে আর বাড়েননি, একটুও বাড়েননি ?' ব্লেক এই প্রশ্নটিকেই যেন মেনে নিয়ে বললেন :

God becomes as we are, that we may be as he is.

—**There is no Natural Religion**-এর প্রথম অংশের সিদ্ধান্ত

এবং বিশ্বাস করলেন যে :

As All men are alike in outward form, so (and with the same infinite variety) all are alike in the poetic genius.
No man can think, write, or speak from his heart, but he must intend truth. Thus all sects of Philosophy are from the Poetic Genius, adapted to the weakness of every individual.

— **All Religions are One** থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র

এই নিখিল কবিপ্রতিভার অংশীদার মানুষ ও ঈশ্বর, বিচ্ছিন্ন মানুষ ও সমাহৃত মানুষ। ধর্ম ও সভ্যতা, ভাবনা ও মূল্যবোধ সবই এই সৃজনী কবিপ্রতিভার উৎসারণ— নইলে ব্লেক কিছুই মেনে নেবেন না। জীবনদেবতা যীশু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে একজন অনন্য শিল্পশিক্ষক। 'Surface Man'-এর পর্দা খুলে আত্ম-আবিষ্কৃতি— এদিক দিয়ে হয়তো তাঁকে মিস্টিক বলতে পারি ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অর্ফিক ও এলুসিনিয় জগতে অথবা বৈদিক স্তোত্রের নীলিমায় যে-মরমী অতীন্দ্রিয়তা আবিষ্কার করেছিলেন, ব্লেক সেই ধ্রুপদী জগতের ঘনিষ্ঠ অধিবাসী নন। রোমান্টিক ও মিস্টিক— এই দুই ভাবমেরুর মাঝখানে যে অবিজিত উপত্যকা আছে ব'লে আমরা অনেক সময় মনে করি, ব্লেকের জীবন ও কবিতা সেই গৃহীত ব্যবধান অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। 'All that lives is holy'—

এই কথাটি উচ্চারণ করবার জন্য তিনি নচিকেতার মতো মৃত্যুর সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। স্বর্গের যান্ত্রিক সহজ শান্তিতে সন্দিগ্ধ তাঁর ইউরিজেনের হাতে পৃথিবী দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার রাজ্য হয়ে উঠেছিল; তিনি নিজে আবার সমস্ত বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্রকে মৌলস্বর্গে নিয়ে গেলেন, যেখানে এক ও অনেকের মিলনে রচিত পরিণত শান্তির ছবি আছে। দেবদূতদের সম্মেলক গান সেখানে শোনা যাচ্ছে:

The Elohim of the Heaven swore vengeance for sin. Then
Thou stoods't
Forth, O Elohim Jehovah, in the midst of the Darkness of
The oath, All clothed.
In Thy covenant of the Forgiveness of sins. Death, O Holy!
Is this Brotherhood?
The Elohim saw their oath, Eternal Fire: they rolled apart,
trembling, over The
Mercy seat, each in his station fixt in the firmament by Peace,
Brotherhood and Love.

—*The Ghost of Abel*

শিল্পাচার্য শিলার

দ্বিশতবার্ষিকী ১৭৫৯-১৯৫৯

জর্মনিতে শিলারের জন্ম। সেই জন্মদিন আজ থেকে দু-শো বছর আগে, ১০ই নভেম্বর। কিন্তু আজও তাঁর জন্মভূমিতে তিনি অন্যতম একজন সমকালীন কবি। এর কারণ স্পষ্ট। বিভক্ত জর্মনির ভগ্নহৃদয় শুধু বার্লিনের দিকে তাকালেই তো চোখে পড়ে। এই নগরের দুই অংশে আজ সব-কিছুই দ্বিধাদীর্ণ। মুদ্রাবিন্যাস, শাসনপ্রথা, খবরের কাগজ, নীতিমূল্য— এক অংশ থেকে আর এক অংশ সব দিক থেকেই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। এ ওর মুখ দেখলে চমকে ওঠে, আর দুয়ের মধ্যে আরোপিত ভেদরেখা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু অনিশ্চিতভাগ্য দুটি ভগ্নাংশের অতলে একটি অভিন্ন হৃদয়ের মতো ভূগর্ভস্থ জলসরবরাহব্যবস্থা। পরস্পরবিশ্লিষ্ট দুই জর্মনির ভিতরে ভিতরে কি আজ একই স্বপ্ন, একটিই এষণা? শিলারের রচনায় সেই স্বপ্নৈষণা যতো সহজে আশ্রয় পায়, এমন বোধ হয় আর কোনো তদ্দেশীয় কবিতে নয়। বলা বাহুল্য, কোনো প্রকটিত জাতীয়তাবোধের প্রতিনিধিত্ব এই লোকপ্রিয়তার হেতু নয়। রবীন্দ্রনাথের মতোই, শিলারের 'স্বদেশে'র মূলে বিশ্বজগৎ বিধৃত হয়ে আছে। আর সেই বিস্তীর্ণ স্বাদেশিকতার লক্ষ্য হলো সর্বমানুষের মুক্তিকামনা। শিলারের অধিকাংশ রচনার নায়ক হলো সৈনিক। এবং তাঁর যাবতীয় রচনার মূলসূত্রটি মুক্তিরস।

'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ টেল' নাটকের শেষ পংক্তিটি লক্ষ্য করলেই উপরের কথাটি বিশদ হতে পারবে। সুইৎসারল্যাণ্ডের বিপ্লবনায়কের অপূর্ব এই আলেখ্য যখন চিত্রিত হয়ে গেছে, পাহাড় থেকে গান ভেসে আসছে, 'সুইৎসারল্যাণ্ডের মুক্ত নারীর সঙ্গে মুক্ত পুরুষের' সেই মিলনমুহূর্তে রুডেন্‌ৎস ব'লে উঠল—

'আজ থেকে আমার সমস্ত ভৃত্য সম্পূর্ণ স্বাধীন'

প্রসঙ্গ থেকে ছিন্ন ক'রে নিলে এই ছত্রটি শুধু কবিত্বহীন নয়, নাটকের পক্ষেই অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু সব মিলিয়ে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে-ব্যঞ্জনা এই কাব্যনাট্যে ছড়িয়ে আছে, এই বিবৃতি তারই অন্তর্ভুক্ত, তারই সম্পূরক। 'পিক্কোলোমিনি' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে কোলরিজ শিলারের বিশেষ এক ধরণের নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় ঐতিহাসিক নাট্যবৃত্তের তুলনা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে

গঠনশিল্পগত মন্থরতার কথাই কোলরিজ বলতে চেয়েছিলেন। কথাটাকে যদি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে বোঝা যাবে, ইতিহাসের মধ্য থেকে মুক্তিসংগ্রামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিষ্ঠা ফুটিয়ে তোলা শিলারের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল। ইতিহাসের ভিতর থেকে মানবাত্মার এই অবারিত উন্মোচন তিনি যেভাবে এঁকে গিয়েছেন তার উন্নত ভাবগ্রাম রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের সঙ্গেই তুলনীয়। 'কালান্তর' অথবা 'সভ্যতার সংকটে'র মতো ঋজুবাক্ সাবধানবার্তা তিনিও শুনিয়েছেন : 'আর সমস্ত যেমন, মানুষের সত্তাও তেমনি ইচ্ছাশক্তিতে মণ্ডিত। সুতরাং, সেই কারণেই শক্তির স্বেচ্ছাচারের মতো মানুষের পক্ষে এমন অনপনেয় কলঙ্কের আর কিছুই নেই। শক্তি দিয়ে যে আমাদের হানে, সে মনুষ্যত্বব্যাপারের উপরেই অনাস্থাকুটিল। কাপুরুষের মতো যদি কেউ তার কাছে মাথা নত করে, তবে সেও তার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলে।'[১]

তাঁর এই বলিষ্ঠ ইতিহাস-প্রাণনা যে তাঁর অনুব্রতী থিয়োডোর ক্যের্ন অথবা হারওয়েম-এর মতো শীর্ণচেতা নয়, সেটি বোঝাতে গিয়ে একজন লেখক প্রথমোক্ত জনের কাছে লেখা শিলারের চিঠি থেকে একটি অমূল্য অংশ উদ্ধৃত করেছেন—

'তোমরা জর্মনেরা মিথ্যেই নিজেদের নিয়ে একটা জাতি গড়তে চাইছ। তার পরিবর্তে বরং তোমরা স্বাধীনতর মানুষ হতে চেষ্টা করো। সেটাই সহজ হবে।'[২]

যা স্বদেশের সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন, সেই মানবীয় মুক্তিকে তিনি সবচেয়ে সহজ তত্ত্ব বললেন। বন্ধন আছে, তা থেকে মুক্ত হতে হবে আরও মুক্ত হতে হবে, এবং তার পরে আরও। তাঁর নন্দনতত্ত্বেও এই ক্রমমুক্তির আস্পৃহা সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

শিলার স্বচ্ছ ক'রে সব কথা বুঝে উঠতে পারেননি, এ-রকম অভিযোগ করলেও ক্রোচে তাঁর প্রাসঙ্গিক চিন্তাধারণার যে-সারসংকলন করেছেন, সেটি তাৎপর্যপূর্ণ : 'খেলা কথাটা বলতে গিয়ে spiel-এর মতো একটা অসংলগ্ন শব্দ শিলার ব্যবহার করেছেন। তিনি এর সাহায্যে সাধারণ খেলাধুলো বোঝাতে চাননি, অথবা কোনো বাস্তবিক আমোদকৌতুকও নিশ্চয়ই তাঁর বক্তব্যের

---

১ 'উদ্বোধন সম্পর্কে' 'Über das Erhabane'

২ পর পর দুইটি উৎকলনই Benno Von Wiese-র *Schiller* পুস্তিকা থেকে গৃহীত।

উদ্দেশ্য ছিল না। শিলারের কাছে উদ্দিষ্ট খেলার পৃথিবীটা চিন্তা আর অনুভূতির মাঝখানে। শিল্পে প্রয়োজনবাদ স'রে গিয়ে মুক্ত প্রাণের অবাধ বিকাশ দেখা দেয়। স্বভাব আর প্রকৃতি, বস্তু আর রূপের দ্বন্দ্ব সেখানে মীমাংসিত হয়। সুন্দর হলো জীবন, কিন্তু সে-জীবন জৈব জীবন নয়। একটি সুন্দর মূর্তির জীবন আছে, একটি জীবিত লোকের তা নাও থাকতে পারে। শিল্প প্রকৃতিকে রূপকল্প অথবা প্রকরণ দিয়ে জয় করে। মহৎ শিল্পী বস্তুকে রূপ দিয়ে মুছে দিতে পারেন। একজন শিল্পীর শিল্পকর্মের বস্তুত্ব সম্বন্ধে আমরা যতো কম সচেতন থাকি ততোই সেই শিল্পীর মঙ্গল বা মহত্ত্ব। রসগ্রাহীর সত্তা যেন শিল্পকর্ম থেকে সেই পবিত্রতা সেই পরিশুদ্ধি লাভ করে যা শিল্পীর রচনাসমাপনের সময়ে তার মধ্যে ছিল। তুচ্ছ বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো নমনীয় ক'রে তুলতে হবে। এর বিপরীতও সত্য। মানুষ যখন নিজেকে পৃথিবীর বহির্ভূত রেখে তাকে নন্দনদৃষ্টিতে দেখতে পারবে, সেই দেখাটাই সত্যদর্শন। যখন সে ইন্দ্রিয় সংবেদনের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক মাত্র, সে তখন পৃথিবীর সঙ্গে এক, একাকার— সে কি ক'রে তখন পৃথিবীকে উপলব্ধি করবে? শিল্প হলো নিয়তিকৃত নিয়মরহিত। শিল্পের মধ্যস্থতায় মানুষ ইন্দ্রিয়পুঞ্জের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, আর সেইসঙ্গে যুক্তি ও নীতি-ঘটিত দায়িত্ব থেকে ছুটি পেয়ে সুস্থির ধ্যানের সচ্ছল অবকাশ এক মুহূর্তের জন্য যাপন করে।'[৩]

ক্রোচের কণ্ঠস্বর, এই এক অনুচ্ছেদব্যাপী প্রতিবেদনের মধ্যেই, বেশ অসহিষ্ণু। আসলে কাণ্টের প্রতি অনুরাগবশত তাঁরই মতো শিলার ভাব ও রূপের অতিশায়ী অথচ ভাবরূপান্বয়ী যে-স্তরটির কথা বলেছিলেন, সেটিকে অঙ্কের মতো প্রমাণ করেননি ব'লে ক্রোচের বিরক্তি। সেই অতিমানসের স্বর্লোকটিকে অস্বীকার করতে পেরেছেন ব'লে রোমাণ্টিক কবিদের সম্বন্ধে বেনেদেত্তো ক্রোচে যে-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, তা যে অনেকটাই অবান্তর, শিলারের রচনা থেকেই তার যথেষ্ট নজির মিলবে। শিলারের ঈপ্সিত অতিমানসের জগৎটি কাণ্টের পথেই প্রস্তাবিত, কিন্তু কাণ্টের চেয়ে তা স্পষ্টতর। প্রকৃতি ও ব্যক্তিপ্রকৃতির মধ্যে বিভাজিকা সূত্রে তিনি নানা জায়গায় যে-সব কথা বলেছেন তার দু-একটি অনুধাবন করলেই এক সঙ্গে ক্রোচের অভিযোগের উত্তর দেওয়া হবে আর আমাদের ধারণাও অনেকটা পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে। শিলার তাঁর নন্দনতত্ত্ব-

---

৩ হাইডেলবার্গে দার্শনিকদের সভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতাটির নাম 'Pure Intuition and the Lyrical Character of Art'

বিষয়ক পত্রাবলীর তৃতীয় পত্রে বলেছেন: 'মানুষ তার জন্মমুহূর্তে প্রকৃতির কাছে তেমন-কিছু বিশেষরকম সদয় বিবেচনার পরিচয় পায় না…কিন্তু যেহেতু সে মানুষ তাই সে স্বভাবজঙ্গম, সে তো কখনোই প্রকৃতিনির্দিষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্যে ব'সে থাকতে পারে না। মানুষ তার মনন দিয়ে এগিয়ে যায়, নিছক প্রয়োজনকে মুক্তির সমস্যায় পরিণত করে, দৈহিক চাহিদাকে পারে নৈতিক নিয়মে উত্তীর্ণ করতে।'[৪]

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তবেই অতিপ্রাকৃতকে পাওয়া যাবে, নইলে সেই অতিপ্রাকৃতের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকতেই পারে না— তাঁর আর একটি রচনায় তিনি শরীর ও আত্মার এই দ্বৈতাদ্বৈত সমস্যা অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। একটি অংশ:

'মানুষ যে আত্মিক, এই কথাটা বোঝার জন্য আগে তার জৈবিক হওয়া প্রয়োজন। আগে সে ধুলোয় হামাগুড়ি দেবে, তার পর তো নিউটনের মতো বিশ্বপাড়ি দেবে। তাই শরীর হলো গতির প্রথম শর্ত, ইন্দ্রিয় হলো পূর্ণতার প্রথম সোপান।'[৫]

শিলারের উর্ধ্বস্তরটি বস্তুর উপরে, কিন্তু নির্বস্তুক বা অস্পষ্ট কোনো অর্থেই নয়। আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রথম আলংকারিক শিলারকে তাঁর নামের উপরে নিক্ষিপ্ত 'যিশুতুল্য' 'প্রাক্-রোমান্টিক' ইত্যাদি অতিরিক্ত উপাধিব্যূহ থেকে সরিয়ে সাহিত্য-বিচারের অঙ্গনে উপনীত করলেই তাঁর মনের নিরাবৃত উপলব্ধি ধরতে পারব। 'প্রাচীনেরা প্রাকৃতিক (বা স্বাভাবিক) ভাবেই অনুভব করেছিলেন, আমরা প্রকৃতিকে (বা স্বভাবকে) অনুভব করি' কথাটি 'তন্ময় ও মন্ময় কবিতা' ('Über naive und sentimentalische Dichtung') শীর্ষক

৪ পড়তে পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ পড়ছি: 'যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে… মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন।…আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে করিয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে— কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব।…যেখানটায় মানুষের সমস্ত আবশ্যক সীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিতেছে। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীতে পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে।' —'উৎসবের দিন', মাঘ ১৩১১, ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড।

৫ 'মানুষের পশুপ্রকৃতি ও অধ্যাত্মশক্তি'

প্রবন্ধের বীজপংক্তি। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের চরিত্রপ্রভেদ দেখাতে গিয়ে শিলার এখানে মানবমনের সেই আত্মলীন অভিমানের উপর হাত রেখেছেন; যে-প্রবণতা থেকে যথাক্রমে পরবর্তী রোমান্টিকতা ও প্রতীকান্বিত কবিতা তথা আধুনিক সাহিত্যের জন্ম।

ধ্রুপদী সাহিত্যকে যেমন তার বস্তুস্বভাবী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি সশ্রদ্ধ প্রশ্ন করতে ছাড়েননি, শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রেও শিলারের পরিপ্রেক্ষণী অনেকটা একই রকম। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক :

'যখন শেক্সপীয়রের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, সেই শৈশবেও তাঁর মনের নিষ্ঠুর শীতলতা দেখে দুঃখ পেয়েছিলাম। নিশ্চেতন একটা মনোভাব, যা তাঁকে গভীরতম দুঃখকে নিয়েও কৌতুক করতে প্ররোচিত করে— হ্যামলেট, কিং লীয়ার, ম্যাকবেথ ও অন্যান্য নাটকের অরুন্তুদ দৃশ্যগুলিতেও বিদূষকের বাচালতা দিযে ব্যঙ্গ করতে শেখায, এই একবার আমাব হৃদয়ে ভাবনাগুলির তালে তালে চলে, আবার পরক্ষণে হৃদয়হীন গতিতে এগিয়ে গিয়ে হৃদয়কে তার অভীষ্ট বিরাম থেকে বঞ্চিত করে— এইসব দেখে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। পরিচয় ঘনিঠ করার সঙ্গে সঙ্গে এই লেখককে আমি তাঁর কর্মের মধ্যে খুঁজতে গিয়েছি, তাঁর হৃদয়কে বুঝতে চেয়েছি, বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে গিয়েছি। সংক্ষেপে, বিষয়কে বিষয়ীর মধ্যে অনুধাবন করতে গিয়ে বিফল হয়েছি— একজন কবি কোথাও সংস্পর্শের যন্ত্রণা পাবেন না, এটা আমার কাছে দুবিষহ ঠেকেছে··· ।'

আর একটু পরেই প্রকৃতিপন্থী কবিদের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রকৃতিপন্থী কবিদের প্রভেদসূত্র বোঝাতে গিয়ে মানবসভ্যতায় বিবর্তিত মানুষের উপরে তিনি আলো ফেলেছেন : 'আগে প্রকৃতির সঙ্গে সে এক, তার পর শিল্প এসে সেই প্রকৃতি থেকে তাকে পৃথক করে, ভিন্ন করে, শেষে আদর্শ এসে তাকে লুপ্ত ঐক্যের অভিমুখে নিয়ে যায়।···কিন্তু, আদর্শ যেহেতু পরাৎপর, মানুষ, বিশেষত অনুশীলনশীল মানুষ তাকে পায় না। এবং তার পদ্ধতিও তাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হতে পারে না। সেদিক দিয়ে প্রাকৃতিক মানুষ সৌভাগ্যবান, কেননা সে অনায়াসেই তা পারে।[৬]··· তৎসত্ত্বেও, দুই পদ্ধতি তুলনা করলে বুঝি, সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে

৬ শিল্প ও প্রকৃতির এই অপীড়িত আত্মীয়তার কথা শেক্সপীয়র নিজেই পলিক্সেনস-এর মুখে বলেছেন :

যে-মানুষ তার কাম্য পরিণতির দিকে চলেছে প্রকৃতিপন্থী মানুষের চেয়ে সে বহু-গুণে মহত্তর।'

শিল্পকে তাহলে কোনো সুনীতিসঞ্চারিণী সমিতিযন্ত্র হিসেবে নয়, পূর্ণতার উপায় ব'লেই শিলার ভেবে নিয়েছিলেন। শিল্প হলো সভ্য মানুষের সবচেয়ে বড়ো বাহন যার সাহায্যে সে দুরারোহ আদর্শের দিকে যাত্রা করে, নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগী হয়। এই আদর্শ, সন্দেহ নেই যে অগম্য, কিন্তু এটাই কি সেই ধ্রুব অতিমানসের মূর্তরূপ নয় ?

শিল্পীর ধর্ম নির্মোহ লীলাবাদ। তিনি খেলা করবেন, তা ব'লে খেলাচ্ছলে কিছু করতে চাইবেন না। 'Spiel' বা খেলা কথাটিতে কোনো অচল অথবা স্বতশ্চল তত্ত্বের ভাবানুবাদ তিনি আরোপ করেননি। তাঁর পরিণত বয়সের কবিতা 'একটি ঘণ্টার গাথা'র শেষ দিকে এই কথাটিকে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেটা দেখা যেতে পারে। একটি ঘণ্টা এই কবিতায় নিখিলমানব-নিয়তির প্রতীক হয়ে উঠেছে, সৃজনী মানুষ নির্মিত ঐ ঘণ্টাটিতে নিজ ভাগ্যকে বিশুদ্ধভাবে ধারণ করতে চাইছে :

'যে উদ্দেশ্যে গড়েছেন নির্মাতা
সেই ব্রত ওর হৃদয়ে রহুক গাঁথা :
ধরার জীবন হতে সে দূরোদ্দেশী
স্বর্গের নীল খিলানে লগ্ন হবে,
এই ঘণ্টা যে বজ্রের প্রতিবেশী,
তারার দেশের সীমান্তে জেগে রবে।
সমূর্ধ্ব হতে কণ্ঠ আসুক ভেসে
নক্ষত্রের যৌথ সঞ্চরণে

Perdita — For I have heard it said
There is an art which in their piedness shares
With great creating nature.

Polixenes — Say there be ;
Yet nature is made better by no mean
But nature makes the mean ; so, over the art,
Which you say adds to nature, is an art
that nature makes.

(*Winters Tale*, IV / iii)

মঙ্গলগান স্রষ্টার উদ্দেশে
সে-ও যেন করে বর্ষ আবর্তনে।
যা শুধু মহান্, যা শুধু চিরন্তনী,
ধাতব আনন সেই সুরে উন্নীত,
স্রোতের পাখায় চলুক দিনরজনী
ওর বুকে যেন সবি রয় পুঞ্জিত।
নিজের জিহ্বা নিয়তিরে দিক ঋণ,
সে নিজে যদিও হৃদয়হীন, পাষাণ,
হৃৎস্পন্দনে তবু ওর রিনিরিন
পরিবর্তনপ্রবাহে মানবপ্রাণ।
ঘণ্টারে ছেড়ে চলে মন্দ্রস্বর,
স্বর ঝ'রে যায়, ম'রে যায় শ্রুতিমূলে,
এ-কথা শেখায় : সমস্ত নশ্বর,
সব চ'লে যায় মর্তবাঁধন খুলে।

'পরিবর্তনপ্রবাহে মানবপ্রাণ' কথাটি 'Das Lebens Weohsvolles *Spiel*'-এর অক্ষম অনুবাদ। তাহলেও পরিবর্তনের মুখে রূপের জন্ম, এই ইঙ্গিতটি এখানে অন্তত আভাসিত হয়েছে। 'সৌভাগ্য' ('Das Gluck') কবিতার প্রসঙ্গ এখানে অপরিহার্য। সময় সেখানে সব-কিছুকে 'এক রূপ থেকে রূপান্তরে' (Von Gestalt Zu Gestalt) উপনীত করছে। তাহলে রূপের উপাসনা, উদাসীন সময়ের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধিত্বের পবিত্র সাহস থেকেই জন্ম নিয়েছে : এটি শিলারের মূল কথা। এর পাশে এই পংক্তিগুলি রাখলেই তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য ধরা পড়বে :

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।[৭]

সাদৃশ্যের আড়ালে পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। প্রকৃতি বা জীবন অথবা মৃত্যুর

৭ 'শাজাহান', বলাকা'

কাছে শিলারের কোনো প্রত্যাশা নেই। তিনি তার অন্তর্বিস্মৃত শক্তিতে বিশ্বাসী, কিন্তু নিজের সৃষ্টিকে সেই শক্তির সম্মোহনকর্মে নিযুক্ত করার ইচ্ছা তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসত্যকে চিরসুন্দরের সঙ্গে সুশ্লিষ্ট দেখতে চেয়েছেন, দেখেছেন। পক্ষান্তরে, শিলার সত্য ও সুন্দরের বিচ্ছেদবেদনা জেনে আপাতত স্বরচিত স্বর্গের জন্য চেষ্টিত। সেই স্বর্গে তারাই যেতে পারে যারা মানবজীবনের অপম্রিয়মাণ রঙের নক্‌শা দেখেছে, বুঝেছে। খেলা করতে করতে সেই স্বর্গে যেতে হবে, কেননা খেলার মধ্যে স্বার্থের সংকীর্ণতা নেই। এ-কথা রবীন্দ্রনাথও অজস্রবার বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বর্গে শুধুমাত্র ক্রীড়াকুশল শিল্পকেই স্থান দেননি, আরও অনেক পর্যায়ের মানুষকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। শিলারের স্বর্গের ছাড়পত্র শুধু শিল্পীরাই পায়, তার কারণ তারাই সঠিক মানুষ— মুমুক্ষু মানুষ। শিল্পীর কাজ খেলা করতে করতে বস্তুবিশ্বের পাশে একটি মায়াবিশ্ব রচনা করা; যেখানে তিনি বন্দী অথচ বিমুক্ত। এই মুক্ত বন্দীদশার মধ্যেই স্রষ্টার বাসনা আকার পরিগ্রহ করে। নীচের দুটি শ্লোক থেকে এই কথাই মনে আসে, শিলারের 'Spiel', শেষ বিশ্লেষণে এবং অন্ত্য সংশ্লেষে, ভারতীয় 'মায়া' বা সৃষ্টিশক্তির কাছে দাঁড়ায়:

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতং
অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥[৮]

'বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং (বর্তমান) অপর যাহা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্টজগতে অবিদ্যা দ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হন। ৪।৯

প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহে এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। ৪।১০'[৯]

'তন্ময় ও মন্ময় কবিতা' প্রবন্ধে যে-ভাবনা প্রথম উচ্চারণের উদ্দীপনায় চঞ্চল,

৮ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪।৯-১০

৯ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড।

'ট্র্যাজেডিতে কোরাসের ব্যবহার' ('Uber der Gebrauch des in den Tragodie') প্রবন্ধে তা আরও অনেক আয়ত বা আত্মস্থ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির (১৭৯৫) সাত বছর পরে শেষের প্রবন্ধটি (১৮০৩) লেখা। এই সাত বছরের ব্যবধানে তাঁর চেতোদর্পণ অনেক মার্জিত হয়েছে। তা ছাড়া আরও একটি যোগাযোগ এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। এই বছরেই তাঁর *Braut Von Messina* নাটকটি সম্পূর্ণ হয়। ভাইমারে ১৭ই মার্চে এটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর জুন মাসে যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই ভূমিকায় এই অপ্রতিম প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট হয়। ধ্যানধারণার প্রত্যক্ষতা এই আলোচনাটিকে চিরদিনের সাহিত্য-বিচারের একটি নিকষপাথর ক'রে তুলেছে। এর দু-একটি অনুচ্ছেদ স্মৃতিধার্য : 'কবির কাজ শব্দচয়ন, বাক্যযোজনা। লিরিকধর্মী ট্রাজেডিতে এই শব্দসমষ্টির সঙ্গে সংগীত এবং ছন্দঃস্পন্দ সহগামী। ফলে একটি কথা সহজবোধ্য, কোরাস যদি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবেদনক্ষম এই সমাবেশ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তা নাটকের একান্ত মিতব্যয়ী সংহতির পক্ষে নিতান্তই আবর্জনার মতো ঠেকবে। কাহিনী বেড়ে-ওঠার পথে তবে তা প্রতিবন্ধক, দৃশ্যমায়া রচনার পক্ষে ক্ষতিকর, দর্শকের কাছে ক্লান্তিকর। শিল্প তো শুধু ক্ষণদ আমোদ বিতরণ করে না, ক্ষণমুহূর্তের নিষ্ক্রান্তির স্বপ্নকেই শুধু চরিতার্থ করে না। শিল্পের যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তা হলো এই যে, সে আমাদের একেবারে মুক্ত ক'রে দেবে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জগৎকে বাস্তবিক একটি দূরত্বে স্থাপন করার প্রতিভা আমাদের মধ্যে জাগ্রত সংস্কৃত ও পরিস্রুত ক'রে সে সার্থকতা অর্জন করে। নইলে তো ঐ রুক্ষ বস্তু মলিন জগৎটা বোঝার মতো দুঃসহ ঠেকে, আমাদের উপরে জান্তব সংসর্গ বিস্তার ক'রে আমাদের অধঃপাতে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের শুদ্ধচিত্তের স্বচ্ছন্দ ব্রতে ও বিহারে তাকে দ্রবীভূত ক'রে দিয়ে সে বস্তুপুঞ্জের উপরে ভাবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। আবার ঠিক এই কারণেই যথার্থ শিল্পের জন্য কিছুটা বস্তুভিত্তি ও বস্তুভূমি দরকার হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র সত্যের প্রতিভাসে তার তৃষ্ণা মেটে না। সত্যের জমিতেই শিল্প তার আদর্শের সৌধ তুলে ধরে, প্রকৃতির শক্তসবল ও গভীর ভিত্তির 'পরেই তার ভরসা।...ট্র্যাজেডিতে এই হলো কোরাসের ভূমিকা। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থে কোরাস একটি ব্যক্তি নয়, একটি সার্বভৌম ধারণা। ধারণা হলেও মূর্ত, স্পৃশ্য শরীর আছে তার যা ইন্দ্রিয়বেদ্য এবং মহিমান্বিত। ঘটনাবলীর সংকুচিত পরিসরকে সে ভুলে গিয়ে অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে, সুদূর মহাকালে মহাদেশে আর বৃহৎ মানবতার দিগ্বলয়ে বিস্তারিত হয়ে যায়। জীবনের

মহান্ ফলাফল নিষ্কাশিত করবার জন্য, প্রজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করবার জন্য তার এই বিস্তৃতি। কিন্তু এই সবই সে কল্পশক্তির অমিত প্রাণবেগে লিরিকমুক্তির দুঃসাহসে করে, ঈশ্বরের নিশ্চিত চরণপাতে এইভাবেই সে মর্তবিষয়গুলির শিখরদেশে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এবং এই উত্তরণের জন্য চাই গীতি ও ছন্দের সংযোগ, সুর ও স্পন্দনের মিলন।' এই উক্তিপরম্পরার মধ্যে শিলারের সারা জীবনের সমস্ত ভাবনা গ্রথিত হয়েছে।[১০] *Braut Von Messina* নাটকের জন্য তাঁর লেখা একটি কোরাস আপাতত স্মরণীয়। ডন কাইজার বিয়াত্রিচের কাছে প্রেমের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করল। পরক্ষণে সে তাকে বিমূঢ় দোলাচলে রেখে চ'লে যেতেই কোরাস গাইলো :

সুখী সে মানুষ, আমারও সে বরণীয়,
পালায় মুখর ব্যসন দম্ভ থেকে
শিশুসম, যার প্রকৃতি শয়নগৃহ,
সমতল-ঘেরা শান্তিতে আছে জেগে।
রাজার ভবনে হৃদয় আমার কাঁপে,
যবে হেরি ঐ দর্পশিখর হতে
স্খলিত সকলি পরিণামী সন্তাপে,
মাঝারি ও বড়ো, সব ভেসে যায় স্রোতে।

এই কোরাস যে সোফোক্লেসেরই ম্লান বিবর্ণ প্রতিরূপ মাত্র সে-কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না :

সুখী যে মানুষ, নিষ্পাপ রহে জীবনপাত্র যার ;
যদি বা দৈব দুর্বহ নামে কারো ভবনের মাঝে
তবে সেই নয়, ডুবে যায় তার সমস্ত সংসার,
থ্রেসের বাতাস অভিসম্পাতে কালভৈরবী নাচে,
কীর্তিনাশিনী সমুদ্র করে সহাস্য হাহাকার,
কলঙ্করেখা তীরের নয়ানে, কালো তরঙ্গ যাচে
পাতকের ফল কূলে কূলে অনিবার,

১০ শিল্প প্রকৃতিকে অনুসরণ করে না, প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ উৎসকে অনুসরণ করে এবং প্রকৃতির উপরে আপন ধ্যানলব্ধ রূপারোপ করাই তার কাজ— প্লোটিনাসও এই কথা আর এক ভাবে ব'লে গেছেন। Bernard Bosanquet-এর *History of Aesthetic* (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৩-১৪) বইখানিতে সন্ধানী পাঠক তার খোঁজ পাবেন।

পঙ্কিল স্রোত থামে না যে থামে না যে,

পারাবার জুড়ে ঘুরে চলে পাপ, নাশ করে পরিবার।

—আন্তিগোনে

সুতরাং *Braut Von Messina* নাটকটিকে শিলারের শ্রেষ্ঠ বলার উপায় নেই। তাঁর অনুরাগী কার্লাইল বা ভক্ত টোমাস মান্‌ও তা বলেননি। টোমাস মান্ এখানে তাঁর নিরীক্ষার মূল্য স্বীকার ক'রে যে এই নাটকের কোরাসগুলিকে শিলারের 'ধী-মতী দীপ্তির সর্বোত্তম উদাহরণ' বলেছেন, সে-সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ আছে। কিন্তু এই নাটকে শিলারের শ্রদ্ধার্হ ব্যর্থতা তাঁর শিল্পবীক্ষার অসারতা নিশ্চয়ই প্রমাণ করছে না। তাঁর এই নাটক চিরায়ত হতে চেয়ে ধ্রুপদী নাটকের কাঠামোর মধ্যে ধরা দিয়েছিল। এর অব্যবহিত পরেই তিনি 'ভিল্‌হেলম টেল' লিখলেন। এই নাটকের একটি কোরাস শোনা যেতে পারে:

তীর ধনুক সঙ্গে তার,
পাহাড়চূড়ে, ঝর্নাতে,
শিকারী ঐ, আলোর দ্বার
খোলে যখন ভোররাতে।
ঈগল যেমন সর্বময়
নভোনৃপ, দিগন্তে;
পাহাড় বন করল জয়
শিকারী ঐ, কী মন্ত্রে।
দিগ্বিজয়ী মনপবন,
হাওয়ায় চলে পথ কেটে,
মিলিছে ওর আকিঞ্চন
পশুপাখির সঙ্কেতে।[১১]

'ভিল্‌হেলম টেল' নাটক হিসেবে গতিময় এবং স্রোতগ, সুতরাং সফল। কোরাস সম্পর্কে শিলারের অভিব্যক্তি কি 'গীতি ও ছন্দের সংযোগে, সুর ও স্পন্দনের মিলনে' নিষ্পন্ন এই কোরাসেই সাধিত হয়নি! অবশ্য মূলের চারিত্র এই তর্জমায় যে কিছুমাত্র সংরক্ষিত হয়নি, এ-কথা মেনে নিয়েই এ-রকম প্রশ্ন করছি। গ্যেটের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের হৃদয়ী ও নৈর্ব্যক্তিক ফলশ্রুতি, তাঁর 'গানের মায়া' ('Die Macht des Gesanges') কবিতায় যে নম্র গীতিগুণ আর 'দস্তানা'

১১ দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

('Des Handschuch') প্রভৃতি কবিতায় যে অমোঘ নাটকীয়তা— সবই সেই পরিণতিতে চলেছিল যেখানে কোরাস হৃদয় এবং যুক্তির মিলনের মধ্য দিয়ে জীবনের সমস্যা বিবেকী যৌবনে নিরসন করে। 'সূক্তিকণা' (Tabulae Votivae') পর্যায়ে পরিণত যৌবনের জয়ধ্বনি ক'রে তাই তিনি যে-দ্বিপদী লিখলেন তার মধ্যে কোনো সন্দেহবাষ্প নেই :

বিশ্বাস করো, উপকথা নয়, যৌবনধারা নিত্য চলে,

কোথায়, আমাকে জিজ্ঞাসা করো? কবির শিল্পে সে যে উথলে।

মৃত্যুকে নিয়ে নানা বিদ্রূপ করেছেন শিলার। যেমন, 'ছাখো ঐ প্রতিভাবান শিল্পীটি নিভন্ত মশাল নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু তা ব'লে তোমরা যেন মৃত্যুকে নন্দনতত্ত্ববিৎ ভেবো না।' মৃত্যু নন্দনতাত্ত্বিক না হোক শিলারের মৃত্যু তাঁর নন্দনতত্ত্বেরই মতো। ১৮০৫-এর ৯ই মে তারিখে তাঁর মৃত্যু। এর তিন মাস আগে তিনি তাঁর অনূদিত রাসীনের *Phedre* নাটকের অভিনয় দেখেছেন। এই অনুবাদকর্মই তাঁর জীবনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কাজ। 'ডিমিট্রিউস' ব'লে যে নাট্য রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন, সেটি অসমাপ্তই রয়ে গেছে। এর নায়ক হিপ্পলিটাসও তাঁর জন্মলব্ধ স্বভাব বা প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু, শিল্পীর মৃত্যু, বীরের মৃত্যু। রথের মধ্যে স্তব্ধ বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন, এমন সময় সমুদ্রে ঢেউ বাড়ল, একটা দৈত্য এল, তার সামনে একটা ষাঁড়, পিছনে ড্র্যাগন। সবাই পালাল, হিপ্পলিটাস ছাড়া। তিনি বীরের মতোই যুঝলেন, শেষে রথের ঘোড়াগুলো খেপে উঠতেই তাদের বল্গায় তাঁর দেহ জড়িয়ে গেল। এইভাবে নিয়তির সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলো, মুক্তি হলো।

সন্ধিক্ষণের সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

উনবিংশ শতাব্দী একদিক দিয়ে যেমন গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে, অন্যদিক থেকে যেন আবার আমাদের অলস, অস্পষ্ট স্মৃতির মৃগয়াভূমিও হয়ে উঠেছে। তরুণ গবেষকের কাছে শ্রমসাপেক্ষ এবংবিধ একটি বিষয়বস্তু যেমন হাতের কাছে আর নেই, তেমনি নির্বস্তুক আদর্শের সম্মোহ নিয়েও ও-রকম আর কোনো একটি বিশেষ সময়কে আমরা মনে মনে তিলোত্তমাসম্ভব ক'রে তুলি না। গবেষণা এবং স্বপ্নৈষণা— এ দুয়ের মাঝখানে অচিহ্নিত অধিত্যকার মতো ঐ শতক চোখের উপর ঝাপ্‌সা হয়ে প'ড়ে রয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সংগঠনশীল সংস্কারকের, দ্বিতীয়ার্ধ সৃজনী শিল্পীর। প্রথমাংশে ভিত্তিমৃত্তিকা গঠন, দ্বিতীয়াংশে মালঞ্চ নির্মাণ। কখনো কখনো একই ব্যক্তি তাঁর জীবনে ঐ দুই প্রবণতাকে সমাহৃত করতে পেরেছেন। কেউ-বা হয়তো স্বপ্ন দেখতে দেখতে অতঃপর মানব সমাজের মধ্যে কিছু একটা রূপান্তর ঘটাবার আগ্রহে অকস্মাৎ জেগে উঠেছেন। এরি মধ্যে উদ্দেশ্যবাদী উনিশ শতক তার সংজ্ঞাশীর্ণ সীমারেখা লঙ্ঘন ক'রে বিশ শতকের দিকে যখন ধাবিত হচ্ছিল, যুক্তি-যুগ আর সন্য রোমান্টিকতায় মিশ্রিত শতাব্দীর চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকল। দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র-অক্ষয়কুমার, রমেশচন্দ্র-ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ সংক্রান্তি মুহূর্তের সাধকশিল্পী। উনিশ শতকের একটি পরিণাম এবং বিশ শতকের সূচনাপর্বের মধ্যে এঁরা যোজকের মতো বিরাজিত।

ইতিহাসকে পর্ব বিভাগের মধ্য দিয়ে দেখানো যায়। কতকগুলি প্রধান যুগভাবনা অথবা কোনো যুগপ্রধানের নামে ইতিহাসের এক একটি সময় চিহ্নিত হয়েছে। এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ পদ্ধতির উপযোগিতা তর্কাতীত। কিন্তু কোনো একটি সময়-অধ্যায়কে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার স্বচ্ছতায় ধারণ করতে গেলে ঐ বিভাজনী পদ্ধতির অমোঘতা ঈষৎ ক্ষুণ্ন হতে পারে। উনিশ শতককে বুঝবার সুবিধের জন্য সাহিত্যব্রতী কোনো ঐতিহাসিক যে-যুগবিভাগ করেছেন সেটি প্রসঙ্গত এখানে প্রদত্ত হলো :

১ খৃষ্টীয় যুগ : মিশনারীবৃন্দ ১৮০০-২০

২ ইংরেজি-শিক্ষণ যুগ : হিন্দু কলেজ অথবা ডিরোজিও ১৮২০-৩০

৩ সংস্কার অথবা বেদান্তপন্থী যুগ : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ১৮৩০-৫৯

৪ নব্য-হিন্দু যুগ : বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ দেব এবং বিজয়কৃষ্ণ ১৮৫৯-১৯০০

[—*Studies In Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry* (*1857-1887*) গ্রন্থে হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত]। এই চতুষ্কচিত্র আঁকতে গিয়ে সচেতন ঐতিহাসিক ভোলেননি '**the four broad divisions … have only a relative significance with reference to each particular period which has its own bearing on the growth and development of this new poetry**' এবং ঐ আপেক্ষিক তাৎপর্যের আয়তনের মধ্যেই ঐ চতুঃসীমার সার্থকতা। কিন্তু যে-মুহূর্তে এই সীমালেখ্য হাতে নিয়ে আলোচ্য সময়ের ভূগোল খুঁজতে যাবো, আরো অসংখ্য পর্বাঙ্গ আমাদের দৃষ্টিতে বিবৃত হবে। বিশেষত ১৮৫৯-১৯০০ এই সময়ের স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে শুধুমাত্র হিন্দুত্বের পুনর্ণব ভাষ্য টীকা আবিষ্কার ক'রেই ক্ষান্ত হলে সম্ভবত বহিরাশ্রয়িতার পরিচয় দেওয়া হবে। এই সময়কার নিহিতার্থ হিন্দু ধর্মের যুগোচিত কথকতায় নেই, ভারতীয়তার সঙ্গে য়ুরোপীয়তার নতুনতর সম্পর্ক সন্ধানেই সেই বিশেষত্ব নিহিত। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই যুগধর্মকে **Neo-romantic** বলেছেন।

নব্য-রোমান্টিকতার লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের দ্বৈরথের কথা মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন। প্রকৃতি ও মানবসত্তা, আদর্শ ও স্বাভাবিকের মধ্যে তীব্র বিরোধ কী ক'রে শেষে একটি সমন্বিত সার্থকতায় চৈতন্যের মধ্যে অযুগ্মসিদ্ধি লাভ করে, তারও বিশদ বিবরণী তিনি জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর *New Essays In Criticism* গ্রন্থে আত্মার সংগ্রামের এই রক্তোজ্জ্বল ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। বইটির নাম আপাতদৃষ্টিতে আর্ণল্ডীয়। কিন্তু এই গ্রন্থ ম্যাথু আর্ণল্ডের *Essays In Criticism*-এর ভারতবর্ষীয় সংস্করণ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভিক্টোরীয় পূর্ব সংস্কার থেকে আশ্চর্যভাবে বিশ্লিষ্ট এর দৃষ্টিকোণ।

তিনি যে তাঁর ঐ ক'খানি রচনা প্রধানত ইংরেজিতেই লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তার কারণ কোথায় সেটি জেনে নেওয়া এখানে প্রাসঙ্গিক। শ্রীঅরবিন্দের মতো ব্রজেন্দ্রনাথও ইংরেজি ভাষায় মাতৃভাষার সচ্ছলতা অর্জন করেছিলেন, এটি নিশ্চয় সম্ভাব্য একটি যুক্তি। কিন্তু গভীরতর একটি যুক্তি রয়ে গিয়েছিল ব'লে মনে হয়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় ভারতীয় শাস্ত্র, স্তোত্র বা ধর্মীয় ধ্রুব সাহিত্য নব্য ভারতীয় বাংলা ভাষায়

অনূদিত হওয়ার সময় বিশেষ একটি ঝোঁক পেয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকেই হয়তো ঐ অনুবাদচর্চা অন্তর্মুখী একটি উদ্যম পেয়েছিল। প্রখর যুক্তিবাদী অক্ষয় দত্তও যে ঐ পুনরুজ্জীবনব্যাপারে একটি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাঁর ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থখানি তার প্রমাণ। কিন্তু সে-বইখানি বিদেশী রচনার অবলম্বনে রচিত। এখানেই রমেশচন্দ্র বা ব্রজেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এঁরা যে চিরায়ত ভারতবর্ষের কল্পপ্রতিমা উপলব্ধি করেছিলেন তা যদিও প্রাচী-প্রতীচীর পারস্পরিক তুলনায়নে আকীর্ণ তবু কোনো বৈদেশিক ছাঁচ তাঁদের গ্রহণ করতে হয়নি। এঁদের জগৎ (রমেশচন্দ্রের উচ্চারিত দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলি সত্ত্বেও) দেশী বা বিদেশী নয়, বিশ্বদেশী। এঁরা বিশ্বনগরের কাছে ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে ইংরেজি ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে ভাষা নির্বাচন ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের চেয়েও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে আরো মনন-শাণিত এবং একলক্ষ্য ব'লে মনে হয়। তাঁর **The Gita** ও **Rammohun The Universal Man** (প্রথমটি পুস্তিকা ও দ্বিতীয়টি দুটি ভাষণের সংগ্রহ) বিশ্ব-বাসীর কাছে চিরন্তন নতুন ভারতবর্ষকে যথাযথভাবে উপস্থিত করবার আগ্রহে ইংরেজি ভাষায় লিখিত। শৌখীন ট্যুরিস্ট বা জ্ঞানান্বেষী কোনো কোনো বিদেশী চিন্তানায়কের কাছে আধুনিক ভারতবর্ষ যেহেতু প্রত্নভারতীরই একটি বিক্ষিপ্ত অথচ আত্মীয়-রূপভেদ, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজী রচনাবলীতে বারংবার এই কথা উত্থাপন ক'রে গিয়েছেন যে আধুনিক ভারত ব্যক্তিরই অস্থির হৃদয় থেকে উদ্ভূত ভারতবর্ষ। ব্যক্তি ও ভারতবর্ষের এই সমার্থদ্যোতক মূর্তিটি তিনি রামমোহনের মধ্যে নিরীক্ষণ ক'রে প্রসঙ্গত বলেছিলেন :

History is a confluence of many streams bringing together conflicting cults and cultures, conflicting national values and ideals ; and those who can find peaceful solution of these problems of conflict are the true heroes of laterday Humanity. They are men who blend and fuse diverse lives in their own life—history and diverse conflicting types in their own personal types. Such are the heroes of peace, heroes on synthesis and conciliation.

কথাটা ঘুরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'আমাদের পক্ষে কিন্তু **Renaissance**-এর বিচিত্রভোগ নিতান্ত বিচিত্র নহে। ভারতে কত অগণিত ধারা আসিয়া মিলিয়াছে, সুতরাং বহুরূপে বহুরসে আমাদের রসভঙ্গ

হয় না। তবে আমরা সেই খণ্ডরূপ ও খণ্ডরসকে এক রসে পরিণত করি—সেইটা life elemental, life universal। ভারত এই মধু বিতরণ না করিলে কে করিবে। তবে যাহাদের জীবন অত্যন্ত তিক্ত ও বিস্বাদ, তাহারাই মধু আস্বাদে মধুময় হইবে···বহু সামগ্রী আহরণ না করিলে—বহু চয়ন না করিলে—আমরা এই এক রসে পরিণত করিব কোন্ অ-বস্তু?'

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ হোমার্ঘ *The Quest Eternal* কাব্যগ্রন্থে এই জীবন-ভিত্তি (life elemental) এবং আবিশ্বজীবনের (Life Universal) সমস্যা সমাহৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকী, সাহিত্যিক মহাকাব্য 'সাবিত্রী' একটি ধ্যানের অতিমানসী প্রতিমা; ব্রজেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহাকাব্য *The Quest Eternal* আধুনিক মানবের রক্তাক্ত অন্বেষণের দর্পণ। এই কাব্যের তিনটি অংশ পারম্পরিকতায় বিন্যস্ত। প্রথম অংশ ধ্রুবপদে (Ancient Hymn) অর্ধ-গ্রীস অর্ধ-প্রাচী। একজন ভারতযাত্রী গ্রীক পুরোহিত তাঁর দ্বীপভূমিতে ফিরে এসে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। ভারতপুরাণ-শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে সেই পুরোহিতের একাত্মতাবোধ ইতিহাসদত্ত সত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ সেই সাধর্ম কবিদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে মধ্যযুগের কুহকপটু বীরপুরুষের গাথা (The Rime of the Wizard Knight) প্রকৃতির যবনিকার মধ্য দিয়ে আত্মার রহস্য জেনে নিতে চলেছে সে। ঐ যুবা পুরুষকে ঘিরে সমগ্র মধ্যযুগের হারানো সময়সত্তাকে কবি-ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ ধরেছেন। অন্তিম পর্যায়ে শুধু অনিঃশেষ অন্বেষণ। যুগমানুষের স্বপ্নস্বরূপ, তার জীবন সন্ধান (A Vision of Psyche or the Quest of Life) বর্ণনাসূত্রে জাগতিক প্রথার বিরুদ্ধে তার উত্থান ও সময়ের উপাখ্যানও এখানে জীবন্ত ভাষায় চিত্রার্পিত হয়েছে।

পাঠকের মনে পড়বে গ্রীক ও উনিশ শতকী রোমান্টিকের দুই প্রোমেথেউসকে। Gnostic বা ব্যক্তিক দ্রষ্টাদের ভাবানুষঙ্গ মনে পড়বে মধ্যযুগীয় মিরাকল-মরালিটি যীশুনাট্যপ্রবাহ এবং 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' রূপকবৃত্তান্ত যা দ্বিজেন্দ্রনাথকে স্বপ্ন-প্রয়াণ রচনা মুহূর্তে উদ্দীপ্ত করেছিল। ক্রবাদুর বাউলদের শৈশবস্বপ্ন আর ফাউস্টের জর্জরিত সত্য-জিজ্ঞাসা— এই রকম অজস্র উৎকণ্ঠিত মুখচ্ছবিও মনে হবে তাঁর প্রসঙ্গে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে-দুটি নিকট নাম বেজে উঠবে তাঁরা হলেন ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ।

ওয়ার্ডস্বার্থ মানবসত্তা ও নিসর্গপ্রাণের যে-অন্বয় চেয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাকে মনঃসংশ্লেষণ (Synthetic Imagination) নাম দিয়েছেন। কিন্তু আজকের এই

বিশ্বমানব যুগে ইতিহাসের মর্মে নূতনতর বিশ্ববোধি (Synthetic Intuition) প্রয়োগ করবার অভিপ্রায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছেন। ওয়ার্ডস্বার্থীয় প্রকৃতি-মরমিয়াবাদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ রয়ে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই তিনি কোলরিজের কাছে সাহায্য নিয়েছেন। কোলরিজের 'The Rime of the Ancient Mariner', কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে-চলা আত্মার তিমিরাভিসার এবং অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বের সঙ্গে সান্নিধ্যের প্রতিবেদন বিধৃত আছে। এমন-কি প্রকৃতিও অতিপ্রাকৃতের আধার। এরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সমীক্ষার আতঙ্কসুন্দর যাত্রাপথ। ব্রজেন্দ্রনাথের 'Nor Maid, nor Child/But God's own Head /Rises on thy prophet, blind/In thy awful night profound/The Hour assigned of vision's Greater Mystery' যে কোলরিজের 'Nor dim nor red, like Gods own head/The Glorious sun uprist' ইত্যাদি অংশের মূর্ছনাবহ তা বুঝে নেওয়া দুরূহ নয়। কোলরিজের প্রণীত প্রথম ও দ্বিতীয় কণ্ঠের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ আরও একটি স্বরসংযোজন করেছেন : ঐ তৃতীয় কণ্ঠটি 'Synthetic' (ব্রজেন্দ্রনাথের প্রিয়তম শব্দ) যা সমস্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ ও রূপান্তরিত করছে। লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই, প্রকৃতি ও মানবস্বরূপের যে-বিচ্ছেদ আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রবণতার প্রথম পথিকৃৎ। সেই বিচ্ছেদ যে ভারতীয় চেতনার মধ্যবর্তিতায় তৃতীয় সত্তার ভিতরে মিলনান্ত হতে পারে, তিনি তার পূর্বাভাসও জ্ঞাপন ক'রে গেছেন।

কবি এবং দার্শনিকের (এ-ক্ষেত্রে আবার ঐতিহাসিক ও ভাবী কথকের সম্পর্কও ঘটেছে) সহাবস্থান কখনো কখনো বিপজ্জনক। ব্রজেন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে কোলরিজের মতোই সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। যদিও দ্বিতীয়োক্ত জনের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই চলে না। 'The norm and test of poetry' সম্পর্কে তাঁর প্রাক্-প্রস্তুতিও আমাদের নজর এড়ায় না। হয়ত সেই স্তূপীকৃত প্রাক্-প্রস্তুতি তাঁর মহাকাব্য প্রয়াসখানিকে বড়ো বেশী পরিশ্রমচিহ্নিত ক'রে তুলেছে। কেননা, প্রাক্-রোমান্টিক ইংরেজি কবিতায় প্রাপ্য প্রদত্ত সূত্রসার (argument) এবং কোলরিজসুলভ পার্শ্বভাষ্য, এমন-কি, থীসিসগন্ধি পাদটীকা এবং বিশদ পরিশিষ্ট প্রভৃতি বৈদগ্ধ্যদোষ তাঁর কাব্যে প্রচুর। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, এই কবি হেম-নবীনের মহাকাব্যিক বাগ্বোত্তম কোথাও প্রদর্শন করেননি, একটি মহতী

সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কবিতাকে বিদ্যায়তনের অদূরেই স্থাপন করতে গিয়ে তিনি কুণ্ঠিত হননি, কেননা, তাঁকে যে একটি যুগসন্ধির শিল্পরূপের সংজ্ঞা দিতে হবে সে-বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন।

'দি কোয়েস্ট ইটার্ণাল' কাব্যের বৃহদংশ রচিত হয়েছিল গত শতকের ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে। এই শতকে কবি অন্তিম অধ্যায়টি সমাপ্ত করেন। গত শতাব্দীর জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের অঙ্কিত বৃত্ত ভেঙ্গে এই শতকের বিক্ষুব্ধ বৃত্তাংশ গড়বার সৎ সাহস ব্রজেন্দ্রনাথকে আমাদের সময়ে অগ্রগামী সতীর্থের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক মানুষের কাজ, তাঁর ভাষায় '**the creation of a personality with individual scheme of life, and individual outlook on the Universe.** আমরা আজ আরেক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু ব্যক্তি কি এখনো ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ সেই বিন্যাস অর্জন করেছে যা ব্রজেন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল ?

একটি শতবার্ষিকীর জন্য

(অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার, জন্ম ১৮৭৫)

আরো দশ বছর যদি আমরা বাঁচি, আমাদের সময়ের একজন মানুষের একশো বছর উপলক্ষে নিবিড় একটি জন্মদিন যাপন করবো। সেজন্য এক দশকের নিরন্তর প্রস্তুতি দরকার। যদিও বাংলা ভাষায় তাঁর নামের বানান বা উচ্চারণ কীভাবে করবো সে-বিষয়েও এই মুহূর্তে আমার অন্তত ধারণা নেই কোনো। শোয়াইৎজার তাঁর কিশোরকাল বাহিত করেছেন সেই উপত্যকায় যেখানে ফরাসি-জর্মন জীবনধারা মিশে আছে। যুগ্মসংস্কৃতির এই সন্তান ঐ উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে 'ফরাসি ভাষা যেন সুন্দর পার্কের বিন্যস্ত রাস্তা, আর জর্মন ভাষা যথেচ্ছ বিহারের মহারণ্য।'

শেষে একদিন সত্যিই এই মানুষটি স্বস্তিমসৃণ উদ্যান থেকে বেরিয়ে পড়লেন দারুণ সুন্দর অরণ্যে। যখন চতুর্দিক থেকে নিরাপত্তা তাঁকে বেষ্টন করেছে, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিরক্ষ আফ্রিকার জঙ্গলের ডাক্তার হবেন। তিরিশ বছর বয়সের জন্মদিনে এ-রকম শপথ গৃহীত হয়েছিল। তাই অবৈধ কৌতূহল জাগে, ভাবতে ইচ্ছে করে বুঝি-বা কোনো বানানো বিষাদে অথবা মুহূর্তের উত্তেজনায় ঐ উৎসর্গবাসনা পোষণ করেছিলেন শোয়াইৎজার। নাকি বীরপুরুষের মতো তাঁকে দেখাবে, এটাই অভিপ্রেত ছিলো তাঁর! আমাদের এই সমস্ত গোপন অনুমান অকস্মাৎ নিরস্ত ক'রে তিনি ব'লে উঠেছেন, কার্লাইলের *Heroes and Hero Worship* তেমন কিছু গভীর গ্রন্থ নয়; আসলে অঘটনঘটন বীরের ধর্ম নয়, আত্মত্যাগ আর আহুতির মধ্যেই যথার্থ বীররস। উৎসর্গিত এ-রকম পুরুষও, তাঁর মতে, পৃথিবীতে অনেক, অথচ খুব কম জনই তাঁদের জানে।

নিজে তিনি দ্বিতীয়োক্ত পর্যায়ের আশ্চর্য পুরুষ, অগোচরে বীরের দায়িত্ব বহন যাঁর অভিপ্রায় ছিলো। এবং আজ যখন সারা জগৎ তাঁর নামের নিশান তুলে ধরেছে, তখনো কি তিনি শিকড়ের সাংকেতিকতায় প্রচ্ছন্ন নন? শিল্পী, না সংস্কারক? দার্শনিক, না ধার্মিক? কী তাঁর পরিচয়? নাকি সব মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি যার কল্পনা করার স্পর্ধাও আজ আর নেই আমাদের।

তাঁর জীবনের এক একটি ঘটনায় সংজ্ঞাতিগ ঐ সর্বতা মুদ্রিত হয়ে আছে।

পুত্রহারা এক বৃদ্ধা নদীর তীরে পাথরে ব'সে কাঁদছেন, শোয়াইৎজার তাঁকে হাত ধ'রে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখলেন সেই কান্নার শেষ নেই, হঠাৎ অনুভব করলেন সূর্যাস্তের পড়ন্ত আলোয় দুজনেই একসঙ্গে অরব কান্নায় ভেসে যাচ্ছেন। আরেকবার একটা স্টেশনে সস্ত্রীক তিনি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে প্রচুর মোট। একটি পঙ্গু লোক এগিয়ে এসে বলল, সাহায্য করবে। প্রখর দুপুরে ভিড় ঠেলে সে যখন মালপত্র নিয়ে চলতে থাকলো, শোয়াইৎজার সেই স্মৃতির মর্যাদা রাখবেন ব'লে স্থির করলেন ভবিষ্যতে ভারি বোঝা নিয়ে কাহিল কারুকে দেখলে তিনিও সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন। একবার উল্টো ফল হলো। বিপন্ন একটি লোকের ভার লাঘব করতে গিয়ে দেখেন সে ওঁকে চোর ঠাউরেছে।

মনে পড়ে যায়, অনুষঙ্গের আংশিকতায়, আমাদের বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনের সমস্ত খসড়া যেন উন্মুক্ত যার প্রতিটি পৃষ্ঠা আদর্শ উদাহরণের মতো ব্যক্ত হয়েছে। শোয়াইৎজার, আমাদের অপর আপনজন, আত্মার তিমিরাভিসারের ভিতর দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে রৌদ্রে এসেছেন। এবং ঐ পরিণতির প্রসাদগুণ সত্ত্বেও তাঁর জীবনে অতি সাধারণ এবং অত্যন্ত সুগোপন মানবিক গুণাবলী জড়িয়ে আছে। গ্রেহাম গ্রীনের কোনো উপন্যাসে তাই শোয়াইৎজারের আদলে এমন একটি সাধারণত্বে অসাধারণ মানুষকে আঁকা হয়েছে যার বিষয়ে এ-রকম উপকথা গ'ড়ে উঠেছে, বনের মধ্যে গিয়ে পলাতক কুষ্ঠরোগীকে সারারাত বৃষ্টির মধ্যে বুক দিয়ে আগলেছেন। আর, আশ্চর্য, তাঁকেই সবাই ভুল বুঝছে।

শোয়াইৎজার বলবেন, ভুল বুঝুক, তবু মানবজীবনের একেবারে গোড়ার কথা সত্যকাম অঙ্গীকার। ধর্মতত্ত্বের পাঠ নেওয়া সারা হলে তাঁর অধ্যাপক থিওবাল্ড ৎজাইগ্‌লার তাঁকে বললেন দর্শনশাস্ত্রে থিসিস তৈরি করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে অধ্যাপকের ছাতির ছায়ায় সব কথা পাকা হয়ে গেল, তিনি সোর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাণ্টের ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে গবেষণা চালাবেন। কিন্তু প্যারিসে এসে জরুরিতর আকর্ষণ হয়ে উঠলো যন্ত্রসংগীত। উন্মাদের মতো শিখতে থাকেন অর্গ্যান, পিয়ানো। বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এই সব যন্ত্রে অধিকার নিলেন, বুঝতে পারলেন অঙ্গুলি একাগ্র হয়ে স্পর্শভাষাকে যেমন ক'রে গ'ড়ে তুলছে, অদৃশ্যকে স্থাপত্যে আনতে হবে। এরই মধ্যে রাত্রি জেগে তাঁর গবেষণা চলল, দেখলেন কাণ্টের ধর্মীয় দর্শনে অমরতা সম্পর্কে কোনো মাথাব্যথা নেই, আছে পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা। আছে গভীর চর্যা, নেই সামঞ্জস্য।

অথচ গভীরতাকে সহজের সামঞ্জস্যে অনুবাদ করাই সেদিন তাঁর কাছে প্রধান সমস্যা ছিল। ডক্টরেট অর্জিত হলো, দার্শনিক কাণ্ট থেকে শুরু ক'রে সংগীতস্রষ্টা বাখ পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে বই লিখলেন, কিন্তু কখন যে তিনি অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গের দ্বৈরথ মিটিয়ে আদিবাসীদের সেবায় আত্মদান করবেন ব'লে মনস্থ করেছেন, একজন চাপা প্রকৃতির বন্ধু ছাড়া আর কেউ সে-কথা জানতেন না। অর্গ্যানগুরু উইডর তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। যখন তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা শুনলেন, ভর্ৎসনা ক'রে উঠলেন: 'তুমি কি যুদ্ধের গোলাবারুদের মধ্যে একখানা রাইফেল ঘাড়ে ক'রে সেনাপতি সাজতে চলেছো?' একজন রীতিমতো আধুনিকা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন: 'আদিবাসীদের জন্য জীবন না সঁপে বক্তৃতা দিলেই তো ব্যাপারটা ভালোভাবে চুকে যায়। গ্যেটের ফাউস্টের ঐ কর্মযোগের বচন এখন বাতিল। এ-যুগে প্রোপগাণ্ডাই সব ঘটাতে পারে।' আরো বাধা ছিলো। থিওলজিক্যাল সেমিনারির অধ্যক্ষপদ না হয় ছাড়লেন, কিন্তু ডাক্তারি না জেনে ডাক্তার হবেন কী ক'রে? স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর ধ'রে চিকিৎসাশাস্ত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। ঐ শাস্ত্রজ্ঞান যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাঁর রহস্যময় সমগ্রতার সঙ্গে গ্রথিত অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ ঐ সময়ে একই বছরে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ-দুটির বিষয়: 'ঐতিহাসিক যীশুর সন্ধানে' এবং 'জর্মন ও ফরাসি অর্গ্যান নির্মাণ ও অর্গ্যানবাদন।' ধর্ম-প্রচারক পলের জীবনভাষ্য লেখবার অব্যবহিত পরেই অধ্যাপক ও প্রচারকের কাজ ছেড়ে দিলেন। যীশুর জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজলেন, সে-বিষয়ে অন্বেষী গ্রন্থ লিখলেন। আফ্রিকায় রওনা হলেন। ল্যাম্বারেনে পৌঁছে তিনি, তাঁর স্ত্রী শত্রুপক্ষের মানুষ হিসেবে অন্তরীণ হলেন এবং ঐ বন্দিদশাতেই সভ্যতার মর্মকথা সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ শুরু ক'রে দিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ। হাসপাতালের কাজ করতে অনুমতি পেয়েছেন, এবং কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা। অগোয়ে নদী ধ'রে সূর্যদেবতা ন'গোমো-পূজার দেশে যেতে গিয়ে চকিতে উপলব্ধি করলেন তাঁর দর্শন: জীবন সম্পর্কে মৈত্রীবিনয়, Reverence for life. নিজের জীবনপ্রসঙ্গে তিনি সেন্ট পলের অভিক্ষেপ বারংবার স্মরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সাদৃশ্যে সন্ত ফ্রান্সিসের নাম আরো বেজে ওঠে। ফ্রান্সিস পশুপাখির মধ্যে স্নেহসম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছিলেন, শোয়াইৎজারও। দুজনেই মানবতার দেবায়তনের মধ্যে মূক বনপ্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছেন। শোয়াইৎজার তাঁর হৃদয়ের ঐ দয়াকে যুক্তি দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে ভোলেননি, প্রসঙ্গত বারংবার সাক্ষী

মেনেছেন প্রিয়তম সহপথী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। হৃদয়বান, যুক্তিশীল, সবার সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা। তার্কিক ইয়াস্কি কিংবা স্বপ্নাতুর পাস্তেরনাক ঐ ব্যক্তিত্বেরই আমন্ত্রণে সমান সাড়া দিয়েছেন। এই সারূপ্য বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক, তিনি কি নিজেও তা চাননি? তাই কি বিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রনায়ক সবার সঙ্গেই তাঁর মুখমণ্ডলের উপমা অমন বিভ্রান্তিকর! ট্রেনে একবার ওঁকে ছোটোরা ধরলো: 'ডক্টর আইনস্টাইন, অটোগ্রাফ দিতে হবে।' তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষর দিলেন: 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বন্ধু অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার।' স্ট্রাসবুর্গের হোটেলে তাঁর আবক্ষ মূর্তি দেখে কোনো সভার ভাবীগুণী সদস্যেরা বললেন: স্টালিনের ঐ মূর্তি কেন ওখানে রাখা হয়েছে? ওটা সরিয়ে ফেলো।' তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে ঐ মূর্তিটির প্রতিচিত্র দেখে এক ব্যবসায়ী নাকি বলেছিলেন: 'আরে, এ যে দেখছি আমাদেরই একজন!'

এ-সব ঘটনা শোয়াইৎজারকে আপ্লুত করে, কেননা, যা-কিছু প্রাণময়, যেখানে যেভাবে মনস্বিতা অনুস্যূত, যুক্ত হতে ভালোবাসেন তিনি। শুধু ঘৃণা করেন ঊষর তথাকথিত ইণ্টেলেকেচুয়ালকে। একটি অভিজ্ঞতাকে তিনি এই মর্মে কথাপ্রসঙ্গে ব্যবহারও করেন। একবার ভীষণ বৃষ্টিতে বাড়ি তৈরির কাঠের গুঁড়িগুলোকে ছাউনির মধ্যে বয়ে বয়ে আনছেন, সঙ্গে মাত্র দুজন সহযোগী। এক সুবেশ যুবককে দেখে শোয়াইৎজার অনুরোধ করলেন সঙ্গে হাত লাগাতে। 'আমি ইণ্টেলেকচুয়াল, ঐ সব কাঠ টাট বওয়া আমার কর্ম নয়'— যুবকের মুখে এই উত্তর শুনে সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ শোয়াইৎজার প্রত্যুত্তর করলেন: 'আপনি মশায় ভাগ্যবান। আমিও ইণ্টেলেকচুয়াল হতে গিয়েছিলাম, হতে পারলাম কই!'

আর্ত মানুষের প্রতি সমানুভব তাঁর জীবনের অঙ্গ। নোবেল প্রাইজ থেকে প্রাপ্ত অর্থে কুষ্ঠগ্রস্ত মানুষের জন্য সেবাভবন বানালেন, পশ্চিম জর্মন গ্রন্থসংস্থা প্রদত্ত অর্থ দান করলেন জর্মন উদ্বাস্তু আর দরিদ্র লেখকদের। তাঁর সেবাব্রতে ভিক্ষুণী যাঁরা সেই শ্রীমতী শোয়াইৎজার, এমা হাউসনেখ্ৎ, এমা মার্টিন এবং আরো অনেক নির্বাচিত সহকর্মী দিনে দিনে তাঁর কবোষ্ণ শুভেচ্ছাকে প্রত্যক্ষ পার্থিবে প্রয়োগ ক'রে আমাদের বোঝাতে পেরেছেন, এঁর বাণী ও জীবনে কোনো কপট ব্যবধান নেই। এবং শুশ্রূষার উৎসারণ ঘটেছে শোয়াইৎজারের মর্মের সেই জাগর চিন্তার উৎস থেকে যা প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বেঁচে থাকবার জন্য আকাঙ্ক্ষা (তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবস্তু) অচেতন মানুষের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর, কেননা, একজনের সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘাত ঘটলে তার কক্ষপথে-আসা

আরেকজন মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি চিন্তাশীল মানুষ তাঁরই মধ্যে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা সহযোগিতার শক্তিতে জীবনের প্রতি সৌজন্যসুন্দর মনোভঙ্গিতে পরিণত হয় এবং মানুষের বাস্তবিক, আত্মিক ও নৈতিক প্রমূল্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। এটাই শোয়াইৎজারের অস্তিত্বের বার্তা। এত স্বাভাবিক, এমন অ-নাটকীয়— শোয়াইৎজারের নিজের ভাষায় এত অ-রোমান্টিক এই সমস্ত উচ্চারণ যে আলোড়িত হতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় অসংখ্যবার শুনেছি এই সব কথা। শোয়াইৎজার জানেন, তাই Epigony শব্দে আমাদের বিদ্ধ করেন, যার অর্থ 'উজ্জ্বল যুগের উত্তরাধিকারী'। ঐ কথাটা আমাদের মনে অহেতু শ্লাঘা জোগায়, কেননা 'আমরা সভ্যতার ধারক' এ-ধরনের অহমিকা যুদ্ধোত্তর জগতে আর মানায় না। শোয়াইৎজার এইভাবে আমাদের বিবেকের স্বরলিপি ক্ষমা আর সমালোচনায় ধ'রে আছেন। সম্ভবত তিনি সবচেয়ে ঘৃণা করেন আমাদের আপাতবিবেকী মনোবৃত্তিকে যার নামে অক্ষমতা কিংবা ক্লীবত্বও অনায়াসে চ'লে যায়। এক এক সময় শিউরে উঠেছেন পৃথিবী-জোড়া সংবেদনশূন্যতায়। মনে হয় তাঁর, মানবআবহ যেন শোচনীয় রকম নিরুত্তাপ, কেননা মন যতোটুকু চায় ততোটুকুও আমরা অন্যদের হাতে দিতে পারি না নিজেদের। আফ্রিকার প্রান্তে হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় সারাজীবন প'ড়ে আছেন তিনি, জগতের যন্ত্রণায় মনে হয় তাঁর: 'আণবাস্ত্র পরীক্ষা আর আণবিক যুদ্ধনির্ঘোষের বিরুদ্ধে কেউ চীৎকার ক'রে উঠুক, আফ্রিকার কালো রাত্রে কুকুরের মতো। সংবাদপত্র নির্বাক। চার্চ মন্থর। যারা কথা বলতে পারে তারা কেন কথা ব'লে উঠছে না! অন্তত ক্ষুব্ধ চিঠি লিখুক, খোঁয়াড়ে-পোরা কুকুর যেমন গুমরে ওঠে।'

এ-ভাষা মানুষের উচ্চারিত মিষ্টিক মন্ত্র। এ-ভাষা কালান্তর-পত্রপুটের রবীন্দ্রনাথের মতো নিঃশর্ত। ভাবতে ভালো লাগে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাধনশিল্পী নিশ্চিত সগোত্রতা আবিষ্কার করেছেন। গ্যেটের কাছে তিনি নিজে ঋণী এবং একই অভিধায় সারূপ্যময় রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলছেন, 'ভারতবর্ষের গ্যেটে, যিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে জীবন বিষয়ে স্বীকৃতিসূচক সত্যের এমন মহান্ সুঠাম ও মায়াবী রূপ দিয়েছেন যা এর আগে কখনো কেউ পারেননি।'

শোয়াইৎজার উনিশ শো সালে ওবেরামেরগাউ গাঁয়ে যীশুজীবনের প্যাশন-প্লে দেখে অভিনেতাদের উচ্ছল প্রশংসা করেছেন। এই শতাব্দীর অন্য এক লাঞ্ছিত প্রহরে একই জায়গায় একই নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে 'শিশুতীর্থ' রচনা করেন। দুজনের জীবনই কি প্রতীকী নাটকের জীবন্ত চরিত্রায়ণ নয়?

প্রথম নামটি খারিজ ক'রে কাকা তাঁর নতুন নাম রাখলেন, উপেন্দ্রকিশোর। সেই দ্বিতীয় নামই তাঁর আসল পরিচয়। যেন এটাই উপেন্দ্রকিশোরের স্বযাচিত নাম। সমগ্র আয়ুকৃতির তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে-নামে তিনি নিজেকে শেষ দিনটিতেও ডেকে উঠতে পারতেন, কেননা, পৌরাণিক দেবতা বিষ্ণুর মতোই তাঁর সত্তা পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করেছিল ছোটোদের জন্য ছোটো হয়ে। সুসমঞ্জস নামের সমাসে 'কিশোর' শব্দটি কেমন আশ্চর্য মানিয়ে গেছে। এবং ঐ সমাসেরই মতো নিষ্পন্ন জীবনেও। গ্রীক দার্শনিকের ভঙ্গি চুরি ক'রে বলা যায়, উপেন্দ্রকিশোরেব জগতে কৈশোর সমস্ত-কিছুরই মাপকাঠি।

শৈশব কোথায় এসে কৈশোরে পৌঁছয়? কৈশোরের পরেই কি অভিজ্ঞতার বিভ্রান্তি? তাহলে কি কিশোরকালকে ম্যমির মতো মেছুর ক'রে প্রাণপণে আরো-মৃত্যু আরো সময়োচিত বিনষ্টির কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে? এ-সমস্ত প্রশ্ন আমরা সকলেই পোষণ করি। উপেন্দ্রকিশোর যে এই প্রশ্নগুলির কোনো প্রাঙ্‌নির্মিত মীমাংসা আমাদের জন্য বেখে গিয়েছেন, এ-কথা বললে তাঁকে সম্মানিত করা হয় না। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের উত্তরাধিকারকে তিনি আরো অক্ষুণ্ণ ও বর্ণাঢ্য ক'রে আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, এমন বললে নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশে উনকথন করা হয় না।

কৈশোরকে তিনি চূড়ান্ত মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এবং সেই শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের মধ্যে কোথাও প্রথানুগত অথবা অতি-মৌল শিক্ষাব্রতীর অভিমান ছিল না। তাঁর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে কথাচ্ছলে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন :

'আমরা রেলগাডিতে চডে কোথায় যেন বেডাতে যাচ্ছি, আর ক্রমাগত বাবাকে প্রশ্ন করে চলেছি— "এটা কি"? "ওটা কেন"? বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। খানিক পরে ওদিককার সীট থেকে একজন ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, "মাফ করবেন আপনার সঙ্গে আলাপ না করে পারছি না। কী আশ্চর্য সুন্দর করে আপনি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেন। আমি এরকম আর দেখিনি!" আলাপ ক'রে দুজনেই খুব খুশি হলেন, কারণ সেই ভদ্রলোকও একজন নামকরা লেখক।'

এই বর্ণনা থেকে উপেন্দ্রকিশোরের শিক্ষণ-শিল্পের অন্তত একটি বিশেষত্ব আমাদের চোখে পড়ে। সেটি হলো অত্যুক্তির মধ্য দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্তি, অযথা বাগ্‌জাল বিস্তারে নয়। তিনি একটিও অতিরিক্ত কথা বলেননি, শুধু জরুরি প্রসঙ্গেই পর্যাপ্ত বলেছেন। এ-ব্যাপারে উদ্দিষ্ট শিশু বা কিশোরের অসামান্য প্রাজ্ঞতা তথা গ্রহণ ক্ষমতা মারিয়া মন্তেসরির মতো তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাতা মন্তেসরির সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের প্রধান পার্থক্য রূপকথা সম্পর্কে শেষোক্ত জনের পবিত্রতম পূর্বসংস্কারে। 'কল্পনাশক্তিকে শিশু-মনস্তত্ত্বে বড়ো একটি জায়গা দেওয়া হয়েছে ; আর, সত্যিই তো সারা পৃথিবী জুড়েই বড়োরা এইজন্যেই ছোটোদের রূপকথা শোনান, যাতে মহতী কল্পনাশক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। শিশু কল্পনা করতে ভালোবাসে, এ-কথা মেনে নিয়েও বলবো, আমরা কেন ঐ শক্তি জাগাবার জন্য তার হাতে শুধু রূপকথা আর খেলনা তুলে দিই সেটা বুঝতে পারি না'— বলেছিলেন মারিয়া মন্তেসরি। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর সব জেনে-শুনেই তার হাতে রূপকথার ঝাঁপি তুলে দিয়েছিলেন।

কেননা রূপকথা যৌথস্মৃতি। রূপকথার রাজা হান্স ক্রিশ্চান অ্যাণ্ডারসন জানতেন সব স্মৃতি ম্রিয়মাণ হয়ে আসে, এমন-কি, রূপকাহিনীরও। তাই কোনো এক বুলবুল পাখির গল্প ফাঁদতে ব'সে তাঁকে মুখবন্ধে ব'লে নিতে হয় : 'যে-কথা আজ তোমাদের শোনাবো তা ঘটেছিল অনেক বছর আগে। আর সেইজন্যই তো ভুলে যাবার আগেই এখুনি তোমাদের সেই কথাটা শুনিয়ে নেওয়া দরকার।'

যে-রূপকথা ঘ'টে গিয়েছিল তারি কথক উপেন্দ্রকিশোর। অথচ সেক্ষেত্রে তিনি অ্যাণ্ডারসনের মতো নিঃশর্ত নন, দক্ষিণারঞ্জনের মতো স্বপ্নপ্রবণও নন। বরং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মননমুদ্রা ভারতীয়। ভারতবর্ষে রূপকথা বা পুরাণ ইতিহাসের আশ্রিত। রামায়ণ ভারত-সমাজের ভাষ্য এবং 'ইতিহাস স্বরূপেণ সর্বেধর্মা নিরূপিতা' এই কথা বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর 'টুনটুনির বই' লিখবার আগে 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছেলেদের মহাভারত' রচনা করেছিলেন, এই তথ্য আপাতত দরকারি। যদি বলা যায় এই দুই চিরায়ত কথা-কাহিনী ছোটোদের জন্য আবার বলার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষীয় স্মৃতির আক্ষরিক পুনরুজ্জীবন, তবে পুরো কথাটা বলা হবে না। শিশুপুরাণের নব্য জনয়িতা উপেন্দ্রকিশোর চেয়েছিলেন শিশু বা কিশোর যেন অতীতকে নিছক সমীহা দিয়ে না ফিরিয়ে দেয়। 'পুরাণ' শব্দটির জন্ম 'পূরণ'

থেকে— যা ঘ'টে গিছে কিংবা পুরাবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাকে জীবাশ্মে পরিণত হতে দিলে ভুল হবে ; পরিবেশ-চেতন কল্পনাশক্তি দিয়ে তাকে পূরণ ক'রে এই মুহূর্তে নিয়ে আসতে হবে। তাই 'ছেলেদের মহাভারতে'র শুরুতেই আজকের কথা এবং তারপর ফ্ল্যাশ-ব্যাক বা পশ্চাৎপটে আলোক-সম্পাত :

'এখন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে, অনেকদিন আগে হস্তিনা বলিয়া একটা নগর ছিল।'

সত্যকে আবার সৃষ্টি ক'রে নিলে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। বরং সত্যকে যথাযথ পুনরাবৃত্তি করলে কখনো কখনো তার দ্যুতি ম্লানায়মান হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাংলা সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত কল্পনার পথিকৃৎ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'জাপানের উপকথা' জ্ঞাপন করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ এড়াতে পারেননি : 'জাপান কোথায়, জাপানের লোক কিরূপ, তাহাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ, এই সমুদয় বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক···সকল দেশেই মাতা, পিতা, পিতামহ, পিতামহীগণ, বালক-বালিকাদিগের নিকট উপকথা বলিয়া থাকেন। জাপানের পিতামহ পিতামহীগণ— পৌত্র-পৌত্রীগণের নিকট কিরূপ উপকথা বলিয়া থাকেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ সেইরূপ একটি গল্প এখানে প্রদান করিব।' উপেন্দ্রকিশোর 'জাপানী দেবতা'র গল্প বলার মুহূর্তে এমন কোনো অঙ্গীকার করেননি। তার ফলে গল্পের কোনো ক্ষতি তো হয়নি, জাপানি জীবনযাত্রার চিত্রণও অবিকৃত থেকেছে। সত্যের মাধুর্য দেশে দেশে কালে কালে এক, বয়সে বয়সে মূলত অভিন্ন। ধ্রুপদী শিশু-সাহিত্যের নিদর্শন 'টুনটুনির বই', কোষগ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থকারের নিবেদনে এ-সম্পর্কে উপেন্দ্রকিশোরের অকপট সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে :

'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।'

'সত্যের মাধুর্য' কথাটার উপর জোর দিতে চাই। টুনটুনির বইয়ের কোনো গল্পেই এপিগ্রামের ক্ষিপ্রতা নেই, আছে অনুগ্র প্যারাব্‌লের সহজ সৌন্দর্য। যাকে 'পোয়েটিক জাস্টিস' বলি সেই 'শাস্ত্রিক বিধান' এর অনেকগুলি গল্পে রয়ে গেছে। যেমন নাপিত আর রাজার আত্মম্ভরিতার পরিণাম। আছে সুযোগ-সন্ধানী মার্জারীর প্রাপ্য পরাভব। আরো আছে নিশ্চয়, নির্বোধের সংশোধিত

হবার অধিকার : বোকা জোলা আর শেয়ালের কথা। এমনি আরো কতো বৃত্তির পুরস্কার বা প্রতিফল, কতো অক্ষম আক্রোশের উৎসাদন, দম্ভসর্বস্বের দর্পহরণ। কিন্তু সব ছাপিয়ে কি নেই বিজয়ী এবং বিজিত, শাস্তিগ্রস্ত আর শাস্তিদাতার মধ্যে একটি আশ্চর্য মধুর সামীপ্য, পরস্পর-স্পৃষ্ট হবার মতো নম্র একটি একান্নবর্তিতা? তাই 'এক টুনিতে টুনটুনাল/সাত রাণীর নাক কাটাল।' আবার

উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতীর লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল,
রাণীর হাতে থালা আটকাল,
পিঁড়িতে রাজা আটকাল।

এই সমস্ত কথিকায় যে সহানুভূতির বেদনা অথবা শ্রীহর্ষ আছে তা উপেন্দ্রকিশোরের আবিষ্কার। ঈসপের ক্ষমাহীন নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর নেই, আছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সমবেত অতিক্রমণের প্রতি বিশালাক্ষ মাঙ্গলিক মমতা। উপেন্দ্রকিশোরের এই অভিমুখিতাকেই 'ভারতীয়' বলতে চেয়েছি। সংগৃহীত এইসব গল্পের স্থানীয় বর্ণিমা কিংবা কাঠামো তিনি এতটুকু পরিবর্তন করেননি। তা সত্ত্বেও গল্পগুলি ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়ে যে-চারিত্র পেয়েছে তা তাঁকে নিছক সংকলয়িতা হিসেবে নয়, সূত্রধারের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ব'লে চিনিয়ে দেয়।

কেননা ভাষা বিষয়ে তিনি জাগরুক ছিলেন! অবনীন্দ্রনাথের শব্দশিল্প তাঁর ছিল না, ছিল না দক্ষিণারঞ্জনের শিথিল পুষ্পগ্রাহিতা। তবে অবনীন্দ্রভাষার একটি উপপাদ্যের সঙ্গে কথঞ্চিৎ সাধর্ম্য ছিল তাঁরো শব্দৈষণার। 'কথিত, চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না,' এই কথা ব'লে অবনীন্দ্রনাথ এই তিন রকম প্রকাশরীতিকে নতুনভাবে সমাহৃত ক'রে একটি 'চিত্রভাষা' গঠন করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে উপেন্দ্রকিশোর চিত্রভাষা ও গীতভাষাকে মিলিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। 'ছোট্টবেলায় ঝাপসা স্মৃতির মধ্যেও,'

পুণ্যলতা দেবী লিখেছেন, 'বাবার দুটি মূর্তি মনে জাগে : রং তুলি নিয়ে বাবা ছবি আঁকছেন আর বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন।' দুটি মূর্তি, না একই মূর্তি ? ছবি ও গানের আধারভেদ খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তিনি, কিন্তু পরিশেষে এই উচ্চারণে এসেছিলেন যে এরা এ ওর সম্পূরক। 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' নামক নিবন্ধে তাই অমোঘ স্বরে বলেছেন :

> চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনি সময়। চিত্রেতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন সময় অধিকার করিয়া থাকে। সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে। কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী। বাস্তবিকই ইহারা তিন ভাই-বোন।

গদ্যের কথা তিনি এখানে বলেননি, এটা লক্ষ্য করতে হবে। সে-সম্পর্কে উল্লেখ যদি করতেন হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতোই বলতেন গদ্যের চেয়ে কবিতা আরো শক্তিশালী, আরো নাটকীয়, কেননা 'কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্গীত নিযুক্ত করিয়া দেন।' গদ্যের ভৌম অসামর্থ্যের পাশাপাশি কবিতার সৌর ব্যাপ্তি বিষয়ে তিনি কিরকম গভীর সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে পর পর দুটি নজির এখানে দাখিল করছি। দুয়েরই কথাবস্তু তাড়কা রাক্ষসী বধ :

১ বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, 'বাছা, রাক্ষসীটাকে মারিতে হইবে।' রাম বলিলেন, 'আচ্ছা'। এই বলিয়া তিনি ধনুকের গুণ ধরিয়া খুব জোরে টঙ্কার দিলেন। ধনুকের গুণ জোরে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে 'টং' করিয়া একটা শব্দ হয়, তাহাকেই বলে টঙ্কার। রাম ধনুকে এমনি টঙ্কার দিলেন যে, তাহা শুনিয়া বনের জন্তুরা মনে করিল বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত।
সে শব্দে তাড়কাও প্রথমে চমকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই সে হাত তুলিয়া হাঁ করিয়া, ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন ধুলায় চারিদিক অন্ধকার করিয়া সে রাম লক্ষ্মণের উপরে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। (ছেলেদের রামায়ণ)

২
মরিবে রাক্ষসী বুড়ি, রক্ষা নাই তার,
তখনি দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
'টং টং' রবে তার রুষি ভয়ঙ্কর,
দাঁত কড়মড়ি বুড়ি কাঁপে থর-থর।

'হাঁই-মাঁই-কাঁই' করি ধাঁই-ধাঁই ধায়।
হুড়মুড়ি ঝোপঝাড় চুরমারি পায়।
গরজি গরজি বুড়ি ছোটে, যেন ঝড়,
শ্বাস বয় ঘোরতর ঘড়র-ঘড়র।
কান যেন কুলো তার, দাঁত যেন মূলো,
জ্বল-জ্বল দুই চোখে জ্বলে যেন চুলো।
হাঁ করেছে দশ গজ, তাহে জিভ খান,
লকলকে চকচকে দেখে ওড়ে প্রাণ।
বিষম ধূলার ঘোরে দোঁহারে ঘেরিয়া,
পাথর ছুঁড়িয়া বুড়ি মারে চেঁচাইয়া। (ছোট্ট রামায়ণ)

এমন বলার উপায় নেই গদ্যাংশটি রক্তাল্প। বরং গদ্য এখানে— যেমন উপেন্দ্রকিশোর সর্বত্র— স্বাস্থ্যবান এবং চাহিদা মিটিয়েও অনতিরিক্ত। কিন্তু গদ্য ব্যাপারটিই মাত্রালঙ্ঘী, বিতর্কসজাগ এবং ফলত বিলম্বিত। গদ্যলেখক উপেন্দ্রকিশোরকে কথার মাঝখানে থেমে বুঝিয়ে দিতে হয়ে 'টঙ্কার' কাকে বলা হয়। আর, তাৎপর্য ও পারম্পর্য রেখে একই মুহূর্তকে দুটি স্তবকে বিভক্ত ক'রে নিতে হয়েছে তাঁকে। কবি উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু মুহূর্তটিকে বিশিষ্ট করেননি, দ্বিপদী গেঁথে গেঁথে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্তবকের চলস্রোত রচনা করেছেন। এ-ক্ষেত্রে চোখে না প'ড়ে উপায় নেই যে অমিত্রাক্ষরের প্রধানতম শত্রু দ্বিপদীকেও তিনি প্রবহমান ক'রে তুলেছেন। কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনা করলেই উপেন্দ্রকিশোরের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। কৃত্তিবাস থেকে ঈষদংশ :

প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে লাগে চমৎকার।
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দূর্বাদল-শ্যামরূপ দেখিল তথায়॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ॥

সন্দেহ নেই কৃত্তিবাস এই অংশে শ্রবণাভিরাম। কিন্তু বড়ো কমনীয় বড়ো

বেশি চিত্রার্পিত। বাল্মীকি স্বভাবত এখানে— শ্লোকসুমিতি সত্ত্বেও— উদাত্ত ও স্বরিত, অতৃপ্ত ও দ্রুতগ :

এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধ্বা মুষ্টিমরিন্দমঃ।
জ্যাঘোষমকরোত্তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্।
তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাড়কাবনবাসিনঃ।
তাড়কা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা॥
তং শব্দমভিনিধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ।

উপেন্দ্রকিশোর কৃত্তিবাসকে আশ্রয় ক'রেও বাল্মীকির দিকেই এগিয়ে গেছেন। কেননা, শব্দালংকার বিশেষত ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাসের অভিপ্রেত প্রয়োগে ব্যাখ্যা-বিরল প্রসঙ্গধর্মী ভাষা রচনা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃত্তিবাস যতো না প্রসঙ্গধর্মী তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যাখ্যানির্ভর।

সুতরাং গদ্যকেও উপেন্দ্রকিশোর ধ্বনিময় এবং ব্যাখ্যাবিরল করবার কথা ভেবেছেন। তাঁর গদ্যে এ-দুটি গুণের ক্রমবিকাশ এত গোপনে এত অলক্ষ্যে ঘটেছে যে পর্ববিভাগ ক'রে দেখানো কঠিন। কিন্তু ভিন্নকালে রচিত তাঁর অনুরূপ পরিস্থিতির একাধিক বর্ণনা থেকে এই পার্থক্য অনুভব করা যায়। এ-রকম দুইটি উদাহরণ :

১ হায় হায়! পাশায় কি সর্বনাশ হইল! যুধিষ্ঠির যতই হারেন, ততই তাঁহার জেদ চড়িয়া যায়, আর ততই তিনি বলেন, 'আরো খেলিব'। ধূর্ত শকুনির জুয়াচুরি কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই। পণ রাখিবামাই তিনি 'এই জিতিলাম' বলিয়া পাশা খেলেন আর যুধিষ্ঠির হারিয়া যান।
এইরূপে ক্রমে তাঁহার দাসী গেল, চাকর গেল, হাতী গেল, ঘোড়া গেল, রথ গেল, সৈন্য গেল,— সব গেল! (ছেলেদের মহাভারত)

২ নলের মাথার ভিতরে কলি; পাশার ভিতরে কলি। নল এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিয়া বসেন। দারুণ পাশা এক রকম বলিতে আর এক রকম হইয়া যায়!
দময়ন্তী দেখিলেন, সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে। সকলেই বুঝিল, রাজার আজ মাথা ঠিক নাই।
পুরীময় হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা সোনা হারিয়াছেন, রূপা হারিয়াছেন,

হাতী ঘোড়া, গাড়ী, পাল্কী, বসন, ভূষণ সকলই হারিয়াছেন। তথাপি তিনি থামেন না, বারণ করিতে গেলে কথা শোনেন না। (মহাভারতের গল্প)

দ্বিতীয় অংশটি রেখালেখ্য হিসেবে আরো অনৃজু, আরো অনেক জঙ্গম, অর্ধমিল ও অনুপ্রাসের পর্যাপ্ত অনপব্যয়িতায় অনেক বেশি জীবন্ত। তাঁর গদ্যবন্ধের এই স্পন্দনধর্ম ক্রমশই যে বেড়েছে, তার স্পষ্টতর দৃষ্টান্ত মিলবে প্রথম পর্যায়ের সাধুভাষার সঙ্গে উপান্ত পর্বের কথ্যরীতির একটি তুলনায় :

১ এদিকে ক্রমে ঢের রাত হইয়াছে আর খুব বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পুরোচনও নিদ্রায় অচেতন। সেই সুন্দর সুযোগ পাইয়া, ভীম তখনই তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিলেন। তারপর বাড়ির চারিদিকে বেশ ভালরূপ আগুন ধরাইয়া পাঁচ ভাই মায়ের সঙ্গে সেই গর্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পুরোচন আর পাঁচ পুত্রসমেত সেই নিষাদী পুড়িয়া মারা গেল। (ছেলেদের মহাভারত)

২ এদিকে দারোগামশায় তাঁর লোকদের ব'লে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল ক'রে আগুন ধরাবি; খবরদার আগুন ভাল ক'রে না ধরলে চ'লে যাসনি যেন।' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে, দারোগামশাই ভাবছেন, 'এই বেলা ছুটে পালাই', এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপীও গান ধরে দিল। তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপী আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল। (গুপী গাইন ও বাঘা বাইন)

সন্দেহ নেই, প্রথম বিবরণীতে সাধুভাষা যে আতিথেয় ঔদার্যগুণে সম্পন্ন দ্বিতীয়োক্তটিতে কথা বিন্যাসের সেই সামর্থ্য নেই। কিন্তু বিবর্তিত বিশেষত্বটি নজরে পড়ে। মহাভারত-বর্ণনার অংশে রচয়িতা একজন কথক-ভাষ্যকার, অপর কাহিনীতে নাট্যকার। সুতরাং প্রথম অপেক্ষা পরবর্তী দৃষ্টান্ত অধিকতর সংলাপ-ধর্মী। উপেন্দ্রকিশোরের ভাষায় বলতে গেলে, ঐ সংলাপে 'ইতস্ততঃ গতি' বা 'দোল' রয়েছে। উত্তরোত্তর তাঁর গদ্যে 'ইতস্ততঃ গতি'র প্রতি ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং এক ধরনের উচ্ছল সাবলীল সংলাপসঙ্গীত তাঁর অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সাঙ্গীতিক সংলাপের নিকটতম তুলনীয় শিল্পরূপ জর্মন Singspiel— যেখানে কমিক অপেরা প্রাত্যহিক কথোপকথনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

রুক্ষ লালিত্যের আবেদন আনে। উপেন্দ্রকিশোরের এই রকমের প্রহাসিনী গল্পজল্পনা অপূর্ব ক্ষমার্দ্র কৌতুক মনের ক্লেদ ধুয়ে দেয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের 'মারুতির পুঁথি' আর সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' যে সেই অকৃত্রিম সার্থকতাকেও অতিক্রম ক'রে গিয়েছে, তার কারণ, তাঁরা— রীতিবিভাজক সমালোচকমণ্ডলীর কাছে হঠোক্তিটির পূর্বে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি— চম্পূ-রীতিতে সুরেলা বিকারের মধ্য দিয়ে মগ্নচেতনস্রোত বা Stream of consciousness পদ্ধতির রূপভেদে পৌঁচেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের মানুষেরা জাগ্রত থেকেই অতিপ্রাকৃত পরিবেশ নির্মাণ করে। পক্ষান্তরে, উল্লিখিত পর্বের অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের চরিত্রগুলি স্বগত স্বপ্নাবস্থা থেকে এসে আমাদের ছন্দোহীন দৈনন্দিনকে ছুঁয়ে চ'লে যায়। লজিক থেকে অবচেতনা এবং অবচেতনা থেকে লজিক— এই পার্থক্য সত্ত্বেও টাইপ চরিত্রায়ণের দিক থেকে এঁরা তিনজন একই মুহূর্তে স্মৃতিধার্য।

ঘুমন্ত মসৃণ শৈশবে সমস্ত সমস্যার সমাধা। এমন-কি সেখানে সমস্যাও কখনো কখনো সমাধানেরই প্রতিশব্দ। অতঃপর কৈশোরে জাগরণের উন্মেষ। এই জাগরণকে উপেন্দ্রকিশোর নন্দিত করেছিলেন। কৈশোরের কাছে স্বাভাবিক উপায়ে মানবঅভিজ্ঞতাগুলি তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, এই কারণে যে তাহলে তার আর কখনোই জীবনের প্রাণদ কেন্দ্র থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। তাই তাঁর বর্ণিত পুরাণগুলি তথাকথিত 'সংক্ষেপিত সংস্করণ' কিংবা 'স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত' সুনীতিসংহিতা নয়। কিশোর পাঠকের কাছে জীবনের মূল নীতিগুলি জানিয়ে দিতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর ভুলে যাননি যে কুমেরু ও সুমেরুর মাঝখানে এই প্রকাণ্ড পৃথিবী চিরন্তন লাবণ্যতেজ পাবার জন্য শুভার্থী সূর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আলোর ফুলকি' ও অবনীন্দ্রনাথের গদ্য

আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন হলেও, চসারের Parliament of Fowls ব'লে কাব্য-রূপকথানি 'আলোর ফুলকি'র প্রসঙ্গে ভাবাসঙ্গবাহী। সেখানেও পশুপাখির হাট ব'সে গেছে, হুবহু মানবিক সংরাগের উত্তাপে কখনো ঈগল উচ্চকথনে মত্ত, কখনো-বা মানবজাগতিক বাসনা বা বৈরাগ্যের অবিকল সাদৃশ্যে জলের পাখিদের মুখপাত্রী হিসেবে রাজহংসী নির্লিপ্ত গলায় বলছে—

But she wol love him, lat him take another !

এই আখ্যায়িকার মধ্যে প্রতীকযোজনা ছাড়া চসার আর প্রায় সব-কিছুই একাধিক পূর্বসূরীর কাছ থেকে দু-হাতে নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে সিসারো, দান্তে এবং ক্লডিয়াসের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞ হবার কারণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর যেখানে নিসর্গলক্ষ্মীর চারপাশে পাখিরা কাকলিরত, সেই জায়গায়, অর্থাৎ এই বইয়ের সবচেয়ে স্মরণযোগ্য অংশটিতে, অ্যালানাস দ্য ইন্‌সুলিসের *De Planctu Naturoe* বইটির কাছে চসার অধমর্ণ।

'আলোর ফুলকি'র দৃশ্যপট অনেকটা Parliamet of Fowls-এর মতোই তির্যক্ প্রাণীদের মনুষ্যত্বে চঞ্চল। যে-সব পশুপাখি অভিজাত সাহিত্যে উপেক্ষিত, এবং ঈসপের উপকথা অথবা অনুরূপ কোনো কোনো নীতিনিরুক্তির গল্পে সান্ত্বনার তাচ্ছিল্যে সমাদৃত, এই বই দুটিতে তারা উদ্দীপন-বিভাবের অবহেলিত এলাকা ছেড়ে আলম্বন-বিভাবের উচ্চাসনে উঠে এসেছে।[১] তা ছাড়া, এবং

১ উপনিষদের সুবিদিত দুটি পাখি অথবা বৈষ্ণব পদাবলীতে তুলনাকল্পে গৃহীত ময়ূর প্রভৃতি পাখি আর্ষ উপলব্ধি বা মানবীয় ভাবাবেগের অন্ধ সহায়ক মাত্র। বাণভট্ট তো বৈশম্পায়ন ব'লে শুক-পাখিটিকে সর্বজ্ঞ বানিয়ে তার মুখ দিয়ে আমাদের রীতিমতো সংস্কৃত আর্যা-ছন্দে নিবদ্ধ শ্লোক শুনিয়েছেন (দ্রষ্টব্য, কাদম্বরী, পৃ. ৮-৯ : অনুবাদ শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর)। আবার লোকশ্রুত ব্যুঅসের Ornithogina-তে মানুষকে পাখিতে পরিণত করা বোধ হয় একই প্রবণতার রূপভেদ-মাত্র। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (Gay Neck। চিত্রগ্রীব, অনুবাদ : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), জ্যাক লণ্ডন (হোয়াইট ফ্যাঙ। অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) ও হেমিংওয়ের (ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী। অনুবাদ : শ্রীমতী লীলা মজুমদার) মধ্যে একটি সাদৃশ্যসূত্র সহজেই টানা যেতে পারে। এঁদের প্রত্যেকের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও প্রচুর, কিন্তু এঁরা তিনজনেই একদেশদর্শী। মানুষ এ-সব ক্ষেত্রে সক্রিয় দর্শক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ অভিভাবক ; প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভুত্ববিস্তার —অভিজ্ঞতা-ভারাতুর এই তথ্যটি এঁদের রোমাঞ্চ-সঞ্চারী রচনাবলী প'ড়েও কিছুতেই যেন ভোলা যাচ্ছে না।

সেইটেই এই নিবন্ধের সূচনাসূত্রে 'আলোর ফুলকি'ও মৌল রচনা নয়। এদ্মঁ রস্তাঁর উপরে নির্ভর ক'রে ফ্লোরেন্স ইএট্‌স হান্ *The Story of Chanticleer* লিখেছিলেন। সেই বইটিই অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি'র ভিত্তিপট। চসার আমাদের মনে যে-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করেন, সেটি হলো, একজন ক্ষমতাবান্ লেখক কেন অনুবাদকর্মে ব্যাপৃত হবার অতিরিক্ত শ্রম স্বীকার করে? অথবা প্রশ্নটিকে আরো একটু ঘুরিয়ে নিলে এ-রকম দাঁড়ায়, একজন প্রথমশ্রেণীস্থ লেখক অনুবাদ করার সময়ে কিভাবে রচয়িতা নির্বাচন করেন? বোধ করি দুজনের প্রবণতার সারূপ্য এর অন্যতম হেতু। উপরন্তু, কবিতার ভাষান্তরীকরণ একটি কঠিন দায়িত্ব, কেননা মূলের ধ্বনিগত আবহমণ্ডল তার পথে সবচেয়ে বড়ো প্রলোভন এবং প্রতিবন্ধক। কিন্তু, তবু সে-আগ্রহের যুক্তি ঐ মানসিকাতার সাধর্ম্যে নিহিত। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই কথাটাকে আরো কিছু দূর প্রসারিত ক'রে নেওয়া সম্ভব। *The Story of Chanticleer* আলোর ফুলকির নতুন মাটিতে শুধু পুনর্জাত নয়, পুনর্নবত্বে উজ্জ্বল। তার একটি কারণ কথাশিল্পে নয়, শিল্পকথার মধ্যে খুঁজতে হবে। 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' বা 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'তে অবনীন্দ্রনাথ বহু বিদেশী শিল্প সমালোচকের উক্তি সবিস্তারে উদ্‌ধৃত করেছেন। সেই তথ্যটি এই কাহিনীর আলোচনাকালে মনে রেখে এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর রচনার একটি বিশেষ পর্বে, অন্য কোনো গল্পগ্রন্থ বর্জন ক'রে এই বইটি বাছাই করার সময় লেখকের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত, তাঁর বাক্‌-রীতিটির অন্তর্লীন শিল্পাদর্শ-ই সেই উদ্দেশ্য এবং এখানে তিনি উদ্দিষ্ট সেই সেই আদর্শে উপনীত হয়ে গেছে। শকুন্তলা (১৩০২) বা ক্ষীরের পুতুল (১৩০২) তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে লিখেছিলেন এবং সরল সুন্দর সুষ্ঠুতা ছাড়া অপর কোনো ব্যাপ্ত বিশেষত্ব সেই বই দুটিতে অনঙ্কুরিত। রাজকাহিনী (প্রথম খণ্ড, ১৯০৯) গ্রন্থে তাঁর শব্দসমীক্ষণ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূতপত্‌রীর দেশ (১৯১৫) নালক (১৯১৬) বই দুখানিতে তারই উদ্‌বর্তন বর্ণিকাভঙ্গিতে বিচিত্রত, বিচ্ছুরিত। পথে-বিপথে (১৯১৯) বয়স্কপাঠ্য রচনা, এর মধ্যে নানাভাবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মনন কাজ ক'রে গেছে। এই মননভঙ্গিমা আলোর ফুলকিতে এসে সুসমঞ্জস একটি শীর্ষচূড় সার্থকতায় পৌঁছেছে।

'ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা'— এই কথাটি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিজ্ঞা। 'সার্বজনীন'— এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন অবনীন্দ্রনাথ ভাষার উৎসসন্ধান এইভাবে করেছেন :

ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে "মা" শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তার থেকে কথিত, চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না। — 'শিল্প ও ভাষা', বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

বস্তুত, জন্মমুহূর্তের ঐ তিনরকম ভাষা কালক্রমে অনেকাংশে ত্রিধাবিভাজিত হয়ে গেছে এবং অবনীন্দ্রনাথ যেন তিনটিকে আবার একাধারে সমাহৃত করতে চেয়েছেন। 'চিত্রভাষা' শব্দটি তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে ব্যবহার করেছেন এবং তার ভাষ্য দিতে গিয়ে প্রাচীন মানুষের চিত্ররীতির প্রেরণাসূত্রটি আমাদের দেখিয়েছেন :

এ যেন মানুষের সঙ্গে চারি দিকের যারা কথা কইল তাদের পরিচয় আগে লিখতে বল্‌লো মানুষ : জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা করলে জল, তুমি কেমন করে চল? জল স্রোতের রেখা ও গতিভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত করে শব্দ করে জানিয়ে দিলে— এমন করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি। হরিণ, তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ মর্মরধ্বনি করে, দিলে— এই এমনই নড়ি থেকে থেকে, জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল কেন!— ঐ, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

বলা বাহুল্য, চিত্রভাষার প্রবর্তনা অবনীন্দ্রনাথকে তার দূরান্বয়ী সংকেতের শক্তি নিয়ে অধিকার করেছে এবং তিনি করেছেন এই ভাষার অনুস্মৃতির ফলে মানুষ, নিসর্গ, পশুপাখি, জড়-চেতন সর্বত্রই ছবির ভাষার মতো একটি lingua franca বা সার্বজনিক ভাষার আভাস।[২] তাহলে এই ভাষায় শব্দ ধ্বনির নিয়ন্তা নয়, বরং তা অর্থবহ ধ্বনির অনুগত। ধ্বনি এখানে মূল মাধ্যম এবং বিবৃতি দ্বিতীয় উপায় মাত্র। Echo-word বা ধন্যুক্তি চিত্রোক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে এ-ভাষার কাঠামো পাওয়া যাবে :

২ দেবমুনি ঋক্‌দেবের মন্ত্রোক্তি ও F. Ryland-এর রচনার মতো আপাতবিষম নানান উৎস থেকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর উপপাদ্যের ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় করেছেন। প্রত্নপ্রস্তর যুগের চিত্র বা গুহায় আঁকা ছবির সংকেত-পরিধি এতোদূর বাড়িয়ে লেওনার্দোর মতো অমিতপ্রতিভাও ভাবেননি। লেওনার্দো সেখানে বিন্দু, রেখা বা বহিরায়তনিক সমস্তার মধ্যেই চোখ রেখেছেন।

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, "বোকো না বোকো না, মোটে না, বোকো না।" ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর স্বরে তিনি ডাকলেন, "আ-লো। আ-লো। আ-লো।" তারপর তাঁর বুকের মধ্যে ছেকে যেন স্বর উঠল, "অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল।" আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক— দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা।...বনের তলায় সোনার লিখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি অ-তু-উ-ল অমূল আলো—আলোর ফুলকি।

প্রাণের স্রোতের উপরে ভাষা এখানে যেন আলোর মতো নেচে চলেছে। ফ্লোরেন্স ইএট্‌স হান্ থেকে প্রাসঙ্গিক প্রাকৃরূপটি এর পাশে রাখা যাক :

> Not at all ! Cried the little Pigeon indignantly ; and then held himself very straight and still, and gazed at the Cock, who had now alighted on the wall. To him, Chanticleer with his trembling crest and golden collar, seemed some magnificent knight of the summer. The evening sun shone on his lovely plumage as he stood there motionless, his head raised ; he seemed to notice no one, but sighed, and his throat sounded "co...co..." soft and tender. Then he spoke in a kind of ecstacy— O Sun ! O Light ! I love you !...You enter into each one, and enter into every cottage ; dividing, yourself, you yet remain whole, like a mother's love !...
>
> —*The Story of Chanticleer*

ইএট্‌স হান্ যেখানে কৃতী ও দক্ষ, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর। মানুষের শব্দচয়ন আর পাখিদের ধ্বনিবিন্যাস স্বরসম্মিতির (assonance) মধ্যবর্তিতায় অভিন্ন ঐক্যে বিধৃত হয়েছে। 'An ideal language would always express the samething by the same, and *similar things by similar means*'

— জেস্‌পার্সনের এই কথাটা এ-উপলক্ষ্যে আবার প্রমাণিত হলো। সুকুমার রায় 'আবোল তাবোলে' যে-সব জোড়কলম শব্দ আর ধ্বন্যুক্তি ছড়িয়ে গিয়েছেন, সেগুলি এই প্রেক্ষাপটে ভুলবার নয়। পার্থক্য, সুকুমার রায় দেশজ শব্দের নিঃশর্ত প্রেমিক, আর অবনীন্দ্রনাথ যদিও 'বাংলাদেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার' বিরোধী, তবু প্রয়োজনবিশেষে দেশজ ও তৎসম শব্দ একান্ত পাশাপাশি বসিয়েও তিনি তাঁর ভাষণভঙ্গির গড়নের বিশেষ ঠাট বজায় রেখেছেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর এই নমনীয়তার উদাহরণ আপাতত আলোর ফুলকির সমীপকালীন রচনা পথে-বিপথে থেকে উপস্থাপিত হলো :

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না ; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আসছে, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা গাছের ঝাপসা মুর্তি চোখের উপরে এসে আঘাত ক'রেই সরে যাচ্ছে।

— 'নিষ্ক্রমণ', গিরিশিখরে, পথে-বিপথে।

চিত্রভাষা এবং ধ্বনিভাষা এখানে সমীকৃত। আনুরূপ্য খুঁজতে গিয়ে অসাবধান পাঠকের একবার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে :

রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে ; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী।

— য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সাদৃশ্য-সন্ধান ব্যর্থ হবে। আবার, বিবেকানন্দ ও 'চার-ইয়ারী কথা'র বীরবলকে মনে রেখে সচেতন পাঠক অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক অথচ স্বতন্ত্র ভূমিকা অনুভব করতে পারেন।

এই তথ্যটি মনে রাখলে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না, ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাস থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আলোর ফুলকি ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ঠিক একই সময় তাঁর 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই যোগাযোগের তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মতো। বাংলার ব্রত বইটিতে আমাদের ব্রতের লোকায়ত মন্ত্রগুলি অবনীন্দ্রনাথ ধ'রে রেখেছেন। আল্‌পনার নক্‌শায় যেমন বাংলা দেশের পুরবাসিনীদের জীবনধর্মী শিল্পৈষণা (**art-motif**),

তেমনি ব্রতকথনের মধ্যেও তাঁদের প্রাণছন্দ ধরা প'ড়ে গেছে। এই ঘরোয়া মন্ত্রগুলির মধ্যে দ্রুতগ প্রবাহের কম্পন যেভাবে অন্তঃসলিল হয়ে আছে, তার প্রাণময়তা সর্বকালের কবি বা কথককেই গভীরভাবে প্রলোভিত করতে পারে। এক সময় গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাসের মতো ধ্রুপদী চেতনায় সুসম্পন্ন কবিও বাংলাদেশের অঙ্গনের প্রচলিত বুলি (idiom) ব্রজবুলির ক্লাসিক ভাষাবন্ধের সঙ্গে যোগ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে ভাষা স্রোতোবহা ও আবেদনসমৃদ্ধ হয়েছে। 'শঙ্খমালার গল্পে'র কথাবস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন দু-শোর চেয়েও বেশি মেয়েলি ছড়ার নজির দিয়েছেন। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে কয়েকটি অপরূপ উদাহরণ এখানে অনুস্যূত হলো—

১. সেই কপালে সেই টিপ। সাধুর ভিটায় সোনার দীপ॥

২. গহিন জলে নিয়াস কাটে। কালীসাগর ফেটে উঠে॥

৩. দহের জলে ঢেউ খেলে কিনা খেলে। কমল পাতের জল হেলে কিনা হেলে॥

৪. বেলা পড়ে বেলা উজায়। গাছের পাতা মর্মরিয়া শুকায়॥[৩]

'শঙ্খমালার গল্পের গদ্যভাগে ছড়ার মিশ্রণ'—এই পর্যায়ে দীনেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন :

> …পাঠক যাহা গদ্যের মতন পড়িয়া যাইবেন, তাহার অনেকাংশই কতকগুলি মেয়েলি ছড়ার সমষ্টি। পাঠক পড়িবার সময় সেগুলি যে কবিতার অংশ তাহা একেবারেই মনে করিবেন না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই সকল ছড়া ধরা পড়িবে।

ছড়ার এই বাক্যবয়নরীতি অবনীন্দ্রনাথ আলোর ফুলকিতেই সর্বপ্রথম প্রচুরভাবে প্রয়োগ করেছেন :

> …পেরু সেই পেঁটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'শুনছ গিন্নি, তোমার কুঁকড়োর এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত' বলতেই পেঁটরার ডালা খুলে বুড়ি মুরগি হেঁয়ালিতে জবাব দিলে, 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গো ভাতে বাড়ে' জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁটরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই দেশী ঘরানার এই সম্ভাবনা চরিতার্থ করেছেন। এর ফলে গদ্যের তটে যে-ঢেউ লাগে, তারই

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ ৪৯-৫২ দ্রষ্টব্য

সাহায্যে তাঁরা গদ্য ও কবিতার রূপগত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে গেছেন। গদ্য ও ছড়ার একাঙ্গ সন্নিবেশ বা এই ধরণের চম্পূ-রীতি তাঁদের বেশির ভাগ লেখারই বৈশিষ্ট্য। এবং যেখানে বহিরঙ্গে এই সাহচর্য নেই, সেখানে ছড়ার ছন্দ অন্তর্মিলের সুযোগ নিয়ে গদ্যের ভিতরে ঢুকে গেছে :

১ ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা রহিয়াছে, সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন। —'ঘুমন্ত পুরী', ঠাকুরমার ঝুলি।

২ বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী, রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে, নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁৎ দুপুর, অফুর রাত। —আলোর ফুলকি।

মনে হবে, আঁটোসাঁটো ছন্দে বাঁধা রহস্যবহ দুটি কবিতা ভুল ক'রে কম্পোজিটার যেন গদ্যে সাজিয়ে ফেলেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের বেলায় যেন দু-একটা শব্দ হঠাৎ বাইরে থেকে এসে একটুখানি জায়গা জবরদখল করেছে, নইলে দুটিই যে ছন্দোবদ্ধ কবিতা, রীতিমতো পর্ব বিভাগ ক'রে সেটা দেখানো যায়। এইভাবে গদ্যসহোদরা স্বরবৃত্ত ছন্দকে দক্ষিণারঞ্জন এবং অবনীন্দ্রনাথ আবার গদ্যের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৪]

অবনীন্দ্রনাথের কোনো এক পর্যায়ের গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছিলেন 'ভাষাবাহুল্যের জন্য পরিমাণ রক্ষা' হয়নি ব'লে গদ্যকবিতার নিরীক্ষায় অবনীন্দ্রনাথ সফল হতে পারেননি। এই অভিযোগের লক্ষ্যস্থল অবনীন্দ্রনাথ যে কখনোই হতে পারেন না, এ-কথা বলছি না। কিন্তু কথাটি সমগ্রত অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা, ভেবে দেখা দরকার। তাঁর সর্বজনবিদিত কথকস্বভাব

৪ বিচিত্রা ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ ব'লে নির্দেশিত পাহাড়িয়া পর্যায়ের যে-তিনটি কবিতা বেরিয়েছিল, সে-সব স্থলেও থেকে-থেকে স্বরবৃত্তধর্মী ঝাসাঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত—

রাত থাকতে পায় কি পায়ের পরশ
তার শিশিরে মাজা নিকষ পাষাণ?
বরফ-গলা নতুন নদী—উছ্‌লে পড়ে, উস্‌সে চলে—

এই অনুযোগের দায়িত্ব বহন করছে। কথকমাত্রেই কথা বোনেন, বীজ অপেক্ষা বিস্তার, সাংবাদিক পরিমিতির চেয়ে পল্লবিত স্মৃতি-বিন্যাসেই তাঁর স্বাভাবিক ব্যগ্রতা। কিন্তু ঘরোয়া বা জোড়াসাঁকোর ধারে, দুটি জীবনস্মৃতিবৃত্তই যখন সমাপ্তির মুখে, তখন বক্তা চুপ করেছেন, আত্মপ্লুত কবি বা স্বগত-কথক জেগে উঠেছেন। মিতবাক্ এইসব অংশে গদ্যকবিতা তার নিপুণ সংহতি পেয়েছে এ-কথা বললে তথ্যের অপলাপ হবে না। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেও সমস্যাটিকে দেখা যেতে পারে। লিপিকার রচনাগুলি সম্পর্কে কবির 'ভীরুতা'র কারণ হয়তো একদিকে গীতি-আতুরতার (lyricism) প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে অনাবিষ্ট, নিছক গদ্যের দাবি। 'গদ্যকবিতা' ব'লে চিহ্নিত তাঁর কবিতাবলীর কোথাও কি সেই দোটানা দেখা যায়নি ? গদ্যকবিতা একাধিকবার তাঁর হাতে গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকেছে[৫] এবং গদ্যগীতি বললে সেই কবিতাগুলির ভুল পরিচয় দেওয়া হবে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গদ্যকবিতায় এই গীতিময়তা নিয়ে ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এইরকম কবিতায় যেন কাঠখোদাই বা ভাস্কর্যধর্মিতার ফলশ্রুতি আনবার দিকে তাঁর আগ্রহ নিবদ্ধ হয়েছিল :

সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বার করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে। —শেষ সপ্তক, ৩৩

অথচ গদ্যকাব্যের এই দৃঢ়তা ছাড়াও আরেকটি দিক আছে, সে হলো দ্রুতির দিক :

দেখেছি কালো চোখের পদ্মরেখায়
জলের আভাস ;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা ; —শেষ সপ্তক, ৪৩

সুমিতি-চেতনায় সাংকেতিক এই ভাষার নির্ভার লালিত্য অবনীন্দ্রনাথ অনেকবার স্পর্শ করেছেন :

১ সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন, সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের

---

৫ পত্রপুট ৫, ১৩ ; শেষ সপ্তক ১, ২৯ ; অন্তত এই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ রইল।

কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো। মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়— যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ!—নালক।

২ "খুলুক খুলুক", দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের কাছের সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে নতুন করে আলোছায়া দিয়ে গড়া একটুকরো পৃথিবী।—আলোর ফুলকি।

৩ এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চুড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী কম্বলে ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের পাহাডের চূড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।—বুড়ো আংলা।

৪ চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামল।—মাসি।

খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১) আলোর ফুলকির পরবর্তী রচনা। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের মতো, ভূতপত্‌রীর দেশ বা খাতাঞ্চির খাতায় রূপকথার রাজ্য আর মানুষের জগৎ কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং তাঁর বিশেষ ভাষারীতি এ-দুয়ের যোজক। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী অনুষঙ্গে পাঠকের কাছে আসে। কিন্তু ভাষার এই ছন্দোময় সাফল্য সম্ভবত কঙ্কাবতীতে নেই। মারুতির পুঁথি বা ওইরকম আর-কয়েকটি যাত্রার ধরণে লেখা রচনায় অবনীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ভাষার বাঁধুনি মানতে পারেননি। অথচ সত্তর পৃষ্ঠার খাতাঞ্চির খাতায় যে-স্বাচ্ছন্দ্য, বুড়ো আংলার এক শো উননব্বই পাতা জুড়ে যে-স্বপ্নচিত্রণ, তার সার্থকতার মূলে অবনীন্দ্রনাথের স্বরচিত ঐ বাক্‌-রীতি। এই ভাষার পূর্বসূত্র আদি মানুষের ছবির নক্‌শা আর বাংলা দেশের প্রাঙ্গণ। স্বভাবোক্তির সঙ্গে পরিকল্পনা, তৎসম-বিদেশীর সঙ্গে দেশী-তদ্ভবের নীরন্ধ্র মৈত্রীতেই এই রূপবন্ধের অঙ্কুর ও বিকাশ। 'পাগলামির কারুশিল্প'—বিরোধাভাসে ভাস্বর এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের রূপবন্ধের এই সচল শক্তির কথাই উদ্‌ঘাটন করেছেন। আজ এই কারুশিল্পের কোনো আন্তর ধারারক্ষী নেই। এর একটি

কারণ হয়তো এই যে, বীরবলের মতো তিনি প্রধানত বক্রোক্তিজীবিত অথচ বন্ধুজনবৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান নন, বরং তাঁর সৃষ্টির নানারঙা বৈচিত্র্য তাঁকে myth-এ পরিণত করেছে। এক দিকে তাঁর স্বভাবের বহুমুখী নম্রতা, অন্য দিকে একান্ত আপন শিল্পসজ্জা— এই বৈষম্যে তিনি দীপ্যমান। বলতে বাধা নেই যে, ভাষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্‌বোধিত করলেও প্রভাবিত করেননি। নইলে হয়তো তাঁর রচনা বলেন্দ্রনাথের মতো ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত থেকেই আরেকভাবে মূল্যায়িত হতো।[৬]

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বক্তৃতাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমস্যা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে যে-কথা বলেছেন তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। দু-জনের সৌন্দর্যবীক্ষা ভাব ও রূপের নিজ নিজ সেতু বেয়ে একটি অভিন্ন সমাধানের সৈকতে এসে দাঁড়িয়েছে :

১ মানুষ তাই মধুর করেই বললে 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চির সুন্দর, আমি স্বীকার করে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর করে তোমার চিঠি পাঠাব, যেমন করে তুমি পাঠালে।'—'সৃষ্টি', ১৩৩০। সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ।

২ সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলো না, এইখানেই সেরাশিল্পীর গুণপনা— মহাশিল্পের মহিমা প্রকাশ পেলে…পাতার ঘরে এতটুকু পাখি, সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বল্লে আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার— নতুন নতুন আলোর ফুলকি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চল্লো,— তার পর একদিন মানুষ এল। — 'শিল্পের অধিকার', চৈত্র ১৩২৮। বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

শিল্পীসত্তার এই সাড়া দেওয়ার কথা, আলোর ফুলকির নায়কের সংলাপে এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে :

এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আছে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তার পর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল'। আর তাই শুনে পুবের

৬ বলেন্দ্রনাথের আয়ুসীমা এ-ক্ষেত্রে বিস্মরণীয় নয়।

আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভ'রে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তার পর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবা ফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।'

সুন্দর ও কার্ল মার্কস

ভাবুক মার্কসের জাতক লগ্ন ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে একজন পার্নাসিয় কবি জন্মেছিলেন, ল্যকঁৎ দ্য লীল। দুই ভাবুকের জন্মস্থলের নিসর্গশোভার মধ্যে যদি-বা কোনো সাদৃশ্য আরোপণ সম্ভব, দু-জনের মধ্যে নিশ্চয় কোনো দিক থেকেই ন্যূনতম সগোত্রতা প্রত্যাশিত নয়। ধ্রুপদী দুই দেবতা আপোলো ও দিঅনুসাসের নামে উৎসর্গিত গ্রীসিয় পর্বত পার্নাসাসের অনুষঙ্গে মেতে উঠলেও পার্নাসিয় কবিগোষ্ঠীর অব্যবহিত প্রেরণা ছিল তেয়োফিল গোতিয়েরে-কীর্তিত প্রকরণসর্বস্ব 'স্বাশ্রিত শিল্পবাদ' (l'art pour l'art)। এটাও বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে, প্রতীকী কবি মালার্মে এই কাব্যধারার মধ্য থেকেই তাঁর আপন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন! ঐ সংক্রান্তিমুহূর্তেই সম্পূর্ণ প্রতীপ ধারণা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ফ্লবেয়ার (জ. ১৮২১), যাঁর বিষয়ে এডমাণ্ড উইলসন এতোদূর বলেছিলেন যে মার্কস দেখতে পাননি এমন-কিছুও তাঁর নজরে এসেছিল। উইলসন অন্যত্র আমাদের অবহিত করেছেন প্রতীকবাদ ও প্রকৃতিবাদ এই দুয়ের বিবাদী সমন্বয় আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। মার্কস এই উভয় প্রবণতাকেই খারিজ ক'রে দিয়েছিলেন। অন্তত দুই শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁর বিমুখতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছড়িয়ে আছে একাধারে আঙ্গিকমুখ্যতা ও উদ্দেশ্যগন্ধি উপন্যাসের (Tendenzroman) প্রতি তুল্য অনাস্থায়। তাঁর সতীর্থ ও মুখপাত্র এঙ্গেলসের এই বক্তব্য[১] এখানে স্মরণযোগ্য: 'বালজাক, যাঁকে আমি বাস্তবতার দক্ষতর শিল্পী ব'লে মনে করি, তাঁর 'মানবিক কমেডি' (*La Comedie Humaine*) বইতে যা দিয়েছেন সমস্ত জোলাদের[২] 'ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' (passes, presents et a venir) জড়ো ক'রেও তার সমান হবে না: ১৮১৬-৪৮-এর অন্তর্বর্তী অভিজাত ফরাসি সমাজে জায়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্তর প্রগতিপন্থার আশ্চর্য বাস্তব আলেখ্য এঁকে

---

১. কথাশিল্পী মার্গারেট হার্কনেসকে লণ্ডন থেকে লেখা চিঠি, ১৮৮৮।

২. প্রসঙ্গত এমিল জোলার 'জার্মিনাল' উপন্যাসে 'তোমার বন্ধু কার্ল মার্কস তো সব কিছুই স্বাভাবিক বিবর্তনের উপর ছেড়ে দিতে চান। না রাজনীতি, না ষড়যন্ত্র—এই তো ব্যাপারখানা? প্রকাশ্য দিনের আলোয় সমস্তটা ঘটবে আর এরি মধ্যে উদ্দেশ্য হলো বেতনবৃদ্ধি। আমাকে ও-রকম বিবর্তনের কথা বোলো না হে'—কোনো চরিত্রের এই মন্তব্য আসলে জোলার মার্কস-বিমুখতা সূচিত করছে কিনা কে জানে।

তুলেছেন···রাজনীতিক হিসেবে বালজাক প্রথানুগত; তাঁর মহান্ শিল্পকাজ ভালো সমাজের অবোধ্য ক্ষয়িষ্ণুতা বিষয়ে একটি শোকগাথা যেন; মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতিই তাঁর সহানুভূতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁদের উপর তাঁর দরদ গভীরতম সেই অভিজাত নরনারীদের যখন তিনি গতিময় ক'রে তুলেছেন তাঁর স্যাটায়ার সে-সব ক্ষেত্রে তন্নিষ্ঠ, শ্লেষ তিক্ত।' আবার, এই বালজাকের অবাস্তব রূপায়ণের কারণও, মার্কসের মতে তাঁর অত্যন্তিক উদ্দেশ্যবাদ—

> বালজাক, যিনি বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর নিখুঁৎ দখলের জন্য উল্লেখ্য 'চাষীরা' (*Les Paysans*) নামক তাঁর সর্বশেষ উপন্যাসে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, কী ক'রে এক তুচ্ছ চাষা তার মহাজনের জন্য স্বেচ্ছায় এটা-ওটা ক'রে দেয়, মহাজনের শুভেচ্ছা পাবে ব'লে, ভাবে নগদ কিছু না পেলে কি হয়েছে, সে তো আর মহাজনকে এমনি-এমনি শ্রমদান করছে না। এইভাবে তিনি মহাজনের হয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। তিনি নগদ মাইনে বাঁচিয়ে চাষীকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরছেন, যে-বেচারা নিজের শ্রমক্ষেত্রে বঞ্চিত থেকে মাকড়সার মতো কুশীদ-জালে জড়িয়ে পড়ছে।[৩]

যদিও মূলধন মুনাফা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই মার্কস এই উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে তাঁর ক্ষোভ ঔপন্যাসিকের উগ্র একদেশদর্শিতায়। এই উষ্মা প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি সরাসরি বালজাক বাস্তব কি অবাস্তব চিত্র এঁকেছেন সে-সম্পর্কে কটু কটাক্ষ করতে পারেননি, স্বগত স্বরে একবার ব'লে নিয়েছেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রভাবিত সমাজব্যবস্থায় অ-পুঁজিপতি উৎপাদক ও ধন-তান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়। ঐ সংস্কারের বশীভূত হওয়ার জন্য লেখককে তিনি সর্বৈব অভিযুক্ত করতে চাননি, শুধু প্রচার-পক্ষপাতের উপর বাঁকা চোখে তাকিয়েছেন। এখানেই মার্কসীয় সৌন্দর্যবোধের একটা গাঢ় বিশেষত্ব আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। প্রচারধর্মিতার জন্য বারংবার নিন্দিত মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনা— যার জন্য মার্কসবাদী সমালোচকদের বৃহদংশই দায়ী—জীবনের রূপ সম্পর্কে একটি শুদ্ধতা অপেক্ষা করেছিল এবং অতিরিক্ত প্রোগাম-পরায়ণতাকে পরিহার করতে চেয়েছিল। প্রকৃতিবাদী লেখকেরাও মার্কসের কাছে এই কারণেই পরিহার্য ছিলেন যে তাঁরা বস্তুবিশ্বকে সুবিধেজনক কয়েকটি অতিনির্দিষ্ট অংশে নিজেদের বক্তব্য হাঁসিল করবার প্রয়োজনে শিখণ্ডিত ক'রে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিল না পটভূমির বৃহৎ অনিশ্চিতিগুণ, ছিল না

৩. *Das Kapital*, vol. III।

সত্তার সামগ্রিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে অন্বেষণ। সেই কারণে সময়নিষ্ঠ টেইন-এর কার্যকারণসাবলীল ইতিহাস-ব্যাখ্যা (সামন্ততন্ত্রের উত্থান থেকে শুরু ক'রে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত) মার্কসের কাছে মনঃপূত হয়নি, কেননা ইতিহাস এঙ্গেলস কিংবা মার্কসের কাছে জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি[৪], সে হাইনের মতো কবিকেও প্যারডি করতে পারে, আর তার অগ্রস্থতির কোনো যন্ত্রানুগ ছন্দ নেই। ইতিহাস নিজেই যেন বিষয়ী, আবার এই ইতিহাস যখন শিল্পের বিষয় হয়ে ওঠে, যখন জগতের জীবনলোক থেকে শিল্পীকে নির্বাচন ক'রে নিতে হয়, শুধুমাত্র অন্ধের মতো সেই মুহূর্তটিকে নির্বাচন ক'রে নিয়ে মহৎ শিল্প কখনোই জন্ম নিতে পারে না। প্রগতি ও মুহূর্ত সম্পর্কে এই বিষণ্ণ দ্বিধাতুর মার্কসের নিজস্ব চিন্তাধারার পরিচয় এই উচ্চারণে গ্রথিত আছে :

> শিল্পের ক্ষেত্রে এটা তো রীতিমতো জানা কথা যে, সমাজের সার্বিক অগ্রগতির সঙ্গে তার কোনো তাৎক্ষণিক সম্পর্কই নেই। এ যেন কাঠামোর সঙ্গে সামগ্রিক ছন্দের সম্পর্ক। গ্রীকদের প্রসঙ্গে আধুনিকদের, কিংবা শেক্সপিয়রের কথাও ধরা যেতে পারে। এপিকের মতো কোনো-কোনো শিল্পরীতির ক্ষেত্রে তো দেখাই যায়, তাদের আরব্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রান্তিকর ধ্রুপদী রূপটি কখনোই ফুটে উঠতে পারে না; সুতরাং শিল্পের রাজ্যে অনুন্নত পর্যায়েই কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৃজনসম্ভাবনার পরিচয় মেলে।[৫]

এখানে যে-আত্মস্থতার অনাড়ম্বর উদ্‌ঘাটন আছে তার মূল্য বুঝতে হলে উত্তেজিত ১৮৪৮ এপ্রিলে লামার্তিনকে লেখা মহিলা-শিল্পী জর্জ সাঁদের পত্রাংশ পাঠ করতে হবে :

> কেন মিথ্যে সন্দেহে ভুগছো? ঊর্ধ্ব থেকে উদ্ভাসিত দিব্যশক্তিবলে তুমি তো অনুপ্রাণিত কবি, শিল্পী, তুমি কি জানো না সর্বশক্তিমান অসহায় ও শোষিতদের জন্য কী অপরিমাণ ইন্দ্রজাল সঞ্চিত রেখেছেন?…ঐ প্রোলেটারিয়ানদের আগে গিয়ে তুমি দাঁড়াও, তাদের সন্ত্রাসের মুখপাত্র হও, এখুনি, পরমুহূর্তেই যেন সেই সব ত্রাস ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে।

৪. মাঞ্চেস্টার থেকে মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি ১৮৭০।

৫. *Grundrsse*, p. 30; *Zur Kritik*...p. 268. George Lichtheim তাঁর *Marxism; an Historical and Critical Study* (ন্যু ইয়র্ক, ১৯৬১) নামক বইতে (পৃ ১৫২, ১৫২-৫৩) এ-সম্পর্কে নতুন আলো ফেলেছেন।

এ-রকম 'বৈপ্লবিক' আশাবাদ মার্কসের ছিল না। লেখিকা যে শাসকসম্প্রদায় (তাঁর ভাষায় caste) ও হিংসাত্মক বিপ্লবী-চক্রের (sect) লড়াইতে শেষোক্ত গোষ্ঠীর হাতিয়ার হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, মার্কসের পক্ষে ও-রকম কোনো কৈশোর অকল্পনীয় ছিল, যদিও তার সাম্যবাদী ইশ্‌তেহারে তিনি নিশ্চয় বিপ্লবের প্রথম সোপান হিসেবে এমন একটি পদ্ধতি চেয়েছিলেন যা গণতন্ত্রের লড়াই জিতবার জন্য প্রোলেটারিয়ানদের শাসকশ্রেণীতে আসীন করবে। কবি বা শিল্পীর কাছে মার্কস নিঃসন্দেহে ইতিহাসচেতনা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু কখনোই কোনো সমাধান নয়। এবং শিল্পের ইতিহাসও নিজস্ব পুরাণকে নিজের মধ্যে সুন্দরভাবে সংহরণ ক'রে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, গ্রীক কাব্যগুলি তার প্রমাণ। একালে বায়রনের তুলনায় তিনি যে শেলিকে নন্দিত করেছেন তার কারণ, তাঁর কাছে বায়রনের ইতিহাসবিমুখ প্রতিক্রিয়াশীলতা—অথচ এই বায়রনই কিন্তু মার্কসের প্রিয় কবি গ্যেটের কাছে মান্য ছিলেন তিনি যুগমুহূর্তের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন ব'লে— এবং শেলির আন্তরিক বিপ্লবধর্ম। তাহলে কি যুগের জমিন্ থেকে অন্তত একটা প্রাতিভাসিক ব্যবধান মেনে চলা শিল্পীর অন্যতম দায়িত্ব ?

এখানেই মার্কস সংকটাপন্ন বোধ করেছেন। এই সূত্রে হেগেলপন্থী নন্দনতাত্ত্বিক ফ্রিডরিশ থেয়োডোরে ফিশার (১৮০৭-৮৮) সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করবার মতো। ১৮৫৮ সালে লাসাল্লেকে লণ্ডন থেকে লেখা চিঠিতে মার্কস ফিশারের 'সৌন্দর্যবোধ তথা সৌন্দর্যশাস্ত্র' (*Aesthetik oder Wissenschaft des Schonen*) বইয়ের ধারাবাহিক প্রকাশ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এই নন্দনবিজ্ঞানী যথার্থ প্রেক্ষিত পাবার জন্য 'কালগত দূরত্বে'র কথা বলেছেন, যেমন পরবর্তীকালে এড্‌ওয়ার্ড বুলাউ বলেছেন 'মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বে'র প্রয়োজনের কথা। ফিশার এর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক শুদ্ধিও খুঁজেছিলেন। দূর থেকে দেখলে মহাপুরুষের জীবনের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতাগুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, তিনি পূর্ণায়ত গৌরবে প্রকাশমান হতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও হুবহু এই কথা বলেছেন বুদ্ধ প্রসঙ্গে এবং রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যশাস্ত্রে প্রধানত এই অর্থেই 'সমগ্রদৃষ্টি' তথা দূরত্বের মাত্রা প্রযুক্ত হয়েছে।[৬] মার্কস অবশ্যই এই অনুষঙ্গ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া, এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি চিঠিতে (লণ্ডন, ১৮৬৮) তিনি সময়কে নিয়ে আদর্শায়ন বিষয়ে বেশ একটু বিরক্ত :

৬. 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের পথে।

মানুষের ইতিহাস মৃত জীবতত্ত্বের মতো চলে যায়। এমন-কি নিছক আপন ধারণার গোঁড়ামি বশে অগ্রণী মনস্বীরাও বিধিবদ্ধ অন্ধতার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছেন, নাকের ডগায় উপস্থিত বিষয়গুলোকেও দেখতে পাননি। এমন কি যখন সেই মুহূর্ত এসে গেছে, তাঁরা কী সব দেখতে পান ভেবে অবাক হতে হয়। ফরাসি বিপ্লব ও উদ্দীপন-পর্বেও (Enlightenment) তাঁরা সমস্ত-কিছুকে মধ্যযুগীয়, রোমান্টিক ঠাউরে নিয়েছেন; এমন-কি গ্রীমের মতো মানুষেরাও এই মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন না।

শেষ লাইনটা পড়ে চমকে উঠতে হয়। য়াকব্ গ্রীম্ তো একটি মানুষ ছিলেন না; তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃতি-ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ ও পুরাণবেত্তা, সর্বোপরি তাঁর ভাই ভিল্‌হেল্‌ম্ গ্রীমের সঙ্গে রূপকথা-রচয়িতা। ধরা যাক 'দুই ভাই' গল্পে সুদূর সময়ে স্থাপিত শিকারীর সঙ্গে ড্র্যাগনের লড়াই। পুরো ব্যাপারটা হয়তো বর্তমানের পটে আঁকা যেতে পারতো, কিন্তু তার সাহায্যে সেই আধুনিকতা ফুটে উঠতো না— যা ফুটেছে ঐ সংগ্রামের মধ্যে প্রতীক ব্যবহারে। এখানে তথাকথিত মার্কসীয় সমালোচকেরা শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা বলতেন। মার্কসের পক্ষে এ-রকম অপব্যাখ্যাও অবাস্তব ছিল। আসলে মার্কস সময় বিষয়ে এক ধরনের শিল্পীসুলভ দোটানায় প'ড়ে গিয়েছিলেন: অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী সময় সৌন্দর্যকে উপকৃত করে, আবাব নিকটকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সুন্দর অবাস্তব হয়ে পড়ে। মার্কস ইহজাত-চিরায়ত সৌন্দর্য ও সমকালীন অপূর্ণতার মধ্যে সেতু ছুঁড়ে দিতে পারেননি—এখানেই তাঁর নন্দনশাস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো ফাটল। অন্যদিক থেকে এটাই কি আবার যূথমানস ও ব্যক্তিস্বভাবের সম্পর্কসূত্রে মার্কসের মীমাংসাহীনতার নামান্তর?

২

একাত্ম বেদনা বড় বিড়ম্বনা বিচ্ছিন্ন শহরে।

তাই তো শিল্পের মুখ চাওয়া, যদি দুস্তর বাস্তবে
এবং হৃদয়ে বাঁধে অবিচ্ছেদ্য মননের সেতু

— বিষ্ণু দে

Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ রুশোর কাছ থেকে হেগেল পেয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে মার্কস। এরই সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ফয়েরবাখের সেই

রোমান্টিকতা যা মানুষের সত্তাকে একমাত্র আরাধ্য ব'লে জেনেছিল। জর্জ লিশ্‌ট্‌হাইম দেখিয়েছেন ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ নিজে থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়, স্বরচিত পূর্ণতার ধারণায় নিজেকে নির্জীব ক'রে তোলে। আসলে আমাদের স্বোপলব্ধির অভাবই তো বিচ্ছিন্নতাবোধ, আর তাই যে-ইতিহাস-প্রক্রিয়া মানবপ্রকৃতির সমস্ত অন্তর্লীন সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে তাই দূর করে ঐ নঙর্থক বোধকে। ফলে নিজেকে একজায়গায় নির্জিত ক'রে বৃহত্তর সত্তাকে ফলিত করতে পারলে ঐ বোধ কেটে যায়। গর্কি যাকে destruction of personality বা অস্মিতা-বিলোপ বলেছেন তা একান্ত মার্কসীয়, নিজেকে বৃহৎ একটি আধারে সজীব ক'রে রাখবার অভীপ্সায় প্রাণময়। প্রচলিত ভারতীয় মার্কসীয় সমালোচকেরা প্রায়ই একটা মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন 'ব্যক্তি' ব্যাপারটাই একটি অস্বস্তিকর অলীক ধারণা, যেন তাকে যে ক'রেই হোক না কেন অ্যাবস্ট্রাক্ট যূথচারিতায় পর্যবসিত হতে দিলে ভালো। 'কাপিটালে'র ভূমিকাশেষে দান্তে থেকে তাঁর উদ্ধৃত সেই পংক্তি : 'যা খুশি বলুক লোকে তোমার আপন পথে চলো।' তাঁর 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক খসড়া ১৮৪৪' (*Oekonomisch-philosophische Manuskripte ans dem Jahre 1844*) বইতে এই 'আপন পথ' ও মার্কসীয় মহাযানের মধ্যে একটি যোগাযোগ তৈরি করার উদ্যোগ আছে। তাঁর যুক্তিধারা এই রকম : মনে কর মানুষ হলো মানুষ এবং তার সঙ্গে জগতের যোগসূত্রও মানবিক। তাহলেই ভালোবাসলে ভালোবাসা পাবে, বিশ্বাস করলে বিশ্বাস। যদি শিল্প সম্ভোগ করতে চাও, শিল্প-শীলিত হতে হবে ; যদি অন্য মানুষের উপর প্রভাব ছড়াতে চাও, তাদের সঙ্গে উদ্দীপিত আচরণ করতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে অপরাপর মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে বিশেষ একটি প্রকাশ তোমাদের যথার্থ কাম্য-বস্তু, তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে একটি সংগতি রেখে।

এঙ্গেলস এখানেই একটু বৈচিত্র্য এনেছেন। এই তত্ত্বটিকে তিনি উপন্যাসের মূল সূত্র ব'লে জেনেছেন : 'ঔপন্যাসিক যথার্থ সমাজসম্পর্ক চিত্রিত করবার প্রয়োজনে ঐ সব সম্পর্কের প্রথানুগত দিকটি ভেঙে বুর্জোয়া আশাবাদ চুরমার ক'রে দেবেন, তার নিত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন, এবং এ-কাজটা তিনি কোনো সমাধান না দিয়ে, এমন-কি বিশেষ কোনো পক্ষ না নিয়েই ঘটাতে পারেন।'[৭]

৭. বুনুয়েল তাঁর ফিল্মের নন্দনসূত্র হিসেবে এই তত্ত্বটিকে ব্যবহার করেছেন। Ado Kyrou, *Luis Bunuel*. tr. Adrienne Foulke, p. 112।

এখানে স্মর্তব্য, প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তির অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে আস্থাশীল মার্কসের হেগেল-বিরোধিতা। ব্যক্তিতাহীন যূথধর্ম ও হেগেলের 'পরম ভাবনা' সমান বর্জনীয়। মার্কসের এই উপমা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমর্থিত আমার সসীম বোধ আপেল, ন্যাসপাতি আর বাদামের মধ্যে পার্থক্য ধরতে ঠিকই পারে ; কিন্তু আমার জল্পনামূলক বুদ্ধি সংবেদনগত ঐ পার্থক্যসমূহ সম্পর্কে নিশ্চেতন। সে দেখতে পায় আপেল আর বাদাম আর ন্যাসপাতির মধ্যে একাকার সেই এক, যার নাম ফল। প্রতিটি ফল তার কাছে প্রকৃতপক্ষে সাদৃশ্য মাত্র, যার 'শাঁস' হলো 'ফল'।...যে খনিতত্ত্ববিশারদের কাছে সব খনিজ পদার্থই নিছক খনিজ পদার্থ তাকে কি খনিতত্ত্ববিশারদ বলা চলে।[৮]

রসবোধের সঙ্গে পাংশু তত্ত্ববুদ্ধির তুলনা রবীন্দ্রনাথও করেছেন অনেকটা এই ধরনের উপমা ব্যবহার ক'রে। শেষ পর্বে যেখানে সাহিত্য বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এ-রকম তুলনার সন্নিবেশ করেছেন সেখানে ঐ সব তুলনা তাঁরই বিরুদ্ধে গিয়েছে। প্রথম পর্যায়ের রচনা রসবোধের পক্ষে এই পার্থক্য-প্রণিধান যে কতো জরুরি সেটা এ-ভাবে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন :

> তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভালো, তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ ও জলীয় আঁশ পরিহার করা যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায় ? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল...কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব যাহার প্রকৃতি, যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটি নূতন শিক্ষা, নূতন আনন্দ। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়িয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়...অনেক সময় ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরির প্রত্যাশায় বসিয়া আছি।[৯]

প্রতীয়মান এই সাদৃশ্যের আড়ালে মার্কস ও রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তার একটি

৮. পবিত্র পরিবার' (*Gesamtausgabe* থেকে) প্লেখানভ্ বিস্তৃতভাবে তাঁর *The Development of the Monist View of History* বইতে (পৃ ১৩৭-৩৯) উদ্ধৃত করেছেন।

৯. 'মনুষ্য', পঞ্চভূত। অধোরেখ অংশ বর্তমান প্রাবন্ধিকের। শিল্প বা মনুষ্যত্ব নিয়ে আপাত-মধুর তত্ত্বালোচনার যেন অবকাশ নেই, এটাই কি রবীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য নয় ?

পার্থক্য স্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকে। দু-জনেই ব্যক্তির সামাজিকতায় বিশ্বাসী কিন্তু মার্কসের কাছে ব্যক্তির সমাজসংগতি ঠিক কী অর্থে অত্যুজ্জ্বল ? তিনি এই মর্মে যে-উক্তি করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তা হয়তো রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি বৈপ্লবিক[১০] :

> পঞ্চেন্দ্রিয়ের গঠনকালের পিছনে অনাদিকাল থেকে শুরু ক'রে এ-পর্যন্ত জগতের ইতিহাস নিহিত রয়ে গেছে। স্থূল জৈব প্রয়োজন দ্বারা বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্যের তো কোনো রূপই নেই, আছে শুধু তার অবচ্ছিন্ন সারবস্তু। স্থূলতম চেহারা নিয়ে তা হয়তো হাতের কাছে লভ্য হতে পারে এবং এ-কথা নির্ধারিতরূপে বলা শক্ত কোথায় বুভুক্ষু মানুষের আহারের সঙ্গে পশুর খাদ্যগ্রহণের তফাৎ রয়েছে। ক্লিষ্টকাতর দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের পক্ষে সূক্ষ্মতম নাট্য-আস্বাদন সম্ভব নয় ; ধাতু-ব্যবসায়ী শুধু বাজারদর বোঝে, জানে না ধাতুর মৌলতা, সৌন্দর্য। তার কোনো খনিজ বোধভাষ্যি নেই। তাই তো থিয়োরিগত ও বস্তুগত অর্থে মানুষের অনাত্মীকরণ (objectivization) প্রয়োজন, প্রয়োজন সেই মাধ্যমের যা মানব-ইন্দ্রিয়কে মনুষ্যজীবন ও প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সমানুপাতে মানবিক ক'রে তোলে।[১১]

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ :

> অনিবার্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে ; কিন্তু সৌন্দর্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্বর ছিল তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মতো, রাক্ষসের মতো, যেমন-তেমন করিয়া খাইতে বসিতে পারি না ; অতএব আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে।[১২]

১০. পিকিং-এ পণ্ডিতদের আয়োজিত ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথ নিজের গান প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'This too is the work of a revolutionist'। এই অর্থেই বৈপ্লবিক শব্দটা এখানে ব্যবহৃত হলো।

১১. অর্থনৈতিক ও দার্শনিক খসড়া ১৮৪৪।

১২. 'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য।

এবং প্রসঙ্গত মার্কস :

'পশুরা নিজেদের সন্ততিকুলের অব্যবহিত প্রয়োজনবোধ মেটাতে কিছু তৈরি করে, তারা একদিক-ঘেঁষা জিনিস তৈরি করে ; মানুষ করে নিখিল অর্থে ; তারা শুধু অব্যবহিত প্রয়োজনের বশ্যতা মেনে তৈরি করে, যেখানে মানুষ জৈব প্রয়োজন নিরপেক্ষ হয়ে সৃষ্টি করে, এবং তখনই যথার্থ সৃষ্টি করে যখন সে ঐ প্রয়োজনসমূহ থেকে মুক্ত।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ :

প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব ; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।[১৪]

অথবা

'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান / তার বেশি করে না সে দান / আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান / আমি গাই গান।' ঐ সর্বশেষ উদ্ধৃতি থেকেই প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সৃজনী 'আমি' সামাজিক নয়, এমনকি তার সৃষ্টিপথে শেষপর্যন্ত সমাজ / জীবন / প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত না থেকে সমাজ / জীবন / প্রকৃতিকে উচ্ছলভাবে বদান্যতা করতে পারে, তাদের কাছ থেকে কিছু না নিয়ে। পক্ষান্তরে মার্কসীয় মানুষ জৈব প্রয়োজন থেকে মুক্ত হলেও জৈবনিক ও বৈশ্বিক সংগ্রহশালার কাছে অধমর্ণ। তেমনি দু-জনের শিল্প-জিজ্ঞাসায় সাধারণীকরণের ধারণাও আলাদা। দু-জনেই সাধারণভাবে ভোগীকরণে আস্থাবান, যদিও রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা অন্য ধরণের স্বয়ম্পূর্ণতা দাবি ক'রে বসে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত :

বর্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর কোনো রচনায় বলেছেন, বীঠোফেনের সিম্পনিসমূহ বিশ্বমনের (Universal Mind) সৃষ্টি ব'লে গৃহীত হতে পারে না, কেননা তারা তাঁর ব্যক্তিগত। রাসেল বলতে চান যে সিম্ফনি তো গাণিতিক সত্যের মতো নয় যা সকল চিত্তবৃত্তির কাছে বস্তুপ্রতিম এবং যার সৃষ্টির পিছনে ব্যক্তিমানস বড়ো জোর একটি উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু, যদি এটা মেনে নিতে হয় যে সকলেরই উচিত বীঠোফেনের সৃষ্টির আস্বাদন, আর যদি গ্রাহকচিত্তে কোনো নিহিত ত্রুটি থেকে না থাকে, তাহলে যথার্থ শিক্ষণ-কর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞতা ও অনভ্যাস তিরস্কৃত হবে। এবং তাহলে এটাও

১৩. পূর্বোক্ত সূত্র।
১৪. ঐ, রবীন্দ্রনাথ।

মেনে নিতে হবে যে শ্রেষ্ঠ সংগীতস্রষ্টার সৃষ্টির পূর্ণ পরিগ্রহণ মানুষের মনেই (mind of Man) সম্ভব, এবং শ্রোতা হিসেবে অসম্পূর্ণ কিছু বিক্ষিপ্ত মানুষের (some particular men) মধ্যে সেটা ব্যাহত।[১৫]

একই সময়ে বর্ট্রাণ্ড রাসেলের মনে হয়েছে এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের পত্র 'কান্নার একটি তালিকা' (*Freedom and Organisation 1814-1914* / London, 1934)।[১৬] দুঃখবোধ তথা সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ মার্কস—এই অগভীর বিদ্রূপ সত্ত্বেও—শিল্পবিচারে তাঁর সংবেদনের অন্তঃসাক্ষ্য ছড়িয়ে গিয়েছেন, যদিও তাঁর অন্তিম অভিজ্ঞান যতোদূর সম্ভব সামাজিকতার এবং সামাজিক মানুষের সমর্থনে:

গান যে-রকম মানুষের শুধু সাংগীতিক বোধই জাগায় এবং বেসুরো কানের কাছে যেমন সূক্ষ্মতম সংগীতের আবেদনের অভাব গ্রাহ্য বিষয় নয় (কারণ আমার গ্রাহ্য বিষয় তো আমার অন্তর্লীন সামর্থ্যেরই স্বীকৃতি, আর এ-বিষয়ে আমার অধিকার ততোখানিই আমার অন্তর্লীন ক্ষমতা যতোখানি) এবং যেহেতু আমার মধ্যে গ্রাহ্য বিষয়বোধ ততোদূরই এগোয় যতোদূর আমার ইন্দ্রিয়চেতনা যেতে পারে (গ্রাহ্য বিষয় তার আনুষঙ্গিক ইন্দ্রিয়ের কাছেই অর্থময়), ঠিক তেমনি সামাজিক মানুষের বোধ অসামাজিক মানুষের বোধ থেকে আলাদা হয়ে যায়।[১৭]

এই জটিল বিশ্লেষণের পর যদিচ মার্কস ইন্দ্রিয়কে মার্জিত ক'রে নিতে বলেছেন, তাঁর কাছে গ্রাহ্যগ্রাহকসম্পর্কই চূড়ান্ত সত্য। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ অ-রসিককে particular বলেছেন, 'অ-সামাজিক' বলেননি। ফলত রবীন্দ্রনাথের Man বিশ্বব্যাপী, মার্কসের 'man' বিশ্ববীক্ষায় উৎসুক, অথবা, বলা যায়, বিশ্ব-ইতিহাস প্রবাহের মধ্যে সচেতনতা সত্ত্বেও বহুলাংশে ওতপ্রোত। আর শেষোক্ত

১৫ *Man*। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ভাষণ, পৃ ৩২-৩৩। তুলনীয় ইতিপূর্বেই অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য · 'সেই বেজান্ শহরের কথা মনে হয়; উপবনে সেখানে পাখি গাইলো ফুল ফুটলো মুকুল খুললো ফল ফললো পাতা ঝরলো, সবই সুন্দরভাবে হয়ে চললো দিনে রাতে, কিন্তু শহরের কোনো মানুষ এগুলো থেকে কিছু নিতে পারলে না, পাথরের চেয়েও পাথর হয়ে ব'সে রইলো, শুধু দু-চারজন পথিক দু'টো-একটা হতভাগা ভিখারী নয় পাগল তারাই কেবল থেকে থেকে এলো গেলো সেই দেশের সেই বাগানে যেখানে দৃষ্টি-ভোলানো সুন্দরের সামনে মুখ ক'রে ব'সে আছে মূক বধির অন্ধ বধির নিশ্চল মানুষের দল ঘোলা চোখ মেলে' ['সুন্দর', বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী]।

১৬ Hiren Mukherjee—*Remembering Marx*, New Delhi, 1967, p. 23।

১৭. অর্থনৈতিক ও দার্শনিক খসড়া।

মানুষ যদিও রিয়ালিটির রূপান্তরে ব্রতী, তার নিজের রূপান্তরও সেক্ষেত্রে নিয়তির মতো সত্য। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, হেগেলের মতোই আইডিয়াকে জগতের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন, এবং তাঁর অঙ্কিত মানুষ রচনা-পাঠক গ্রাহ্যগ্রাহক সম্পর্ক ছাপিয়ে হিরণ্ময় হংসের মতো রচয়িতার আপন গরিমায় দেদীপ্যমান। 'আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে'—রবীন্দ্রনাথের এই দুরুদুরু বাক্যে রাবীন্দ্রিক অহংয়ের অভিমান এবং তথাকথিত মার্কসীয় সমালোচনার মুদ্রাদোষ গোষ্ঠীগ্রাহকের প্রবল পরাক্রম দুই-ই বেজে ওঠে।

৩

জীবনানন্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে (জুন ১৯৪৬, বরিশাল)[১৮] তৃতীয় কবিতায় 'প্রগতিপথে' কয়েকটি নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পংক্তি: 'অনেক জেগে বেবিলনে নিনেভে রোমে কলকাতাতে প্রায় / নিভেছে জেনে রবি লেনিন মার্কস অবিরল অকুণ্ঠিত আলো' (শেষ লাইনটি বর্জিত এবং 'মার্কস' নামের কিনারে বিকল্পনাম লেখা আছে 'গান্ধী'; আগের লাইনে 'কলকাতাতে'র কিনারে লেখা 'ন্যু ইয়র্কে')। কবিতাটিতে, যেমন জীবনানন্দের অন্তিম পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে, তাঁরই ভাষায়, 'ইতিহাসযান' বর্ণিত হয়েছে। ভাবুক মার্কস যথার্থই ইতিহাসযান তথা ঐতিহ্যের শিল্পী যিনি গ্রীক চিদানন্দের ধারারক্ষী; যাঁর নামের সঙ্গে তাঁরই মনোনীত ঈস্কাইলাস্, গ্যেটে, দিদেরো-র পাশাপাশি যেন লুথার থেকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর নাম মানিয়ে যায়; জেগে থাকে তাঁর নির্বাচিত নায়ক স্পার্টাকাস, কেপ্‌লারের সঙ্গে-সঙ্গে গ্যেটে শেলি ও গর্কির আঁকা প্রোমেথেউসের নাম, মার্কস যাকে 'দার্শনিক সময়পঞ্জিতে অগ্রণীতম শহীদ সন্ত' ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। আর সম্ভবত ঐ অগ্নিহোত্রী প্রোমেথেউসের প্রতীকই তাঁর আরাধ্য ছিল। সম্ভবত তাঁর চোখে আর কিছুই মুক্তির মতো সুন্দর ছিল না, এবং সেই সৌন্দর্যের তপস্যায় শিল্প তাঁর কাছে জরুরি অথচ আপেক্ষিক মূল্যবোধ হিসেবেই ধরা দিয়েছিল। সুন্দরের কেন্দ্রকে ধ্যানের দ্বারা বিদ্ধ করবার মতো সময় তিনি পাননি, কিন্তু তা ব'লে প্রয়োজনের কাঠগড়ায়

১৮. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ-আয়োজিত 'আধুনিক কবিতা ও কবিকথা' শীর্ষক প্রদর্শনীতে (২৫-২৭ এপ্রিল ১৯৬৮) অশোকানন্দ দাশের সৌজন্যে প্রদর্শিত জীবনানন্দ-পাণ্ডুলিপি।

সৌন্দর্যকে তিনি বাধিত করবার কথা একবারও ভাবেননি। আজ যখন লুকাচ্‌ প্রমুখ নন্দনতাত্ত্বিকদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরেও মার্কসীয় সমালোচনা, বিশেষত বাংলা দেশে, প্রগতির নামে একটি কূপমাণ্ডুক্যের অভিসন্ধিচর্চায় অবসিত হয়েছে, তখন একবার অন্তত মুমুক্ষু মার্কসের প্রাথমিক ও মানবিক অভিপ্রায়ের সেই ব্যাপ্তির কথা মনে রাখা ভালো যিনি সুন্দরের প্রয়োজনকেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন, প্রয়োজনের সুন্দরকে নয়।

কবিতার অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

অভিমানী বাউলদের মতো রবীন্দ্রনাথও উত্তর করেছিলেন : সমস্ত বিদেশীকেই একদিন আমার কবিতা পড়তে হলে আমার ভাষায় পড়তে হবে, কেননা ভাষা ঈর্ষাময়ী। এবং বলতে চেয়েছিলেন যে, আঙিনার কোলে ঘাসের উপরে যে-শিশির সুন্যস্ত হয়ে আছে, অত্যুৎসুক অথচ অপটু হাতে ছুঁলে সেই শিশির ভেঙে এলিয়ে যাবে। একজন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে কবিতা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই প্রসঙ্গটিকেই প্রসারিত ক'রে বলেছিলেন :

> In poetry particular word possesses a subtle atmosphere of its own literary associations. The peculiar value of such words will never be intelligilble to foreigners ; they cannot be appreciated as being supremely beautiful by merely listening to them, or even understanding their literal meaning, for the association will be lacking.[১]

কথাটা তিনি বলেছিলেন রোমাঁ রোলাঁকে। কথা উঠেছিল শিল্পরূপের মৌলিক শুদ্ধতা নিয়ে। রোলাঁ তাঁকে প্রসঙ্গত স্বরশিল্পী গ্লুক্-এর কথা উত্থাপন ক'রে বলেছিলেন, আধুনিক সেই শিল্পী শুদ্ধ রেখা ও শুদ্ধ রূপের অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। ১৯২৬-এ এই কথোপকথনের প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর পর অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের রূপশিল্প বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও গ্লুক্-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি উৎকলন ক'রে দিয়েছেন :

> My idea was that the relation of music to poetry was much the same as that of harmonious colouring and well-disposed light and shade to an accurate drawing, which animates the figures without altering their outline.

এবং উদ্ধৃত উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বললেন, 'সংগীতকলা বলো, চিত্রকলা বলো, মূর্তিকলা বলো, একান্ত স্বাতন্ত্র্যে আপন অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা প্রকাশ করতে পারে স্বীকার করি।' কিন্তু অতঃপর, প্রায় পরক্ষণেই,

১। An Interview with Romain Rolland, *The Visva-Bharati Quarterly* (Aug.—Oct. 1944).

তিনি একটি উক্তি ক'রে আমাদের একটি সমস্তার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, 'কিন্তু আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থলে ভাষায় প্রকাশযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রেই তারা আপন গৌরব রক্ষা করেছে।'[২]

একদিকে অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা বা pure abstraction অন্যদিকে concrete বক্তব্য বিষয়ের তাড়না রবীন্দ্রনাথকে একটি টানাপোড়েনে ফেলেছিল। গ্লুক্-এর অপেরায়, য়ুরোপীয় সংগীতের বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন, বৃহৎ অথচ নৈর্ব্যক্তিক মানবীয় আবেগ আছে; ভাগ্নারের দেবদেবীদের তুলনায় গ্লুক্-এর সৃষ্টি আসলে অনেক শান্ত দেবদূত। রবীন্দ্রনাথ সেই অপেরাকে নিশ্চয় পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন ভাব ও রূপের সেই গাঢ় মিলনের সমাচার যেখানে আছে 'বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি।' নিছক নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা বা ভাবের একচ্ছত্র নেতৃত্ব, বলা বাহুল্য, তিনি কামনা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের নন্দনতত্ত্ব বহুলাংশেই এর পূর্বপট থেকে পালটে গিয়েছিল। শিল্প সম্পর্কে তাঁর মতামত এর আগে যদিও-বা প্রধানত শ্রেয়ো-সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল, শেষ দশকে তাঁর আত্মিক আগ্রহ একান্তই শিল্পীদের শিবিরের দিকে। এই সময় রূপের প্রতিই তিনি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সে-রূপও অবিমিশ্র বিশুদ্ধতার পরিচয় দেবে না। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার অন্তঃসাক্ষ্যে তা প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা বিষয়-মহিমাকে অতিক্রম ক'রে বোধের সামগ্রী, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'রূপের জাদু', 'রূপের জগৎ' এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তির একটি অংশ

> মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে— প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু, টমসন একেন্‌সাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তাহলেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সম্বোধন ক'রে কীট্‌স্ যে-কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ ক'রে কীই বা পাওয়া যায়; তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু···দান্তে, গ্যেটে ভিক্টর হ্যুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি ক'রে গেছেন।[৩]

২। 'রূপশিল্প', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬, সাহিত্যের পথে গ্রন্থে সংকলিত।

৩। 'সাহিত্যরূপ', সাহিত্যের পথে, নূতন সংস্করণ চৈত্র ১৩৬৫, পৃঃ ২০৬—৭

শেষ পর্যন্ত, অনুবাদের লক্ষ্য—রবীন্দ্রনাথের কাছে—নিছক ভাব-পরিবহন নয়, রূপের একটি পাত্র রচনা; যা ভাবকে আশ্রয় দেবে, প্রশ্রয় দেবে না। এবং একটি ব্যক্তিত্বকে অনুবাদক তথা সমর্থক আর একটি ব্যক্তিত্বের তটভূমিতে অনায়াসে পৌঁছে দেওয়াই অনুবাদের উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের অনূদিত ব্রাউনিঙের কবিতা প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন তা থেকে এ-কথা প্রমাণ হয় কবিতার অনুবাদের উপায় নিয়ে দুশ্চিন্তিত হলেও কবিতার অনুবাদের উদ্দেশ্য যে কতো দূরব্যাপী ও কবিকর্মের অঙ্গীভূত—তা নিয়ে কোনো সংশয় তিনি পোষণ করেননি:

> ব্রাউনিঙের কবিতাগুলিকে তুমি যে বাংলা রূপ দিয়েছ তা অপরূপ হয়েছে। তাতে অনুবাদের ক্লিষ্টতা লেশমাত্র নেই, তাতে যেন নবজন্মের শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদে ছন্দোনৈপুণ্যের সহজ লীলা দেখা যায়, কিন্তু তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। বিদেশী রসপণ্যের ভার নিয়ে তুমি এক ঘাট থেকে অন্যঘাটে খেয়া দিয়েছ দুর্গমতম উজান পথে, দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তিতে এ-রকম কৃতিত্ব দেখা যায় না।[৪]

বিশেষ অংশগুলি দেখলেই বোঝা যাবে, অনুবাদকর্মের কঠোর সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন ছিলেন কিন্তু সেই সাধনায় সিদ্ধি যে অনুশীলন ও প্রবণতার সাধর্ম্য থাকলে সম্ভবপর—সে-কথাও তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

ঐ 'প্রবণতার সাধর্ম্য' কথাটা এখানে স্পষ্ট করতে চাই। অনুবাদকের সঙ্গে যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল লেখকের মনের মিল না থাকে, তবে চলনসই এমন-কি মূলানুগ অনুবাদ যে সম্ভব হয় না, এ-কথা বলছি না—কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুবাদ ব্যাপারটা হয়ে ওঠে আত্মাহীন। মূল লেখকের সঙ্গে কোনো না কোনো সাদৃশ্য থাকলে তবেই অনুবাদক তাঁর তর্জমাকর্মে একটি আত্মা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, নচেৎ নয়। এবং 'সাদৃশ্য' শব্দটির অর্থ সম্প্রসারিত ক'রে এমনও মনে করা যায় যে নিজের রচনা ও কবিদৃষ্টির একটি সূত্র আবিষ্কার করার জন্য প্রতিভাসম্পন্ন কবি-অনুবাদক কোনো কোনো তদনুকূল বিদেশী অথবা প্রাচীন স্বদেশীয় কবির কাব্য নিজ ভাষায় তর্জমা করতে পারেন। কবি-অনুবাদকের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রেই কথাটা খাটে—অর্থাৎ কবি যদি অনুবাদক হন, অথবা প্রতিভাসম্পন্ন কবিকে যদি অনুবাদকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তবে তার

৪। শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠির তারিখ ১৪।১২।৩৬

অন্যতম যুক্তি সেই কবির নিজস্ব কার্যসূচী অথবা কাব্যবিবর্তনের উপকরণ সংগ্রহ।

এ-জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যুষে ভিক্টর হ্যুগোকে অনুবাদ করতে বসেছিলেন? ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভাতসংগীতের সমালোচনা করতে ব'সে রবীন্দ্র অনূদিত হ্যুগোর কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রেখেছিলেন। এবং লক্ষ্য করেছিলেন:

> আর্য কবির ভাব—'আমি প্রকৃতির।' ইউরোপীয় কবির ভাব, আজিকালি যদিও একটু পরিবর্তিত হইতেছে কিন্তু আদৌ—'প্রকৃতি আমার'। আর্য এবং ইউরোপীয় কবির এই মৌলিক প্রভেদের একটি সুন্দর প্রমাণ এই পুস্তক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফরাসী কবি ভিক্টর হিউগো হইতে রবীন্দ্রবাবুর অনুবাদিত "কবি" শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়া দেখ।[৫]

হ্যুগোর সঙ্গে উক্ত মৌলিক প্রভেদ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁকে অনুবাদ করেছিলেন? সম্ভাব্য একটি উত্তর, নিজেকে আবিষ্কার করার তাড়নায়, এমনকি পৃথক হবার তাগিদে। ঐ প্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অভিমুখিতা ও মহৎ মানবিক মননের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও আজ আর আমাদের কাছে যখন অস্পষ্ট নয়, তখন এ-কথা বললে কি অসমীচীন হবে যে স্বকীয় কবিধর্মের স্পষ্ট আদল পাবার প্রয়োজনেই একদা রবীন্দ্রনাথ হ্যুগোর কাছে গিয়েছিলেন? ভারতী পত্রিকাই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচর্চার প্রথম নিরীক্ষাভূমি। এই পত্রিকায় টেইন প্রমুখ ফরাসি সমালোচকের আদর্শে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন:

১. স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য (শ্রাবণ, ১২৮৫)
২. বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (ভাদ্র, ১২৮৫)
৩. পিত্রার্কা ও লরা (আশ্বিন, ১২৮৫)
৪. গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ (কার্তিক ১২৮৫)
৫. নর্মান জাতি ও অ্যাংলোনর্মাণ সাহিত্য (ফাল্গুন ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬)

প্রবন্ধগুলির নামকরণ দেখলেই মনে হবে, যুরোপীয় কাব্যপ্রবাহের অন্তরাত্মা কবি হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন। এই সন্ধান যখন আত্মস্থ হয়ে এল, তখন শেলিকে তিনি তাঁর পাশে আবিষ্কার করলেন। ভারতী পত্রিকার শ্রাবণ ১২৯১-এর সংখ্যায় 'সিন্ধুতীরে বিষন্ন হৃদয়ের গান' ব'লে তাঁর যে-কবিতটি প্রকাশিত হলো,

৫। জীবনস্মৃতি (১৩৬৬ সংস্করণ), পৃঃ ২০৯

সেটি শেলির 'Stanzas Written In Dejection Near Naples'-এর আশ্চর্য অনুবাদ।

এই কবিতায় 'মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি' (Like light dissolved in star-showers thrown), 'চারিদিকে চমকিছে জলের বিজুলি' (The lightning of the noon-tide ocean), 'আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর' (To me the cup has been dealt in another measure), মুমূর্ষু শ্রবণ' (dying strain) প্রভৃতি পংক্তির বিচ্ছুরণ ছাড়াও লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম পর্বের নৈরাশ্যবিহার :

হায় মোর নাই আশা, নাইকো আরাম—
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহিরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষধন
জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ
ধ্যানসাধনায় যাহা পায় করতলে—[৬]

পংক্তিটি উচ্চারণের স্বরগ্রামে বিহারীলালের উচ্চারণভঙ্গির স্মৃতিবহ। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করতে হবে, নিসর্গ সন্দর্শনের শিরোনামায় শেলির এই একই কবিতার পংক্তি ব্যবহার ক'রে প্রশান্ত আধ্যাত্মিক বিহারীলাল যে-উদ্বেল উল্লাস রচনা করেছিলেন তা থেকে স্বতন্ত্র হবার, যন্ত্রণাচিহ্নিত হবার আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ শেলিকে নিজের মতো ক'রে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কড়ি ও কোমলের মধ্যে বিশ্লিষ্ট অন্তরীপের মতন 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' ব'লে একটি অংশ অবস্থিত।[৭] তলিয়ে দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে, এই অংশে অন্তর্নিবিষ্ট কবিতাবলি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন আত্মৈষণা ও পথ সন্ধানের প্রমাণলেখ ব'লে কড়ি ও কোমলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। কড়ি ও কোমল তথা রবীন্দ্রনাথের মানসী-কালীন কাব্য-পরম্পরা পর্যন্ত কবিহৃদয়ের নৈরাশ্য ও মৃত্যু-সম্পর্কিত অসংখ্য উৎকণ্ঠাকে উপাদান হিসেবে সনাক্ত ও বিবিক্ত ক'রে নেওয়া যায়। কড়ি ও কোমলে জীবন বিষয়ে প্রভূত সুস্থ শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার ফাঁকে তাঁর এই অন্তর্নিরুদ্ধ হতাশ্বাস ও অস্বস্তিকে তিনি এই 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' শীর্ষক কবিতাবলির মধ্য দিয়ে নির্বারিত ক'রে দিয়েছেন। এই অনূদিত কবিতাগুচ্ছের প্রথমটিই হলো শেলির

৬। তদেব, পৃঃ ২০৫

৭। রচনাবলী সংস্করণে নয়, গ্রন্থ সংস্করণেই এটি লক্ষণীয়। দ্রঃ ১৩৬৫ সংস্করণ

সত্যকথিত কবিতার অনুবাদ। এবং রবীন্দ্রনাথ যে মূল কবিতার নাম উল্লেখ না ক'রে কবিতাটিকে সরাসরি উপস্থিত করেছেন, তা থেকে আমাদের এ-অনুমানও সমর্থিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকর্মকে মৌলিক কবিকর্মের অত্যন্ত আত্মীয় একটি প্রক্রিয়া হিসেবেই জেনেছিলেন। বিদেশী ফুলের গুচ্ছের অপরাপর কবিতা-গুলিতেও মূল কবিতার নামানুষঙ্গ অনুপস্থিত। এবং এইসব কবিতার অধিকাংশ পড়তে পড়তে প্রথমেই যে-প্রশ্ন পাঠককে কটাক্ষ করবে সেটি হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ কেন অতো উনখ্যাত বা তথাকথিত minor কবির কবিতাও অনুবাদ করেছেন? এইসব কবিতায় একটি অসংবৃত হাহাকার লক্ষণীয় এবং রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী ব্রাউনিঙ্ কিংবা ক্রিস্টিনা রসেটির কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে সেই হাহাকারের স্বর এতোটুকু ঢেকে রাখেননি, অথবা সমাহিত প্রাতঃস্মরনে পরিণত করেননি। বরং শ্রীমতী ব্রাউনিঙের একটি সনেটকে ভেঙে তিনটি স্তবকে দীর্ঘ বিলম্বিত ত্রিপদীর উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপোক্তিতে মূলের আবেদনটি তীব্রতর করবার প্রয়াস পেয়েছেন। মূল ও অনূদিত একটি অংশ পর-পর রেখে দেখা যেতে পারে :

> I miss the clear
> Fond voices which, being drawn and reconciled
> Into the music of Heaven's debiled,
> Call me no longer. Silence on the bier,
> While I Call God, Call God!
>
> —Sonnet XXXIII, *Sonnets form the Portuguese*

> নীরব হইয়া গেছে সে স্নেহের স্বর
> কেবল স্তব্ধতা বাজে
> আজি এ শ্মশান-মাঝে,
> কেবল ডাকি গো আমি 'ঈশ্বর ঈশ্বর'!

অনূদিত অংশে একটি আন্তর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কেন শ্রীমতী ব্রাউনিঙের কবিতা অনুবাদ করতে বৃত হলেন, তার যুক্তি হিসেবে তাঁরি একটি চিঠি থেকে এই দুটি পংক্তি স্মর্তব্য :

> টেনিসনের মত কবিতায় যে-সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তি-দ্বারা উজ্জ্বলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য। টেনিসনের

অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন ক'রে তুলতে থাকে।[৮]
টেনিসনকে তিনি যে ভাষান্তরিত করলেন না, তার কারণ, টেনিসনের মসৃণ বিবক্ষা। এবং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙকে যে অনুবাদ করলেন তার কারণ অন্তরঙ্গ প্রাণসত্তাকে তিনি ছুঁতে চাইছেন। অন্তরঙ্গ সত্যকে স্বকীয় রচনায় আবিষ্কার করার আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ মহৎ-মাঝারি-অনতিগণ্য নানা বিদেশী কবির কবিতাই অনুবাদ করেছেন। এলিস ফেন্‌ড্রিখের সহায়তায় রিল্‌কেও যে *Sonnets From Portuguese* অনুবাদ করেছিলেন, সে-কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। রিল্‌কের *Sonnette an orpheus*-এ এই সনেট-পর্যায়ে 'থীমে'র নিরবচ্ছিন্ন বিন্যাসের দিক থেকে ঐ অনুবাদকর্মের সঞ্চিত ফলশ্রুতি কোনো না কোনোভাবে কাজ করছিল কিনা, কে বলতে পারে? ক্রিষ্টিনা রসেটি, রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিদের অন্যতমা, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কবিতাকে সাহায্য করেছেন, তার নজির হিসেবে মানসীর 'তবু' নামক চতুর্দশপদীটির কথা উল্লেখ করতে পারি। শুধু প্রথম পংক্তির সাযুজ্যে নয় (তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলি /**Remember me when I am gone away**), ধ্রুবপদের আবর্তনে, প্রেম ও স্মৃতির প্রতিযোগিতার রণনে রসেটির '**Remember**' সনেটটির সঙ্গে এই চতুর্দশ-পদীর সাদৃশ্য আছে। অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল-এর হাল্‌কা চালের প্রেমের কবিতা '**To His Coy Mistress**'-এর '.. **at my back I always hear/Time's winged chariot hurrying near**'-এর সঙ্গে 'বিদায়ের'র 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারি রথ নিত্যই উধাও' ইত্যাদি অংশের যে-সাদৃশ্য তা হয়তো নিতান্তই আকস্মিক; কিন্তু মহুয়া-পর্বে তিনি ডান্‌-কে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ শেষের কবিতায়; এবং এমন হওয়া কি অস্বাভাবিক যে ডান্‌-এর 'পারমার্থিক' কাব্যধারায় সতীর্থ এবং বিশিষ্ট কবি অ্যাণ্ড্রু মার্ভেল-কেও তিনি পড়েছিলেন?

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অনেক কবিকেই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, তাঁর বিদেশী কবিতার পাশাপাশি চলেছিল ভারতীয় কবিতার অনুবাদ। মাত্র সতেরো বছর বয়সে মারাঠী কবি তুকারামের যে-সব অভঙ্গ তিনি তর্জমা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যেও তাঁর মানসিকতা

৮। ছিন্নপত্রাবলী, চিঠি ২৫১

স্ফুটমান। বিদেশী কবিতার কাছে যে-চাঞ্চল্য তিনি অর্জন করেছিলেন, তাকে ভগবদ্‌ভক্তির দিকে নিয়োজিত করার চেষ্টা তাঁর এই অভঙ্গ-অনুবাদের ভিতরে স্পষ্ট। কিন্তু ভক্তিবাদের প্রতি তাঁর কোনো গোষ্ঠীগত অথবা তত্ত্বগত আসক্তি কখনোই ছিল না। ভারতীর প্রথম বছরে শকুন্তলা থেকে নিয়ে উদ্ধৃত তাঁর অনুবাদ এই কথা প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতবর্ষ বলতে তিনি ভক্তিধারার ঐতিহ্যকেই বোঝাননি তার প্রেমের সংরাগের কাব্যপ্রবাহকেও বুঝেছিলেন :

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে
অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছু বাগে
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
পতাকা তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।[৯]

তিনি আর্ট বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে জীবন ও সত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়ে পড়লে 'ওরিয়েণ্টাল মিসটিসিজ়মের নামধারী এক স্বরচিত কুহেলিকার অন্তরাল থেকে' বিদেশীরা তাঁকে দেখতে পারেন, এই আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।[১০] এবং তাঁর কালিদাস তথা সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতীয় কাব্যানুবাদচর্চার উদাহরণ দেখলে বোঝা যাবে নিছক তত্ত্ববোধিনী কবিতা তাঁকে প্রলোভিত করেনি। কয়েকটি উদাহরণ :

১. নেপথ্য পরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শন সমুৎসুকং তস্যাঃ
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্‌॥
—মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌

১. নেপথ্য পরিগত প্রিয়া সে
রূপখানি দর্শন তিয়াসে
আঁখি মোর উৎসুক দশাতে
তিরস্করিণী চাহে খসাতে।

২. ইয়ম প্রতিবোধশায়িনীং রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী
গতিবিভ্রম-সাদ-নীরবা ন শুচা নাহ মৃতেব লক্ষ্যতে॥
— রঘুবংশ

৯। সাহিত্যের পথে, গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ২৬০
১০। 'রূপশিল্প', সাহিত্যের পথে, সংযোগ পৃঃ ১২

২. এ মেখলা তব প্রথমা রহঃসখী
গতিহারা দেহে নিক্কণ হারালো কি!
মনে হয় যেন সেও বুঝি তব শোকে
তোমারি সঙ্গে গিয়াছে মৃত্যুলোকে।

৩. বদসি যদি কিঞ্চদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

৩. বচন কহ গো ফুটি
দশন রুচি উঠিবে ফুটি
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী।

৪. বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনানং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডার

৪. কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

৫. বরিষ জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুরি ফুল্লিঅ নীবা।
পথর-বিত্থর হিঅলা
পিঅলা (নিঅলং) ণ আবেই।

—প্রাকৃত কবিতা

৫. বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
শীতল পবন বহে সঘনে
কনক-বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে

উদ্ধৃত অনুবাদগুলির সার্থকতা নিঃসন্দেহে তর্কাতীত। এবং সন্দেহ নেই যে অনুবাদগুলি তত্ত্ববিতরণের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য হয়নি। এমন-কি,

তত্ত্বকথন-ঘেঁষা বেদমন্ত্র, ধম্মপদ, সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার, নবরত্নমালা প্রভৃতি শ্লোক সংগ্রহ ও সুনীতি-সূক্ত অনুবাদকালেও রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন কারুকাজ উদ্দেশ্যবাদ অতিক্রম ক'রে গেছে। বেদমন্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ বিবিধ প্রসঙ্গে নানা-ভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ধম্মপদগুলিকে তা করেননি। অথচ ধম্মপদ তর্জমার অন্তরালে তাঁর মনে যে কোনো উদ্দেশ্যই প্রচ্ছন্ন ছিল না, এমন নয়। তবু দু-একটি অনুবাদ দেখা যেতে পারে :

১. কো ইমং পঠবি বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্সতি ॥

১. কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকেতন
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া ফুলের মতন ?

২. কেণূপমং কায়মিমং বিদিত্ব মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো।
ছেত্বান মারস্স পপুপ্‌ফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজসস গচ্ছে ॥

২. ফেনের মতন জানিয়া শরীর মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে
ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যাবে !

ধম্মপদের অপ্পমাদবগ্‌গো পর্যায়ে :

পমাদং অপ্পমাদেন যথা নুদতি পণ্ডিতো।
পঞ্ঞাপাসাদমারুয্হ অসোকো সোকিনিং পজং।
পব্বতট্‌ঠো ব ভূম্মটঠে ধীরো বালে অবেকৃখতি ॥

এই সুভাষিতটি অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লেখেন :

গিরি হতে ধীর যথা চপলেরে হেরে ভূমিতলে
তেমতি পণ্ডিত নাশি প্রমাদেরে অপ্রমাদবলে
প্রজ্ঞার শিখর হতে অশোক হেরেন শোকী-দলে।

এই প্রথম পাঠে 'শোকী' শব্দটি নিশ্চয়ই অনুবাদকের কাছে অসুখী ঠেকেছিল এবং শব্দপ্রতিষ্ঠ পংক্তি রচনা করার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই পরিবর্তন ক'রে লিখলেন :

জ্ঞানী অপ্রমাদ বলে প্রমাদেরে ফেলি দিয়া দূরে
প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে অশোক হেরেন শোকাতুরে ;
গিরি হতে ধীর যথা দেখেন ভূতলে যারা ঘুরে।

বলা বাহুল্য মাত্র, এইসব উদাহরণ অনুবাদ-সাহিত্যে চিরায়তরূপে স্বীকৃত হবার যোগ্য। উদ্দেশ্যের সাধুতা শিল্পের ছলনাকে এ-সব ক্ষেত্রে যে ম্লান করতে

পারেনি সেটিও লক্ষণীয়। নিবিষ্ট মনোযোগে দেখা যাবে, যে ভারতীয় কবিতা-অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দ্বিপদী-চৌপদী অথবা অনুরূপ মিতায়ত পরিসরের অংশ অনুবাদের প্রতিই সমধিক দৃষ্টি রেখেছেন। এই রকম স্বল্পায়তন কবিতায় একই সঙ্গে বক্তব্য ও কাব্য সৌন্দর্য ফোটানো সম্ভব, তুলসীদাস এ-কথা অনেকদিন আগেই ব'লে গিয়েছেন :

পুরইনি সঘন চারু চৌপাঈ।
জুগুতি মঞ্জু মনি সীবা সোহাই ॥
ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা।
সোই বহুরঙ্গ কমল কুল সোহা ॥
অরথ নূতন সুভাব সুভাসা।
সোই পরাগ মকরন্দ সুবাসা ॥

(সুচারু চৌপাইগুলি পদ্মের মৃণাল যেন, যুক্তিগুলি ঠিক যেন মনোহর মণিভরা ঝিনুকের মতন। ছন্দ সোরঠা দোহা এরাও যেন নানান রঙের পদ্ম, তাদের নিরুপম অর্থ, সুন্দর ভাব ও ভাষাও সেই পদ্মের পরাগ মধু আর সুবাস।)

একই কারণে, রবীন্দ্রকৃত ভারত-কাব্য অনুবাদের প্রধান অংশটি ছোটো-ছোটো কবিতায় পরিকীর্ণ ব'লে মনে হয়। এইসব কবিতায় অনেকগুলিতেই কবি প্রকারান্তরে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই ব্যক্ত বক্তব্য রহস্যগুণান্বিত।

কবীরের হোলি উপলক্ষে লেখা একটি কবিতাকে অনুবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি ক'রে উদ্দেশ্য-অতিশায়ী রহস্যের অভিমুখে গিয়েছেন, তার একটি অব্যর্থ উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে চাই :

পিয়াকে পগিরা রঙ্গী জোনা রঙ্গমে
হমরো চুনরিয়া রঙ্গানা
চূড়াটি তোমার যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার চুনরি রাঙায়ে দিয়ো।

অনূদিত অংশটি তাঁর শেষ পর্বে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় তিনি অত্যন্ত সফল-ভাবেই কাজে লাগিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন :

এ কাব্য। এর মধ্যে একটি হৃদয়াবেগ নিবিড় হয়ে আছে ; কানাড়ার স্পর্শে সে উচ্ছলিত হয়ে উঠল, কিন্তু শুধুমাত্র কানাড়ার আলাপে এর বাণী থাকে

বোবা হয়ে। বাণীর যোগে কানাড়া একটি বিশেষ রস পেয়েছে, তার দাম কম নয়।[১১]

কথা ও সুর, বক্তব্য ও রহস্যের মিলনেই পরিপূর্ণ সংগীত বা শিল্পের জন্ম ; শিল্প সেই পুনর্জাত অভিজ্ঞতা যা মানবহৃদয়ের চূড়ান্ত অভিজ্ঞান মনে ক'রে অনির্বচনের সাম্রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। 'সাহিত্যের স্বরূপ'-এ দেখা যাবে এই কথাটার উপরে ঘা দেওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবীরের উক্ত কবিতাটিকে আরো তীব্র দ্যুতিতে দর্পিত ক'রে তর্জমা করেছেন :

তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচুলি।

রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্যায়ী বিদেশী কবিতার অনুবাদের মধ্যে ঐ একই ঝোঁক। মানবজীবনের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার ছাপ আধুনিক য়ুরোপীয় কবিতার কাছে তিনি খুঁজেছেন। এলিঅট অথবা এডউইন রবিন্সনের কবিতার অংশ অনুবাদ ক'রে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন হয়তো জীবনের অভিজ্ঞতা সেখানে আছে, কিন্তু নেই সেই আত্মস্থ আত্মতা যা কবিতাকে কবিতা পদবাচ্য করে। অবশ্য এলিঅটের 'দি জার্নি অব্ দি ম্যাজাই' কবিতাটিতে তিনি যে মানবজীবনের তীক্ষ্ণাগ্র ও স্পষ্ট বোধ আবিষ্কার করেছেন, তার প্রমাণ রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী'র (১৩৩৯) পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই অনূদিত কবিতার ঈষৎ পূর্বে রচিত 'শিশুতীর্থ' (১৩৩৮) কবিতাটিতে নৈরাশ্য-বিহার ও অন্তিম তীর্থতোরণস্পর্শের যে মায়াবী ও দিব্য আত্মপ্রসাদ পাওয়া যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের কাছে সেই উপকরণ-অতিক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা কখনোই পাননি। এমি লোয়েলের কোনো কবিতায় ('Red Slippers') বরং বাস্তবতার সঙ্গে ব্যঞ্জনার সদ্ভাব তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেটি তিনি অনুবাদ করেননি। এবং তাঁর 'এ লেডি' কবিতাটির সময়শোভন উগ্রতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় যে-ভাষান্তর করেছেন, তা নিছক নমুনা হিসাবেই কৌতূহলসঞ্চারী। বরং 'শাশ্বতভাবে আধুনিক' কাব্যের নজির রাখতে গিয়ে তিনি সুদূর চীনা কবিতার কাছে গিয়েছেন, নির্ভার স্বচ্ছ ভাষাপত্রে লি-পোর কবিতা রেখেছেন। কাব্যের যথার্থ আধুনিকতা খুঁজতে গিয়ে তিনি

১১। 'আধুনিক কাব্য' ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পথে।

আধুনিক কাব্যকে বহুলাংশে অভিযুক্ত করলেও তাঁর রচিত [illegible] দশকের কবিতায়— তাঁরি ভাষায়— 'বিশ্বকাব্যের মোহমুক্ত ভাষ্য' যে-পরিমাণে নিরীক্ষণ করি, তার প্রাচুর্য ও প্রখরতা দেখে এ-কথা মনে করলে অন্যায় হয় না যে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় আধুনিক কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়েই উঠে-ছিলেন এবং তারি বহু অনুকূল প্রতিক্রিয়া তাঁর কাব্যের শেষ পর্যায়ে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের নিজভাষায় যে-বর্ণাঢ্য অনুবাদগুলি করেছেন, তার পাশে ইংরেজিতে তৎকৃত তর্জমার রক্তাল্পতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র এটি নয়। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে ক্রমশই প্রশ্ন উঠছে, তা যে একেবারেই তথ্যহীন এ-কথা বলবো না। কিন্তু এণ্ড্রুজ বা ইএট্‌সকে যা একদিন আবিষ্ট করেছিল তা শুধু বার্তা বা message নয়, সুর। এবং ইংরেজিতে স্বরচিত কবিতার তাঁরি অনূদিত অন্যান্য রূপান্তরগুলি নিয়ে এই প্রবন্ধের পরিসরে আলোচনা করার সুযোগ এই জন্যেই নেই যে, প্রথমত, বিদেশী ভাষায় স্বকীয় কাব্য অনুবাদ কোনো পুরোধা কবিই নীতলক্ষ্য হননি, পূর্বোক্ত ভাবাসঙ্গ ও ভাষাসঙ্গের বেড়া পেরিয়ে এবং গৌণত, সেই কর্মে বিবেচ্য সাফল্যের জন্যও যে-শ্রম ও সময় নিয়োগ করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তা করেননি।

কিন্তু তা থেকে এ-কথা কখনোই প্রমাণ হয় না যে মাতৃভাষায় অনুবাদকর্মের উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত অথবা অবিশ্বাসী ছিলেন।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায় : ব্রাহ্মমুহূর্তের সন্ধিক্ষণে

গীতাঞ্জলি প'ড়ে এজ্‌রা পাউণ্ডের মনে পড়েছিল দান্তের পারাদিসোর কথা। এই এই তুলনাসূত্রটিকে ক্লিষ্ট না করেও বাড়িয়ে নেওয়া চলে। এমন কথা অসংকোচে বলা চলে রবীন্দ্রনাথকেও দান্তের মতো পর্যায় থেকে পর্যায় পার হয়েই পরিণতির দিকে যেতে হয়েছিল। Karl Vosser-এর বিশ্লেষণে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে, দান্তের উদ্ভাসিত ঈশ্বরীস্তোত্রের পূর্বপটে আছে মানবস্বভাবের অনালোকিত, অমীমাংসিত স্তর। বিশেষ Canzoniere-এর একগুচ্ছ কবিতায় সেই রক্তমাংসের দেহমানস এতো স্পষ্ট এতই উচ্চারিত যে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বটি চিনে নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রযোজন হয় না। অথচ কে না জানে এ শুধুই একটি স্তর, যাকে ছাপিয়ে দান্তের মিলনান্ত মন্ত্রভাষণ, পারাদিসোর সৌরশিখর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এভাবে স্তর-নিরূপণ যে একান্ত অসম্ভব এমন কথা মেনে না নিলেও এ-কথা বলব তিনি সে-সুযোগ আমাদের একরকম দেননি। তাঁর রচনার প্রথমতম পর্যায়টিকে তিনি কেন সূর্যের মুখ দেখাতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তার কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর সেই পর্বের রচনায় ভূ-সংস্থান জেগে ওঠেনি। এখানে একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে প্রায় প্রথম থেকেই ভাষার সমস্যা হিসেবে নিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এবং সেই ভাষাকে মানুষের পবিত্রতম সাংস্কৃতিক পরিচয়, তার আদান-প্রদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ব'লে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। ফলত তারুণ্যের প্রথম বাঁকে ঘুরেই তিনি ভাষার সেই ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠলেন। আজ যাকে আমরা 'অচলিত সংগ্রহ' ব'লে অভিহিত করছি, তার সঙ্গে তাই তাঁর পরবর্তী রচনাবলির আপাত দুস্তর ব্যবধান। অচলিত সংগ্রহ বা তৎ-সংক্রান্ত কবিতাবলি অসমান, স্বভাবে কাছাকাছি, unsophisticated। এর অব্যবহিত পরেই আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে দেখিতে পাই মননে ও কথনে সুসমঞ্জস, আদর্শের আভায় দীপ্যমান, Sophisticated রূপে। গীতাঞ্জলির অনেক আগেই, চিত্রায়— এমন-কি তারও আগে, সম্ভবত প্রভাত-সংগীতেই পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে তাঁর আত্মসচেতন শব্দব্যবহার, সৌজন্যসুন্দর আলাপচর্চার বরেণ্য মূর্তিটি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই আতিথেয়তা নিরুত্তাপ নয়,

আদর্শবাদ স্বভাব-বিবিক্ত নয়। অচলিত সংগ্রহের অনাদৃত ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে মানসীর এক পর্যায়ের রক্তিম কবিতাগুচ্ছ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় ঐহিক সত্তার তীব্র উত্তাপ কখনো অবাধে কখনো অতর্কিতে প্রকাশমান।

সেই মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয় আত্মনির্মিতির, দোলাচলের। তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে সেই মুহূর্তের অভিঘাত যে-প্রবণতা সূচিত করেছিল, তাকে কি সাহিত্য সমালোচনার পরিভাষা অনুসারে neo-romantic বলব? যতোদূর মনে পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পূর্বে এবিষয়ে চিন্তান্বিত হননি। রোমান্টিক কাব্য-আন্দোলনের অণুসূক্ষ্ম স্তর-বিবর্তন বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' ও 'নিয়ো-রোমান্টিক' শব্দ দুটিকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। শেষোক্ত শব্দটির তাৎপর্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এক যুগসন্ধির কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে-ছিলেন:

It is needles to state we resume the term neo-remantic for the epoch, or stage, which is the subject of this paper, giving it wider and comprehensive meaning, according to the terms neo-classical and neo-oriental. —***New Essays in Criticism***

নূতন প্রাচীর যে দু-জন কবি এই মুহূর্তে সতীর্থ, সক্রিয় ও নব্য রোমান্টিকতার লক্ষণে চঞ্চল, তাঁরা অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ। একদিকে ভারতবর্ষীয় মনোভঙ্গি অর্পণে উন্মুখ, অপর দিকে সদ্য-সমাগত পশ্চিমী কবিতার থেকে অর্জিত অবাধ্য হৃদয়ের ভাষা এঁদের তখন নিরন্তর দোটানায় উচাটন করেছে। তাই

উন্মত্ত কবির মত
গড়ে ভাঙে অবিরত
লয়ে এক অন্ধ শক্তি কল্পনাভীষণ—

অক্ষয়কুমারের এই অকপট ক্রন্দনের উত্তেজনা মানসী-পর্বের রবীন্দ্রনাথেও:

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।

যদিও একই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবিপ্রদত্ত সান্ত্বনা

সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক-কল্পনা।

তবু সন্দেহ থাকে না রবীন্দ্রনাথ তখনো দ্বিধাবিদ্ধ, প্রশ্ন-জর্জরিত। যে যন্ত্রবিশ্বের

সঙ্গে হৃদয়ের সংঘর্ষে অক্ষয়কুমার জীবনকে বলেছেন 'অদৃষ্টের ছলা', রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জড়ময় সৃজন' তার সঙ্গে রফানিষ্পত্তির চেষ্টায় তাঁদের কবিতা দীর্ঘদিন সংক্ষুব্ধ, প্রস্তুতিময়।

সেই সময়ে রচিত 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিতার নূতন ভূমিকা সম্পর্কে যে-অভিমত জানিয়েছেন তাতে কবির সচেতন সংকল্প ধরা পড়েছে :

'জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস-সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্যপ্রিয়, কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল!... পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া ঊষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সংকীর্ণ হইয়া আসে!... যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ড-কাব্য গীতি-কাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।'

অর্থাৎ, সত্য যে আপেক্ষিক, সেই কথা এখানে বলা হলো। এবং এ-কথাও প্রকারান্তরে অভিব্যক্ত হলো যে কবি কোনো সার্বজনিক সত্যের উদ্‌গাতা নন, তিনিও রহস্যময় অন্ধকারের মন্ময় ভাষ্যকার এবং লিরিক অথবা লিরিকধর্মী কবিতা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অনুভূতির আধার, কবি-কাহিনীতে এইসব কথাই কবিতায় অনূদিত করছে :

নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চোখের সমুখে—
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীভৎস ভাঙ্গন
তোমার চোখের পরে হবে প্রকাশিত ;

দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত।

রাত্রির এই স্তব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ক্ষমাহীন বস্তুসত্যকে নিজের মতো ক'রে সাজিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে এর জন্ম। তাই প্রায় পরমুহূর্তেই প্রকৃতির প্রতি কবির প্রগাঢ় অনাস্থা :

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন,
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ যে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি
বিস্তৃত যে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিধর,
আঁধার যে পর্বতের গহ্বর বিশাল,
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর,
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারেনা পুরিতে তারা, বিশাল মনুষ্যহৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

আজকের পাঠক ঐ মানুষেরি শব্দটিকে 'মানুষী' শব্দের সঙ্গে একাকার ক'রে ফেলতে পারেন— জীবনানন্দের অনুষঙ্গে :

তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

('সুরঞ্জনা')

এবং জীবনানন্দের মতোই রবীন্দ্রনাথের কৈশোর পর্যায়ের কবিতা প্রেম ও অপ্রেমের দ্বন্দ্বে জীবন্ত, প্রেম ও মৃত্যুর তত্ত্ব লেশশূন্য সংস্পর্শে সংরক্ত। এই প্রেম যে ইন্দ্রিয়স্পর্শী তার অভিজ্ঞান 'রাক্ষসী স্বপ্নের তরে, ঘুমালেও শান্তি নাই / পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত' এই রকম উচ্চারণে প্রকট। ফলত, মৃত্যুও যে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে রোমাঞ্চকর, আকাঙ্ক্ষাসুন্দর তারও দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয় :

মনের কঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়

কানের কাছেতে গিয়ে বায়ু কত কথা ফুসলায় !

তটিনী কহিছে কানে উঠ। উঠ। উঠ নিদ্রা হতে

ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ আঘাতে।

অধোরেখ অংশের স্বরক্ষেপ ছাড়াও পাঠকের মনে পড়বে জীবনানন্দকে, মনে পড়বে জীবনানন্দের 'শব' নামক কবিতাটি কোনো রমণীর মৃতদেহ ঘিরে নিসর্গচিত্রণ। প্রসঙ্গত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম অনিবার্য। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' মিলনান্ত একটি আখ্যায়িকা হলে আধুনিক মানসের নানা উপাদানে আপূর্যমান। আজকের পাঠকের কাছে এই আখ্যায়িকার তিন-চতুর্থাংশ কাব্যাংশে পাংক্ত ব'লে গণ্য হবে। কিন্তু এর আপাতমেদুর প্রচ্ছদ সরিয়ে ভিতরে তাকালেই চোখে পড়বে কবির অস্থির একটি অন্তর্জ্বালা। কবি এমন কয়েকটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা নিছক রোমান্টিক নয়, নিয়ো-রোমান্টিক। বলা যায়, ব্যক্তিচরিত্রের আত্মসন্ধানই অক্ষয়চন্দ্রের কবিতার অন্যতম বিষয়। রোমান্টিক কবির লক্ষ্য অবাধ আত্মপ্রকাশ, ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত মূর্তন। পক্ষান্তরে, নিয়ো-রোমান্টিক কবির উৎসাহ আত্মসন্ধিৎসায়, ভাবনা-মননে। সেই অর্থে অক্ষয়চন্দ্রের কাব্য নিয়ো-রোমান্টিক। এই কাব্যের প্রেমিক প্রতিশ্রুত তৃপ্তির মুহূর্তে পলাতক, প্রেমিকা পাপবোধে জর্জরিত। সেই প্রেমিকের বিস্ময়কর অন্তর্ধানের মুখে :

ভয়ঙ্কর বেশ ধরি কল্পনা শত্রুতা করি

বিভীষিকা করে প্রদর্শন।

এবং অন্বেষণের মুহূর্তে প্রেমিকার মনে হয় :

মহিষ গণ্ডার কত চেয়ে চেয়ে থাকে,

পাপিনী বলিয়ে বুঝি ছুঁলে না আমাকে।

তন্ন তন্ন করি দেবি ! দেখি চারিধার—

সহসা সাহস ভঙ্গ, আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ

শুনিলাম শৃগালের অশিব নিনাদ

গৃধিনীর ঘোর রবে আকুলিত বনে সবে

ভাবিলাম কি জানি কি ঘটেছে প্রমাদ।

ঘুরিছে মেদিনী চক্রের মতন,

ভয়ের বিভ্রমভরে, ভয়ঙ্কর কলেবরে

বহুরূপী বিভীষিকা করি নিরীক্ষণ।

এই বহুরূপী বিভীষিকা অবশ্য অচিরেই অক্ষয়চন্দ্রের পৌরোহিত্যে একটি ধর্মীয় শুভৈকসুন্দর পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনা পর্যায়ে অশুভ ও অসুন্দরকে একটি ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবন নামক প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তাকে বুঝবার জন্য বিপজ্জনক নিরীক্ষার ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বয়ঃসন্ধির নায়কেরা প্রায়শই, কখনো কখনো ছেলেমানুষির ছাপ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে :

রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ !

—কবিকাহিনী

এবং পরিব্রাজকের এই দুর্মর পিপাসা যেমন পুরুষ চরিত্রকে চিহ্নিত করেছে, তেমনি নারীচরিত্রকেও বিশেষত নারীর পাপবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে তাঁর এই পর্বের চরিত্র-চিত্রণকে রক্তাভ ক'রে তুলেছে :

সেই মূর্তি নীরদের ! সে মূর্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে ?
তবুও সে পাপ আহা নীরদ যখন
বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে !

—বনফুল

সচেতন পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, নারীর এই পাপবোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিতায় ক্রমশ পুরুষের পাপবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে রূপান্তরিত ও শক্তিশালী হয়েছে। মানসীর 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'নিষ্ফল কামনা', 'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই এই কথাটি নির্ধারিতরূপে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ মানসীতে এসে পুরুষের কাছে নারী অনুধাবনের, অনুধ্যানের, উপাসনার বিষয় হয়ে উঠেছে ; ইতিপূর্বে যে তারা সমস্তরে দাঁড়িয়েছিল, অস্তিত্বের মুহূর্তলাঞ্ছিত বাস্তবতায় একযোগে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই স্বেদাক্ত সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার স্তর থেকে এবার নারীকে বিশ্রাম দিলেন। এ-কথা তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে খাটে না, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তীব্ররূপে প্রযোজ্য। মানসীর 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় নারীকে ঈশ্বরীর ভূমিকায় নিরীক্ষণের প্রথম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রায় নারী ও ঈশ্বরী একাকার এবং সেই যুগ্মসত্তাকে জীবনদেবতা বা বিশ্বদেবতা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তা বিয়াত্রিচের মতোই কবির কাছে সত্য, ঊর্ধ্বাকর্ষী, পরীক্ষোত্তীর্ণ পূর্ণতার

প্রতিমা। সেই নারীশ্বরী কবিকে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শুদ্ধশীল সুন্দরের ধারণায় চালিত ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। দান্তের মতোই জীবনব্যাপী সেই অভিসার, সেই দিব্য ভাবসম্মেলনের প্রতিশ্রুতি। নারীর হাত থেকে পূর্ণতার ছাড়পত্র অর্জনের পৌরুষব্যঞ্জক সংগ্রামে দান্তে ও রবীন্দ্রনাথের জীবন বেগবন্ত সাংকেতিক নাটকের উদাহরণ।

পূর্ণতা অর্জনের এই সংগ্রাম যখন মানচিত্রের মতো ক্রমপ্রসারী নব নব দিগন্তের সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতিময় হয়ে ওঠে নি, সেই সময়ের রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ছিল স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত বেশি। সেই পর্বের রচনায় অস্পষ্টতা শুধু অনিবার্য নয়, বরণীয় ছিল। 'ভুল' (১৮৮৭) নামক কাব্যগ্রন্থের সূচনায় অক্ষয়কুমার গ্যেটের বচন ইংরেজী তর্জমা থেকে উদ্ধৃত ক'রে পাঠককে জানিয়েছিলেন, 'All good lyrics must be reasonable as a whole, and yet in details a little unreasonable' অক্ষয়কুমার তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ পরিমার্জনা করেছেন, প্রকরণের প্রয়োজনে ভাবনার বশ্যতা ঘটিয়েছেন। লিরিকের প্রধান শর্ত যে শৃঙ্খলাশূন্য জীবনের পাশাপাশি মিতায়তন রূপকল্পের সাধনা, সেই কথা স্পষ্ট ক'রে 'প্রদীপ' (১৮৮৪) কাব্যের অন্তর্গত "গীতি-কবিতা"য় গাঢ়স্বরে আমাদের জানিয়ে বলেছে: 'নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী।' রবীন্দ্রনাথও ইতিমধ্যে 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখেছেন, লিরিকের ঋজুহ্রস্ব ও ঘনীভূত এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তার আগে তাঁর অনচ্ছ 'ফর্ম'-শূন্যতা, রাগিণীর ধ্রুবপদে উপনীত হওয়ার আগে অস্থির আলাপ। তখন তাঁর মনে হয়েছে—

অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি।

—কবিকাহিনী

অথবা

সেই অর্থহীন কথা হৃদয়ের ভাব যত
প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।

—কবিকাহিনী

কাহিনী কবিতা রচনার আগ্রহ যখন অবসিত হয়ে এল, সেই সন্ধ্যাসংগীতে এই অস্থিরতা ছোটো-ছোটো কয়েকটি উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গবলয়ে ধরা দিয়েছে। স্তবকনির্মাণে অযত্ন থেকে শুরু ক'রে প্রস্বরবিক্ষোভে স্বৈরবৃত্ততার এই

অভিব্যক্তি প্রকট। সন্ধ্যা, হলাহল, পরাজয়-সংগীত, তারকার আত্মহত্যা প্রভৃতি কবিতায় শিল্পরূপ শুধু অনুপস্থিত নয়, অবাঞ্ছিত। প্রভাতসংগীত বরং ঐ অপর্যাপ্ত আশাবাদের মধ্যেও কাব্যানুশাসনের আভাস দেখা দিয়েছে। প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতা আহ্বানসংগীতের আরম্ভেই আত্মধিকার মাত্রাবৃত্তের প্রসাদে সুরে বেজে উঠেছে :

মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িলি
আপনি হইলি হারা।

এ যেন পরবর্তীকালে তাঁর রচিত 'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ' গানটির পূর্বাঙ্কুর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবিতাটির অজস্র পাঠ থেকেও এ-সিদ্ধান্ত ন্যায্য, 'প্রভাতসংগীতের' কবিচৈতন্যের অনিঃশেষ অপাবরণে উৎসুক। বিবেক যেন হৃদয়কে অন্তর্নিরুদ্ধ গুহা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে কিন্তু সাবধান পাঠকের চোখে এই সত্য এড়াবে না যে সেই মুক্তি নিঃশর্ত নয়। সেই শর্ত শোচনা নয়, পরিতাপ নয়, শুভ বিবেকের সাহচর্যে হৃদয়ের গ্লানিক্ষালন, রৌদ্র-স্নান। কিন্তু 'শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে' সেই 'ছবি ও গানে' যেন কখনো-কখনো শেষবারের মতো হৃৎপিণ্ডের উৎকণ্ঠা ঘোষণা করার দুর্মর আগ্রহ। যেমন আর্তস্বর কবিতায় :

নিশীথ সমুদ্র মাঝে জলজন্তু সম সাজে
নিশাচর যেন রে অগণ্য।

অথবা

এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে
তন্ন তন্ন আকাশ গহ্বর।

কিংবা প্রত্ন-মাত্রাবৃত্তে ট'লে-যাওয়া অথচ আশ্চর্য অভিঘাতসম্পন্ন কবিতা রাহুর প্রেমে

কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন,
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী।

কিন্তু এর অনতিপরেই রবীন্দ্রনাথের চিরবাঞ্ছিত উত্তরণ, 'মানসী'তে।

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি—.
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

('সুরদাসের প্রার্থনা')

লক্ষ করা দুরূহ নয়, শেষোক্ত উদাহরণে নারী পুরুষের নিয়ন্ত্রী হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতা থেকে কমনীয় অথচ পরিশীলন ব্যবধানে সরে গিয়ে।

'ক[illegible]মানসী'র অব্যবহিত পূর্বলেখ। এই কাব্যের sensuousness যতই উচ্চারিত হোক তা তাঁর পূর্ববর্তী কবিতাপ্রবাহের ঐন্দ্রিয়িক অসন্তোষের তুলনায় অনেক শান্ত, সুমিত, এমন-কি রোমান্টিক লালিত্যে স্নিগ্ধ। 'কড়ি ও কোমল' নিজেকে কবি কিছুমাত্র নির্যাতন না ক'রে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা কখনো গীতিবন্ধে, কখনো সনেটবন্ধে। এ দুটিই ব্যক্তিগত, অথচ ব্যক্তিগত নয়। আগের তুলনায় এ যেন দেহসংক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ ভাষ্য। এখন থেকে তাঁকে আর নিজেকে প্রকাশ ক'রেও 'ব্যক্তিগত' ব'লে অভিযুক্ত হতে হবে না :

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লযে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়রাত্রি বহিব নির্ভয়।

('মরীচিকা')

'কড়ি ও কোমল'কেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর নিজস্ব প্রথম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। অনিকেত বিষয়ী এখানে কোথাও নিজেকে আরোপ করেনি, বিষয়ের আশ্রয়লাভ করেছে। 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে,' কবির এই উক্তি শ্লথকথন নয়, নিজের কবিতা বিষয়ে একটি সূত্র পেয়ে যাওয়ার উপলব্ধিতে আলোকিত। বিষয়ী এবং বিষয় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতায় একাসনে বসেছে 'কড়ি ও কোমল' থেকেই, এবং সেই কারণেই এই কাব্যকে তিনি কবিতা হিসেবে প্রথম অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন।

এ কথার অর্থ এই নয় যে 'মানসী'তে বা 'মানসী'র পরে তিনি যা যা লিখেছেন সবই বিষয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অন্যোন্য সামঞ্জস্যে, মগ্ন আত্মস্থতায় প্রতিষ্ঠিত। শুধু

বলব, অস্মিতার সেই স্বরাঘাত কোথাও নেই যা বিষয়ের থেকে বিশ্লিষ্ট বা বিবিক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত, এমন কি 'বলাকা' 'পলাতকা' পর্যন্ত এই বিষয়নিষ্ঠ হৃদয়ধর্ম প্রসারিত। এখানে আরেকটি সূত্রও লক্ষ্য করতে হবে। যে মুহূর্ত থেকে তিনি তাঁর খসড়া আমাদের দেখতে দিলেন, তিনি যেন আমাদের ব'লেই দিলেন যে আমাদের চোখের উপর তিনি নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবেন বারবার ; একবার তিনি সিন্ধুতরঙ্গে নামবেন পরক্ষণে তীরে ফিরে আসার জন্য, একবার সারারাত্রি হাহাকার করবেন অকস্মাৎ প্রাতঃস্বননের জন্য। রোমাণ্টিক যন্ত্রণার্তি এতটুকু এড়িয়ে না গিয়েও তাকে মনঃপূত পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্য তাঁর কাব্যগ্রন্থের পরিপূরক, পরিণাম অব্যবহিত পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ। সন্ধ্যা সংগীত-প্রভাত সংগীত, কড়ি ও কোমল-মানসী, সোনার তরী-চিত্রা, খেয়া-গীতাঞ্জলি, শেষ সপ্তক-বীথিকা, প্রান্তিক-সেঁজুতি, রোগশয্যায়-আরোগ্য— কত উদাহরণ যোগ করব ? এ-ভাবে মিলিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সামগ্রিক সূত্রটি আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে।

'সোনার তরী'র শেষ কবিতা নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে 'চিত্রা'র অন্তিম কবিতা সিন্ধুপারে যুক্ত ক'রে দেখলেই একটি আত্মসচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি চোখে পড়ে। দুটি কবিতার পটভূমি খুব কাছাকাছি। দুটিরই বিন্যাস ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে, তফাৎ শুধু চলনে। যে-নারীটি তাঁকে সমুদ্রযাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই সিন্ধুপারে নিয়ে এলেন তাঁকে। একই নারী দু-জনে, ইঙ্গিতভাষায় কথা বলেন, মন্ত্রচালিত কবিকে নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে চলে যান এক রহস্যময় বিবাহ সভায়, দুরূহতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে হেসে ওঠেন। ঐ বিবাহ তাঁকে তো কোথায় বিশ্রাম করতে দিল না, নিরন্তর আত্ম-উত্তরণের যজ্ঞকর্মে জাগিয়ে রাখল। একটি অপরিণাম মুছে পরিণামে, সেই পরিণাম মুছে ফেলে অপর পরিণামে ধাবিত হবার নামই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজে কখনও সেই কৃতিত্ব দাবি করেননি, ঊর্ধ্বতন এক সত্তার কাছে হস্তান্তরিত ক'রে এগিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো জানি সেই ঊর্ধ্বতন সত্তা—নারীই হোক আর জীবনদেবতাই হোক—নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সংগ্রামে উদ্ভুত। যে-রাত্রি তিনি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রভাতে পরিণত করেছেন নিজেই। কিন্তু সেই সকালের প্রাক্-মুহূর্তের অস্থির প্রত্যূষক্ষণটিকে ভুলে গেলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হবে।

তোমার সৃষ্টির পথ

শেষ লেখার শেষ কবিতাটি রবীন্দ্রমগ্ন পাঠকদের কাছে দুরূহ কুহেলি রচনা ক'রে রয়েছে। কবিতাটির একটি শব্দও অভিধান থেকে কষ্টোপার্জিত নয়, তবু এত কঠিন কবিতা সম্ভবত তিনি এর আগে রচনা করেননি।

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে অথবা ঈষৎ পূর্বে উচ্চারিত কোনো কবির উক্তিটি পাঠকের চৈতন্যে একটি স্থায়ী আলোড়ন তোলে, সেই উচ্চারণ কবির সমগ্র রচনাবলীর উপর উদ্ভাসিত একটি ভাষ্যরশ্মি বিকীর্ণ করে। আমরা শুনতে পাই, মৃত্যুর আগে একটি অনুপলের ভিতর মানুষের সমস্ত স্মৃতি সংগৃহীত হয়। এই ধারণার ভিত্তি পরীক্ষা না ক'রেও এটুকু বলা চলে, বিবেকী কবিমাত্রই তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তের মতো আসন্ন মৃত্যুমুহূর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাঁর বাণী সেই দায়িত্ব বহন করে। সেই মুহূর্ত তাঁর মূল্যায়নেরও যে কবি স্পষ্টভাষী, প্রবৃত্তি যাঁকে কথা বলায়, তাঁর কবিতায় তখন স্বভাবতই তেমন কোন অপ্রত্যাশিত চমক আমরা আশা করি না, কেননা, সারাজীবনই তিনি আমাদের তাঁর নতুন নতুন আবেগের অংশীদার হতে দিয়েছেন, তাঁর কবিতার ভিতরে কবিসত্তার অনাবিষ্কৃত অংশ ঐ ধারাবাহিক বিবরণীর মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে এত স্বচ্ছ হয়ে যায় যে তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি আমাদের যতই স্পন্দিত করুক, নতুন ক'রে ভাবায় না। মায়াকভস্কি এই ধরণের কবি, যার মৃত্যুকালীন উচ্চারণ :

ওদের মতন বললে শোনায়
'ঘটনা এখানে শেষ'
প্রেমের তরণী ভেঙেচুরে খান খান।
আমি তো জীবনছুট।
দরকার নেই তালিকা করার
পরস্পরের দুঃখ
সন্তাপ
অভিযোগ।
শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং চিরবিদায়।

এই পংক্তিগুলি নাটকীয়তায় দ্যুতিময়। কিন্তু এইতো আমাদের চিরপরিচিত মায়াকভস্কি, আজীবন আমাদের যিনি তাঁর নিজস্ব জয়পরাজয় দেখতে দিয়েছেন, নৈরাজ্যের রক্তাক্ত সময় অভিনয় ক'রে দেখিয়েছেন। এইসব পংক্তি তাই তাঁর কোনো নতুনতর চরিত্র আমাদের কাছে নিয়ে আসে না, দুর্ভাবিত করে না আমাদের। কিন্তু আরেক ধরনের কবি আছেন, যাঁরা আত্মসচেতন, কবিতায় অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম অংশ লিপিবদ্ধ ক'রেও যাঁরা কবিতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকেন। এঁদের যেটুকু আমাদের চোখে পড়ে তা নির্মীয়মাণ নয়, শিল্প-সমাপ্ত, অমীমাংসিত নয়, সুচিন্তিত। এই ধরণের কবি পোল ভালেরি। এঁর শেষ একটি উক্তি, শোনা যায়,'প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই আমি লক্ষ করছি না'। বলা বাহুল্য এই কথা শোনা মাত্রই আমাদের অনুসন্ধান অনবসর হয়ে ওঠে, এই প্রাচীর কিসের প্রাচীর, সেই প্রশ্নে আমরা জর্জরিত হতে থাকি।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ভালেরির কোনো কোনো রচনা অভিনেবেশ নিয়ে পাঠ করেছিলেন, তবু ভালেরির সঙ্গে তাঁর তুলনা প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রসঙ্গত শুধু এটুকুই অনুমোদনযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবও অনেকটা যেন ভালেরিরই মতো, স্বচ্ছতার সাধক হয়েও সংবৃতিপরায়ণ। তাঁর ভাষা একটি অর্জিত, প্রাপ্ত স্ফটিকখণ্ডকে ব্যক্ত করে, অমিশ্র মনোবৃত্তির পরিশ্রম-লাঞ্ছিত প্রক্রিয়াকে কখনো নয়। দ্বিতীয়ত, নিজেকে প্রগাঢ়ভাবে উদ্‌ঘাটন ক'রেও শিল্পকর্মের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া তাঁরো অভিপ্রেত। তাই তাঁর কোনো গান বা কবিতার ভিতর থেকে আমরা আমাদের জীবনের তাপ সংগ্রহ ক'রে নিয়েও সেই কবিতার মধ্যে বাস করতে পারি না, চিরায়ত আভিজাত্যে সুদূর ও গরীয়ান সেই ছন্দোময় হর্ম্য আমাদের নন্দনসম্বিৎ জাগিয়েও আমাদের স্বেদাক্ত প্রাত্যহিক সমতল থেকে ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই কারণে তাঁর কবিতার মধ্য থেকে তার জীবসত্তা সনাক্ত করার মানবিক আগ্রহ আমাদের থেকেই যায়। এই আগ্রহ যতই মারাত্মক আকার গ্রহণ করুক না কেন, তার উৎপত্তি সমর্থনযোগ্য। যদি সেই জীবনস্বভাব কোনো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বেরিয়ে আসে তবে সমালোচকের পক্ষে জানবার সুবিধা হয় কী উপাদান নিয়ে কবি কাজ করতে নেমেছিলেন, কী ছিলো তার একান্ত মানবিক ধাতুরূপ যাকে তিনি শিল্পরূপে পরিণত করেছিলেন? বাবলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বে আছে, এক প্রবল যুদ্ধের শেষে ড্র্যাগনকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো: তার ঊর্ধ্বভাগ গিয়ে পড়লো স্বর্গে নিম্নভাগ মাটির পৃথিবীতে; ঊর্ধ্বাংশে অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ঈশ্বরের স্থিতি

আর তার অধোভাগ হলো চতুর্দিকে বিস্তারিত আকারশূন্য কর্দমাক্ত মাটি যার প্রতিশব্দ tohu wabohu। শেষোক্ত এই উপাদানকে ঈশ্বর কি করে শিল্পীর মতো ছাড়িয়ে গেলেন, কি ভাবে তিনি সৃষ্টির উপকরণের ঊর্ধ্বে নিজকে দিনের পর দিনের পরিশ্রমে স্থাপন করলেন, সেই নিয়েই ঐ পুরাণের পরবর্তী পরিণতি। রবীন্দ্র-পুরাণেও কি পাওয়া যাবে না সেই সামগ্রিক ড্র্যাগনের দ্বিধাবিভক্ত বাস্তব অবয়বসংস্থানের সূত্র যা মৃন্ময়তাকেও স্বীকৃতি জানাতে পারে ?

এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম্ ও শেষ পর্যায়ের কবিতা পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁর কবিতা যখন অচলিত নামাঙ্কুর সংরক্ষিত, সংরুদ্ধ পরিধি থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে, সেই পর্বের কবিতায় এমন একটি অনিশ্চিতি দেখা যায় যা, তাঁর নিজেরি ভাষায়, 'ঢেউওয়ালা জলের প্রতি-বিম্বের মতো আঁকাবাঁকা' যার 'পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ ব'কে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ বারংবার আক্ষেপ করেছেন, এই পর্বের কবিতা রূপের স্পর্শ পায়নি। একথা বললে অন্যায় হয় না, রবীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্বে ভাবের চেয়ে রূপকে অনেক নির্মল ব'লে মনে করেছেন, কেননা ভাব খনিজ বহুবিসর্পী, অপরিশুদ্ধ উপাদান এবং রূপ তার সর্বতোভদ্র নিয়ন্তা, তার পরিচ্ছন্ন সুশাসক। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের চির-রোমান্টিক প্রবণতার ভিতর একটি ক্লাসিক প্রাণপুরুষ নিহিত ছিল। কিন্তু এই ক্লাসিক-মাঙ্গলিক কাব্যাদর্শ যখন তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, সেই মুহূর্তের কবিতায় মানবিক জীবাত্মা তার অভিজ্ঞতার অবাধ্যতা নিয়ে প্রত্যয় হয়েছে। 'ছবি ও গান'-এর এইরকম একটি কবিতা থেকে একটি অংশ :

> চারিদিক কেহ নাই ; একা ভাঙা বাড়ি
> সন্ধেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক।
> নিবিড় আঁধার মুখ বাড়ায়ে রয়েছে
> যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।
> পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে
> থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া।
> ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু-তরু
> হেলিয়া ভিত্তির 'পরে রয়েছে পড়িয়া।
> আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
> তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার।

প্রাঙ্গণে করিয়া মেলা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে
চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার।

('পোড়ো বাড়ি')

এই কবিতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে রচিত আরেকটি কবিতার অংশ :

তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়োবাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি ;
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, দুগ্র্হের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ।

('পোড়োবাড়ি, বীথিকা')

দুটি কবিতার শুধু নামকরণেই নয়, এষণা ও মননের আশ্চর্য সাদৃশ্য। ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে অপসারক সময়ের দ্বন্দ্বে সঞ্জাত মৃত্যুচিন্তনের কবিতা এরা। অমঙ্গলের ভাবানুষঙ্গী চিত্রকল্প ছাড়াও আরেকটি বোধ এই কবিতা দুটিতে লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যমধ্য পর্বের 'ছবি'তে— অনুরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত যোগ করা বিন্দুমাত্র কঠিন নয়—প্রেম ও বিশ্বজগতের যে পারস্পরিক যোগাযোগের বার্তা পরম আস্থার সুরে ব্যক্ত হয়েছে, তার সামান্যতম আভাস তাঁর প্রথম বা শেষ পর্বের ও দুটি কবিতার কোনোটিতেই নেই। অবশ্য এই দুই কবিতার পাশাপাশি একই রচনাকালে প্রণীত, এমন অনেক রচনা পাওয়া সম্ভব যেখানে কবির মনে বিশ্ব ও ব্যক্তির দ্বিধাহীন অভিন্নতা অভিব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু এই দুটি কবিতার সহযোগী এমন কবিতাও অসংখ্য যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও বিশ্বের সমান্তর, ক্ষমাহীন ব্যবধান তীব্র নিখাদে উচ্চারিত। দুই পর্যায়ের কবিতার অন্তর্বর্তীকালে এই ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়েছে কবির সচেতন অথচ উদ্বেল আনন্দময় জীবন-বোধের সাহায্যে।

এই প্রসঙ্গে 'সচেতন' শব্দটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্র-নির্মিত ভূমণ্ডলের অধিকাংশ বাসিন্দা কবির আশ্চর্য কল্পনাশক্তি এবং সচেতনতার সমবায়ে গ'ড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিপুল গগনচুম্বী শৃঙ্গময় পর্বতের

উর্ধ্বগ প্রতিটি স্তর তাঁর নিজেরি সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি। কিন্তু একথা যদি বলি সেই পর্বত নিঃসীম জলরাশি থেকে উঠে গিয়ে সূর্যতারা খচিত আকাশ ছুঁয়ে অন্তিমে আবার নেমে এসে নিঃসীম জলরাশি স্পর্শ করতে চেয়েছে, তবে বোধ হয় রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অপমান করা হবে না। ঐ আরোহণ এবং অবরোহণের মুহূর্তে জলমগ্ন শিলার যেটুকু আমাদের চোখে পড়ে তা মনস্তত্ত্বের পরিভাষা অনুযায়ী অবচেতনার এলাকা। তাঁর কিশোর বয়সের লেখা 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রসঙ্গে মানবমনের অন্ধকার প্রদেশের সঙ্গে কবিতা ও কাব্যরূপের নিগূঢ় সম্বন্ধ তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শেষের দিকের নানান রচনা ও আলোচনায় তিনি অবচেতনার প্রসঙ্গে নানা ইঙ্গিতগর্ভ মন্তব্য করেছেন। দুয়েকটি উদাহরণ এখানে অবান্তর হবে না :

১. ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয়নি··· স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে··· আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানুষের মগ্নচৈতন্যের সক্রিয়তাব উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃদৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই।

—বাংলা ভাষা পরিচয়

২. অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবীযুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম···কেউ যদি বুঝতে না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।
(শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্ররচনাবলি ২৬, পৃ ৬৪৬)

'অসংলগ্নতা' 'স্বতঃসৃষ্টি' ইত্যাদি শব্দ পরা-বাস্তব কবিতার উপাসকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে, কেননা Andre Breton-র 'Pure Psychic automatism—the absence of all control exercised by reason' প্রভৃতি উক্তি পরা-বাস্তব কবিতার সংজ্ঞা হিসেবে আদৃত। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্টতার কোনো বিশদ বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। তাছাড়া উপাদানের সঙ্গে শিল্পকর্মের অন্তঃশীল সূত্র আবিষ্কার করার আগ্রহে আমাদের

সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কেননা স্বয়ং ফ্রয়েডও স্তেফান ৎজ়াইগকে চিঠিতে বলেছেন,

> from a critical point of view, one might still say, that Art by its definition would refuse enlarging its scope so widely, unless the quantitative relation of unconscious material and pre-conscious elaboration should be kept with certain limits.

রবীন্দ্রশিল্পে ফ্রয়েডীয় দমিত আকাঙ্ক্ষার সন্ধান সুতরাং নিরর্থ, নিষ্ফল। বরং ইয়ুং-এর কোনো-কোনো চিন্তা আমাদের এই প্রসঙ্গে সাহায্য করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধানতম সমস্যা ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে ইয়ুং-এর বক্তব্য ফ্রয়েডের চেয়ে দূরস্পর্শী। কিন্তু তার বিশেষ কবিতায় ইয়ুংপ্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে অন্ত্যপর্বের রবীন্দ্রকবিতা-ধারার কয়েকটি লক্ষণ স্মরণযোগ্য। প্রথমত 'পরিশেষ' থেকে তাঁর কবিতায় পুনর্বিবেচনার প্রবর্তনা লক্ষণীয়। পুনর্বিবেচনা বলতে পূর্ববিশ্বাসের উত্তরাধিকার বজায় রাখবার আগ্রহ বোঝাচ্ছে। 'বিস্ময়' 'মৃত্যুঞ্জয়' কি 'পয়লা আশ্বিন' প্রভৃতি কবিতায় এই আগ্রহ শিল্পের সিদ্ধি পেয়েছে। এইসব কবিতার 'পাশাপাশি' আগমন কবিতা আমাদের চোখে পড়ে যেখানে কবি তাঁর অভ্যস্ত বিশ্বাস উচ্চারণের ব্রতে প্রথানুগতরূপে সজাগ, এবং সে-সব ক্ষেত্রে বিশ্বাস ফুটে উঠতে চেয়েছে ক্লান্তির ও অবসাদের পটে। দ্বিতীয়ত, এক ধরণের প্রেমের কবিতায় অকৃতার্থ ব্যক্তির বাসনাব্যঞ্জক পৌরুষ ঘোষণা। 'ব্যর্থ মিলন' কবিতাটির 'যদি কভু হয়/তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়। না-ও যদি ঘটে তবে আশা চঞ্চলতা/দাহিয়া হইবে শান্ত। সে-ও সফলতা' প্রভৃতি পংক্তিতে ব্যঞ্জিত বাসনায় যেন শুধুমাত্র পরিবেশনিরপেক্ষ প্রেমের প্রতি মূল্যবোধ স্থাপনের অভীপ্সা। এর মধ্যে রোগশয্যায়-এর ৩৯ সংখ্যক কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে আরো একটি বিদারক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে: প্রেমিকা এখানে নিখিল ভুবন বা বিশ্বপরিবেশের চেয়ে অনেক বড়ো ও অনেক কাঙ্ক্ষিতা হয়ে বিরাজিত! 'দেখি তুমি নতশিরে বুনিছ পশম/বসি মোর পাশে/সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি'-এর তিনটি চরণের প্রকৃত তাৎপর্য নিঃসন্দেহে এই যে ঐ রমণীয় সান্নিধ্যের উপরেই সৃষ্টি বা পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ও পূর্বতন কাব্যধারায় নারী সমগ্র বিশ্ব ব্যাপারে একটি আপেক্ষিক অংশ মাত্র, পরবর্তী পর্যায়ের প্রেমের কবিতায় সেই নায়িকা মানুষের আপেক্ষিক অবস্থানের নিয়তি, জীবনানন্দের ভাষায় সুরঞ্জনা, যিনি 'ঈশ্বরের

পরিবর্তে অন্য এক সাধনার ফল'। তৃতীয়ত, শিল্পের সম্মোহিত করবার ক্ষমতায় আস্থাসম্পন্ন এক ধরণের কবিতা আমরা পাচ্ছি যা ঠিক বলাকার 'তাই তব শঙ্কিত হৃদয়/চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ/সৌন্দর্যে ভুলায়ে' এই মীমাংসায় মসৃণ নয়। বীথিকার 'নাট্যশেষ' কবিতার 'সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্য লতায়/ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়। /সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে/অন্ধকার ভিত্তিপটে, ঐক্য তার বিশ্ব-শিল্প সাথে' প্রভৃতি পংক্তিতে শিল্পের সঙ্গে জীবনের নয়, মৃত্যুর যোগ প্রকাশিত হয়েছে। যেন যা কালের কবলগ্রস্ত তার উপরেই শিল্পের কর্ম। এবং বিশ্ব-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবার অভিপ্রায় যতোই প্রকট হোক শিল্প মানুষের নিরুপায় একটি বিকল্প মাত্র, এই বোধ এখানে মুদ্রিত।

এই লক্ষণগুলি ছাড়াও বাইরের দিক থেকেও যে ক্রান্তিসূচক সূত্র তাঁর অন্তিম কবিতাগুচ্ছে দেখা যাচ্ছে তা হলো কবিতার নামহীনতা। রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র ছবিরই নাম রেখেছিলেন। গানগুলির নামকরণের প্রশ্ন তো ওঠেই না। কিন্তু এমন কী ক'রে হলো যে 'প্রান্তিক' থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রচিত বিরাট একটি অংশের কবিতার নামকরণে তিনি উদাসীন হলেন? রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ কবিতাই নামার্পিত এবং সেই সঙ্গে, স্বভাবতই, পরস্পরের থেকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। নাম দিয়ে ব্যক্তি ও বিষয়কে আমরা চিনে নেই, পরস্পরের থেকে আলাদা ক'রে দেখি। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধের কবিতার প্রায় প্রতিটিই অনন্য—'যেতে নাহি দিব' ও 'বসুন্ধরা' 'অনাবশ্যক' ও 'শুভক্ষণ'— এরা শুধু পাঠকের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, নিজ নিজ দূরত্বে স্থিত। কিন্তু শেষের দিকের কবিতা— যে-সব ক্ষেত্রে নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে সে-সব স্থলেও— পাঠকের স্মৃতিতে একাকার। যেন একটি কবিতা থেকে অপরটিকে ভিন্ন করবার ইচ্ছা কবিরও নেই। মহুয়ার 'নাম্নী' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি প্রমাণ করলেন যে স্বতন্ত্র সত্তার স্বতন্ত্র নামকরণে তিনি উন্মুখ ও সার্থক, কিন্তু তা যেন পাঠকের কাছে জানিয়ে রাখা যে নামহীনেরও সত্তা আছে, নাম আছে এবং তাই তিনি নামকরণে ক্রমশই নিস্পৃহ হয়ে পড়লেন। ফলে পাঠকের দিক থেকে একটি অসুবিধে এই যে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতা একসঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়, কিন্তু সুবিধেও এই যে পরস্পরস্পর্শী এই কবিতাগুলির ঘনিষ্ঠ বসতি থেকে মূল প্রবণতা খুঁজে বের করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয়ে আসে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের নামহীন এই কবিতাগুলির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য একটি অন্তর্বয়ন রয়েছে, একটি কবিতা থেকে

আরেকটিকে ছিঁড়ে নেওয়া কঠিন। এক ঝোঁকের কবিতাগুলি তাই একই সঙ্গে, অনতিব্যবধানে, পড়তে হবে, যতোক্ষণ কবির গূঢ়ৈষণা আমাদের আয়ত্তে না আসে। এই প্রস্তুতি নিয়ে যদি 'শেষ লেখা'র শেষ তিনটি কবিতা পড়ি তবে কবির অবচেতন এষণাকে হয়তো অনুমান করতে পারব। ২৭ থেকে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে রচিত এই তিনটি কবিতার বিষয় ব্যক্তিসত্তার আত্মসন্ধিৎসা এবং বৃহতের সঙ্গে অভিযোজন রহস্য। এই সম্বন্ধে ইয়ুং Weltanschuung শব্দটির ব্যাখ্যা স্মরণীয়। শব্দটির অর্থ বিশ্ব সম্পর্কে ব্যক্তির জটিল attitude বা মনোভঙ্গি যা সজ্ঞান ধ্যান ধারণায় আত্মস্থ হয়েছে। ইয়ুং-এর প্রাসঙ্গিক চিন্তার অংশ বিশেষ এখানে অনূদিত হলো :

> বিশ্ব সম্পর্কে আমরা মনে-মনে যে-ধারণা এঁকে তুলি তাকেই আমরা বিশ্ব বলি। আর সেই অনুযায়ী আমরা নিজেদের সাজিয়ে নিই, পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে তুলি। এটি সবসময় সচেতন ভাবে ঘটে না। প্রায়ই পরিবর্তমান মুহূর্তের নানা বিক্ষেপকারী সমস্যা থেকে সজোরে মনকে সরিয়ে এনে একটি মনোভঙ্গির অভিমুখে চালিত ক'রে দিতে হয়।…Weltanschauung থাকার অর্থ বিশ্ব ও নিজের সম্পর্কে একটি চিত্র রচনা, বিশ্ব কী এবং আমি কে সে বিষয় জানা। আক্ষরিক অর্থে এ যেন অসম্ভব শোনায়। কেউ জানতে পারে না বিশ্ব কী, আর নিজেকেই বা কতোটুকু সে জানবে? তবু এই দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান যা প্রজ্ঞাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত আর নীতিবাগীশের মতামত সমান অগ্রাহ্য করে। এই প্রজ্ঞান খোঁজে শুধু ভিত্তিসহ অনুমানকে, এবং এটাও ভোলে না যে জ্ঞান ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ, ত্রুটিসাপেক্ষ।
>
> বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার ছবি যদি আমাদের উপর না বর্তাতো তবে আমরা যে-কোনো সুন্দর বা বিভ্রান্তিকর অসত্য নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতাম। কিন্তু এ-রকম আত্মপ্রতারণা আমাদের শুধু অবাস্তব, নির্বোধ ও নিষ্ফল ক'রে তোলে। যেহেতু আমরা বিশ্ব সম্পর্কে নিজেদের একটা প্রতিভাসিক প্রতিবিম্ব দিয়ে ভোলাতে চাই। আমরা বস্তুবিশ্বের প্রচণ্ড ক্ষমতার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ি। এভাবেই আমরা অভিজ্ঞতার কাছ থেকে শিখি যে সুচিন্তিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি (weltanschauung) থাকা আমাদের পক্ষে কতো আবশ্যক। weltanschauung বিশ্বাস নয়, hypothesis বা অনুমিতি। বিশ্ব তার মুখচ্ছন্দ পালটাচ্ছে, বিশ্বকে আমরা আমাদের মানস

চিত্রকল্পেই ধারণা করি এবং এটা সব সময় নিরূপণ ক'রে ওঠা কঠিন কখন সেই ছবিটা বদ্‌লাচ্ছে, বিশ্ব বা আমাদের কোন্ দিকে বদল হয়েছে, নাকি উভয়তই ব্যাপারটা ঘটেছে। বিশ্ব সম্পর্কে চিত্রটি যে-কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন আমাদের নিজের সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন স্বাভাবিক। প্রতিটি নতুন আবিষ্কার, নতুন চিন্তা, বিশ্বের উপর একটি নতুন প্রচ্ছদ আনতে পারে। এর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এ-জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, নতুবা অকস্মাৎ আমরা নিজেদের এক প্রত্ন-পরিত্যক্ত পৃথিবীতে দেখতে পাবো, যা চৈতন্যের নিম্নশায়ী স্তরগুলির অবশেষ। আমরা একদিন মৃতকল্প হয়ে যাবো, কিন্তু জীবনের স্বার্থে সেই মুহূর্তকে আমরা যেন যতোদিন পারি স্থগিত রাখি। আর তা তবেই সম্ভব যদি বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার চিত্রটি অপরিবর্তনীয় না হয়। প্রত্যেক নতুন চিন্তা weltans-chauung-এ কতোদূর যোগ করছে, তা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। (Analyticsh Psychologie und Weltanschauung)

রবীন্দ্রনাথ কি বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর অনুশীলিত ধারণাকে ঈষৎ শিথিল ক'রে দিয়েছিলেন? সোনার তরীতে 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের' এই কথা যিনি বলেছিলেন তিনিই পত্রপুটে বলেছেন: 'শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে/ তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে/আজ রেখে যাবো আমার ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত প্রণতি'। ইতিমধ্যে সেই কবি কোথায় হারিয়ে গেলেন যিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'আকাশে দুই-হাতে বিলায় প্রেম ওকে?' তাহলে এটাই কি ধ'রে নেওয়া সমীচীন যে তাঁর কবিতায় এমন একজন প্রেমিক জেগে উঠেছেন যিনি প্রেমিকার চেয়েও অনেক বড়ো, প্রেমিকার প্রদত্ত অনিশ্চিত প্রেমের চেয়ে মহত্তর যাঁর নিরভিযোগ ভূমিকা? ইয়ুং Weltanschauung-এর যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তদনুরূপ একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি আমৃত্যু অবলম্বন করে-ছিলেন, এমন-কি পৃথিবী যখন তাঁকে প্রতারণা করেছে তখনো? এই প্রশ্নের ভিতরেই সম্ভাব্য উত্তর নিহিত আছে। প্রেমিকা বা পৃথিবীর দুঃখ দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম, এই কথা মেনে নিয়েও যদি একটি অপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যায়, তাই ছিল সম্ভবত কবির অভিপ্রায়।

শেষ তিনটি কবিতায় একাধিকবার ব্যবহৃত শব্দের কোনো-কোনটি থেকে একটি হদিশ পাওয়া অসম্ভব নয়। 'ছলনা' পাঁচবার, আর 'প্রশ্ন' 'আঁধার' 'দুঃখ' 'রাত্রি' 'মিথ্যা' ও 'আপন', শব্দগুলি দুবার ক'রে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ

শব্দই নেতি-র দিকে উন্মুখ। তিনবার প্রয়োগ-করা শব্দটির বিশেষণও একবার 'মিথ্যা' অন্যবার 'সহজ'। মিথ্যা বিশ্বাস কি illusion এবং সহজ বিশ্বাস বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিশব্দ? ১৩ সংখ্যক কবিতাটিতে সত্তাকে ঘিরে নিরুত্তর কাল, পরের কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে ভয়ই হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র, মৃত্যুই শিল্প এবং সত্তা সেই দুঃখের আবেদনকে মেনে নিয়েও অবিচলিত। মনে রাখা প্রয়োজন কবিতাটি তাঁর অবচেতনা থেকেই প্রদত্ত শ্রুতিলিখন যা তিনি অতঃপর সংশোধনের সুযোগ পাননি। এই কবিতায় তাই স্ববিরোধী উক্তির প্রাচুর্য। তবু আগের দুটি কবিতা থেকে সূত্র নিয়ে এর এটুকু অর্থ করা কঠিন নয় যে সত্তার পক্ষে একটি চৈতন্য উদ্দীপিত রাখাই শ্রেয়; কেননা ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত সমস্ত উপকরণই তার বিরুদ্ধে উদ্যত হলেও সেই সব বিরুদ্ধতাকে সে নিজ মহিমায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে ছলনাময়ীর হাত থেকে বরমাল্য পাচ্ছে। এই ছলনাময়ীর কণ্ঠে কবি যে বিরোধাভাস-খচিত অলংকার পরিয়েছেন তা থেকে তাঁর মৌলিক পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু প্রথমেই সাংখ্যের পরমা প্রকৃতির সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখার প্রলোভন জাগে। বিশেষত গীতার 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি / বিকারাং গুণাশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ / কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে / পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে' শ্লোক দুটি মনে প'ড়ে যায়। প্রকৃতির সমস্ত সম্মোহসূচক কার্যকলাপ পুরুষ ভোগ করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ অধ্যায়ে এ-কথা বলার প্রায় অব্যবহিত পরেই পুরুষের অপর একটি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে যে, যুক্ত অথচ মুক্ত এক পুরুষ দেহের ভিতরে বাস করেন যিনি 'উপদ্রষ্টা' অর্থাৎ সাক্ষী এবং 'অনুমন্তা' অর্থাৎ প্রকৃতির অনুমোদন-কারী। 'বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু / এই নিয়ে তাহার গৌরব'— একি সেই পুরুষ নয় যে প্রকৃতির আয়োজিত মোহন যোগসাজসে জড়িত হয়েও বিবিক্ত, অংশ গ্রহণ ক'রেও সাক্ষী, এবং তার উন্নত অবস্থান থেকে প্রকৃতির প্রতি প্রসন্ন? ১২ সংখ্যক কবিতাতে এই আনন্দিত, অনুমোদনকারী সাক্ষীর কথাটি বলা হয়েছে: 'তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন / বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের / নির্মল আকাশে।' আরেকটু তলিয়ে দেখলেই মনে হবে, প্রকৃতির পরিবেষিত সুন্দর ও নিষ্ঠুর বিচিত্র বিচিত্র আয়োজন সবি পরীক্ষা ক'রে তার শিল্পের দিকটির সপ্রশংসা অনুমোদন করতে হবে, তার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত ব্যবহারে এতোটুকু মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। 'বিচিত্র' শব্দটি ১২ ও ১৫ সংখ্যক দুটি কবিতাতেই ব্যবহৃত— প্রথমটিতে জন্মদিনের অভিনন্দন-জানানো পরীক্ষামূলক

চক্রান্তের বিশেষণ হিসেবে। কখনো সে মধুর, কখনো মারাত্মক। এমন-কি প্রথমোক্ত কবিতাটিতে দেখতে পাই প্রকৃতি যে পুরুষকেই শুধু পরীক্ষা করে তা নয়, নিজেও করে : 'প্রকৃতি পরীক্ষা ক'রে দেখে / ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে সুযোগ'। শেষ কবিতাটিতে 'আপন ভাণ্ডার' ব্যবহার ফিরে এসেছে : 'কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে / শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে / আপন ভাণ্ডারে' এই 'সে' বলা-ই বাহুল্য, পুরুষ বা চৈতন্য। দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি পুরুষকে তার নিজস্ব ভাণ্ডার অর্পণ করছে, তার ফলে 'দাতা আর গ্রহীতার যে-সংগম লাগি বিধাতার নিত্যই আগ্রহ' তা চরিতার্থ হচ্ছে। ছলনাময়ী কবি পুরুষ বা উপযুক্ত গ্রহীতাকেই সমস্ত মহার্ঘ দিয়ে দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৈতন্য তার স্বয়ংস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সুষুপ্তির মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে, সে ফিরে আসে এক ধরণের স্বায়ত্তশাসনে, স্বাবলম্বিতায়। এখানেই আর সাংখ্যের জোর খাটে না, বেদান্তের কাছে ফিরতে হয়। বেদান্তের 'স্বাপ্যয়াৎ' এই নবম সূত্রটির তাৎপর্য যে-পুরুষ সুষুপ্তি মুহূর্তে আত্মায় লীন হয়ে যান এবং তখন তাঁর উপর প্রকৃতি কোনো কাজ করতে পারে না, তিনি চৈতন্য-স্বরূপ লাভ করেন। এই অর্থে শেষ কবিতাটি প্রকৃতি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত চৈতন্যের কবিতা, সুষুপ্তিতে আত্মস্থ পুরুষকারের কবিতা। যে-পুরুষকার নিজের নিয়তিকে নিজেই আকার দিচ্ছে, তার তো গৃহীত পরাভব ব'লে কিছু থাকতে পারে না, চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্বপ্রতিষ্ঠ পৌরুষের অহমিকা সে প্রকাশ করে—কবিতাটির তাৎপর্য এই। সমস্ত কবিতাটির নিহিতার্থ : প্রকৃতি (নিয়তি, বিশ্ব প্রভৃতি) তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বাঁকে সুকৌশলে পৌরুষনাশী ছলাকলার জাল বিছিয়ে রেখেছেন। সরলচেতা পুরুষকেও সে বিপর্যস্ত করতে চায় মায়াবী মুখোশ প'রে। কিন্তু সরলচেতা পুরুষ সেই অন্ধকারের পটেই নিজের মহত্ত্বকেই স্পষ্ট ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন তার ব্যক্তিগত সাধ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে। ছলনাময়ী বা প্রকৃতি তাঁকে যে আলোক বা পথ-নির্দেশ দিচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে তা আসলে কবির নিজের কাছ থেকেই পাওয়া, এবং নিজের সেই ঋজু বিশ্বাসের কিরণ দিয়ে বিশ্বের জ্যোতিষ্ককে সে চিরদিনের উজ্জ্বলতা দিচ্ছে, এই দিক থেকে সে উত্তমর্ণ অধমর্ণ নয়। বহির্জীবনে বা বাহিরের জগতে তার গতিপ্রকৃতির অপ-ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু সে তার নিজের কাছে বিবেকী, সৎ। পৃথিবীর মানুষ তাকে বলে সে তার প্রাপ্যমূল্য পেল না, সে ট্র্যাজেডির চরিত্র বা বঞ্চিত, কিন্তু সে তো জানে ঘটনা, দৈব দুর্ঘটনা বা পরিণামী ঘটনায় সত্য নেই, শেষ সত্য নির্ভর

করে সংক্রান্ত (affected) ব্যক্তিচরিত্রের নিজের উপরে, আর সে-ই তো সমস্ত ট্র্যাজিক বহির্ঘটনা বিশ্বকে তার নিজের একটি সতর্ক অথচ সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করছে। সর্বশেষ পুরস্কার তারি করতলগত হয়, তার অসীম ধৈর্য দিয়ে সেই পুরস্কার সে অর্জন করে। হয়ত প্রথম সহজলভ্য রম্য তরল উপঢৌকন সে পায় না, কিন্তু দৃঢ়তা তাকে গভীরতর পুরস্কারে সম্মানিত করে। অতএব যে নিয়তির সমস্ত চাতুরী নিরভিযোগ ভঙ্গিতে উপেক্ষা করতে শিখেছে, সে নিয়তির হাত থেকে শাস্তির ছাড়পত্র পায়। এই নিয়তি, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, সাংখ্য বা বেদান্তের প্রভাবস্পৃষ্ট নয়। এই নিয়তি বা ছলনাময়ী কবির ঈশ্বরী যিনি দিতি ও অদিতির যুগ্ম-প্রতিমা, কবি প্রকৃতপক্ষে তাঁরি স্বোপার্জিত পুরস্কার দেওয়ার অধিকারিণী ব'লে সাব্যস্ত করেছেন। এই দাত্রী সুতরাং নতুন কিছু দিচ্ছেন না, কবির মৌলিক ঐশ্বর্য তাঁকে প্রত্যর্পণ করছেন। কবি চিরদিনই নারীর হাত থেকে উষ্ণীষ নিয়েছেন এবং শেষ মুহূর্তে ও তার ব্যতিক্রম স্থাপন করলেন না তিনি, এখানেই তাঁর জন্মার্জিত সৌজন্য আবার প্রমাণিত হলো। নিজের কৃতিত্ব পরমাশক্তির উপর আরোপ করলেন, আরো মহৎ হয়ে উঠলেন যেন। নিজের নির্বাচিত প্রেরণাশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ইএট্স যেমন অসামান্য হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও। তফাৎ, রবীন্দ্রনাথ ইএট্সের মতো আত্মপুরাণকে কোথাও স্পষ্ট ক'রে জানতে দিলেন না আমাদের, নিজের উপরে একটি মায়াবী আবরণ টেনে দিলেন।

রোমাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বীজমন্ত্রের মতো বলেছেন, 'He recoiled from everything that stood for 'No'.' এ-কথার অর্থ কি এই নয় যে না-র পুঞ্জীভূত শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, কিন্তু তার কাছ থেকে প্রত্যর্পিত হয়ে একটি অস্তিসূচক দৃষ্টিকোণে ফিরে এসেছেন! শ্যামলীর 'আমি' কবিতাটি আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে অকপট বিবৃতি :

> অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা / মানুষের সীমানায় / তাকেই বলি 'আমি' / সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম / দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস / 'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে / রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতাতেও 'না' হয়ে উঠেছে 'হাঁ', ঊষর গহ্বর সেই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা হয়ে উঠেছে উর্বরা মাটি, অবিশ্বাস সাজানোর গুণে বিশ্বাস হয়ে উঠেছে। আর তাঁর কবিতার তত্ত্ব সম্পর্কেও এই একটি নতুন আবিষ্কার

এখানে উন্মোচিত হয়েছে যে আলো আর অন্ধকার, চৈতন্য আর অচেতনার সংগমেই শুদ্ধ কবিতার জন্ম। এই রহস্যের বোধ না থাকলে তাঁর এ-কবিতাটি 'Crossing the Bar'-এর মতো একটি মনোমুগ্ধকর ভক্তিরসের কবিতা হয়েই থাকতো, আমাদের বিবেকী অস্তিত্বকে এমন ক'রে বিদ্ধ করতো না।

উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ

'উপন্যাস লেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন'— সীতারাম উপন্যাসের এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন। অন্তর্বিষয় বলতে এখানে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন, তার অনুসন্ধানে পাঠককে বেশিদূর যেতে হয় না। ঐ শব্দে তিনি যে একটি নিটোল সারগর্ভ কথাবস্তুকেই বুঝেছিলেন, সে-কথা অন্যত্র তাঁরই প্রদত্ত একটি স্বীকৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে :

> The novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea.[১]

তত্ত্বগত সারমর্মের বশবর্তী ক'রে আনতে গিয়ে ঘটনা ও চরিত্রের যে শিল্পগত লাঞ্ছনা ঘটে, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরও অবিদিত ছিল না। তাই তাঁর জীবনে এমন এক সময় এল, যখন তিনি উপন্যাস রচনায় বীতরাগ হলেন এবং সেই অস্বস্তিকর সাহিত্যবাহন ত্যাগ ক'রে সোজাসুজি তত্ত্বকথনে মনোনিবেশ করলেন।

উপরের অনুচ্ছেদের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র আঁকতে পারেননি। তাঁর আঁকা মানব-মানবীর প্রদর্শনী থেকে অনেককেই আমরা মনে রেখেছি, মর্যাদা জ্ঞাপন করেছি। সেইসব চরিত্র যে আমাদের স্মৃতিধার্য, তার কারণ তাদের শিল্পী-জনকের তুলির টানের বলিষ্ঠতা। প্রতাপের মতো পুরোবর্তী নায়ক কিংবা চাঁদ শাহ ফকিরের মতো প্রচ্ছন্ন পার্শ্বচরিত্র— দ্রঢ়িষ্ঠ তুলির আঁচড়ে প্রতিটি আলেখ্যই স্পষ্ট। এবং স্পষ্টতা যেমন তাদের চিত্র-লক্ষণ, স্পষ্টতাই আবার তাদের চরিত্রের সীমা। অর্থাৎ, রচয়িতার অভিভাবকোচিত সচেতন নিয়ন্ত্রণে প্রায়শই তারা সংযত, অংশত উন্মোচিত এবং অকালেই নিজ নিজ জীবনবোধে উপনীত। ই. এম. ফর্স্টারের বিভাজিত প্রবাদপ্রতিম সেই চরিত্রবিভাগের কথা মনে এনে বলছি, বঙ্কিমচন্দ্র সরল স্বভাবের (flat character) মানুষই এঁকেছেন, জটিল প্রকৃতির (round character)

---

১ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি, *Bengal : Past and Present*, April-June, 1914, p. 275। শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের *A Critical Study of the Life and Works of Bankimchandra* গ্রন্থে পত্রটি উদ্‌ধৃত আছে।

চরিত্রস্জন তাঁর প্রবণতা ও কৃতিত্বের বহির্ভূত ছিল। তিনি হলেন বাংলা সাহিত্যের ভিক্টোরীয় পর্বের লেখক, যিনি সতীর্থবৃন্দের মতোই চরিত্র অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্দিষ্ট ক'রে ফেলেন, তার দু-একটি প্রধান বৃত্তির মধ্যে তাকে বিধৃত ক'রে দেন। আর যিনি 'মিড্-ভিক্টোরিয়ান' ব'লে আত্মবিদ্রূপে বিদ্ধ হয়েছিলেন, যাঁকে পথের প্রান্তে এসেও বলতে হয়েছিল, 'বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন, আমার বাস সেই যুগেই', সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য ক'রেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জটিল চরিত্রের জন্য দরজা খুলে দিলেন :

> বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল— বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।[২]

চোখের বালির রচনাবলী সংস্করণের সূচনায় এই কালান্তরের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন :

> আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে-রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। · ঠিক করতে হলো এবারকার গল্প বানাতে হবে এ-যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হতো এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে।···সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ ক'রে তাদের আঁতের কথা বের ক'রে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

লক্ষ্য করতে হবে তাদের আঁতের কথা বলতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রসমূহের অন্তরের কথা বা অন্তর্দ্বন্দ্বই মনে করেছেন। ঘটনার ধারাবিবরণী অথবা ভাষ্য-জ্ঞাপনস্পৃহা ত্যাগ ক'রে ব্যক্তিচরিত্রের কাছে এই প্রত্যাবর্তনের দিক থেকে তিনি যুদ্ধোত্তর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে একপরিবারভুক্ত।

ঐতিহাসিক তথ্যক্রমের খাতিরে স্বীকার করতে হবে, বউঠাকুরাণীর হাট আর রাজর্ষির লেখক বঙ্কিমের অনুগামী। কিন্তু যাঁরা বঙ্কিমের প্রভাবেই উক্ত

২ চোখের বালি। রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮।

ছুটি গ্রন্থকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেখেন, সবিনয়ে তাঁদের কাছে দু-একটি প্রশ্ন নিবেদন করি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনায়াসসাধিত রোমান্সের রক্তিমা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কোথায়? কাহিনীবিন্যাসে রোমান্সের যে-উৎকণ্ঠা এই গ্রন্থ দুটিতে স্পন্দমান, পরিণামী শান্ত রসের চাহিদায় তা কি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেই অগ্রসর হয়নি? বউঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসে প্রকৃতি একটি প্রধান চরিত্র। অন্তত গীতাঞ্জলির যুগ পর্যন্ত সর্বাতিশায়ী এবং সর্বময়ী অর্থে প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের পরমা শক্তি, প্রকৃতির মধ্যেই বিরুদ্ধ শক্তি-সংঘর্ষের পর্যবসান ঘটে, তারই মধ্যে অপরাপর চরিত্র তাদের আপেক্ষিক সীমারেখা লুপ্ত ক'রে দেয়। রক্তপিপাসু রাজপ্রাসাদকে পিছনে ফেলে উদয়াদিত্য যখন ভোরের আকাশে তাকালেন, প্রকৃতির প্রভাব সেখানে একমাত্র :

> প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, 'জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।'[৩]

নক্ষত্ররায় যে গোবিন্দমাণিক্যকে হাতের মুঠিতে পেয়েও শীতল শোণিতে হত্যা করতে পারলেন না, তার মূলে প্রকৃতির আদ্যাশক্তির অমোঘ প্রভাব :

> অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁক। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, 'দাঁড়াও।'
>
> নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নিচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে; বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল—সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

৩ বউঠাকুরাণীর হাট। রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫১৪-১৫।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও ?'[৪]

উপরের দুটি উৎকলন আরো একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি। উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথেরও যে-একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, সেটি প্রমাণ করা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট একটি ভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে অধিকাংশ চরিত্র গ'ড়ে তুলেছেন, আর রবীন্দ্ররচিত চরিত্রবর্গ পরিণতির মুখে এসে— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে— 'বৃহৎ একটি ভাবের' কাছে আত্মবিসর্জন করেছে। হয়তো প্রথম পর্বের রচনায় রবীন্দ্রপ্রণীত চরিত্রসমূহের ঐ আত্মসমর্পণ অনেক অপীড়িত, সাবলীল। কিন্তু রচয়িতার পিতৃসুলভ কর্তৃত্ব কখনো তাদের আড়ষ্ট করেনি। তিনি শুধু তাদের জন্য একটি শুভেচ্ছা পোষণ করেছেন, তাদের কারো-কারো বিপথগামিতা নিযে মনে-মনে যে উদ্‌বিগ্ন হননি, এমনও নয়। তৎসত্ত্বেও, তাদের গতিবিধি তিনি রেখাযিত কবেননি। চোখের বালির রচনামুহূর্ত যে ক্রান্তিকারী, এ-কথা আজ আর তথ্যসমেত প্রতিপন্ন করার প্রযোজন নেই। যে-মুহূর্তে চোখের বালি রচিত হয়েছিল, সে-সম্পর্কে পরিচিত তথ্যভূমিটি আবার এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রদোষসন্ধ্যা এবং বিশ শতকের প্রত্যুষপ্রহর যুরোপীয় ভূখণ্ডের মানসে যে-আতঙ্ক সঞ্চার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নিজের জন্য নিরাপদ একটি দূরত্ব নির্বাচন ক'রে নেননি। কোরিযা উপলক্ষে চীন-জাপানের ক্ষতলাঞ্ছিত সন্ধিক্ষণ (এপ্রিল, ১৮৯৫) কিংবা বুঅর-ব্রিটিশ যুদ্ধবৃত্তের অন্ততব উদ্যোগপর্বের (নভেম্বর, ১৮৯৯) আক্ষরিক দর্পণ না হোক, অন্তঃসাক্ষ্য বহন করছে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য। যে-শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘে অস্ত গেল, নৈবেদ্যের একাধিক কবিতায় তার স্নাযব প্রতিক্রিয়া গ্রথিত হযে আছে। একদিকে কবির নিজস্ব চরিত্র, অন্যদিকে পঙ্কস্নাত যুগ, অনিবারণীয ঘটনাচক্র। এ-দুযেব টানাপোড়েনে নৈবেদ্যের কবিতাগুলি আলোড়িত। এবং নৈবেদ্যকালীন রচনা চোখের বালিতে একই দোটানা, একই টানাপোড়েনের অন্য অভিক্ষেপ। সেখানেও চরিত্রের উপরে আঘাত পড়েছে, চরিত্র উৎকেন্দ্রিক হতে চলেছে এবং পরিণামে বাসনা থেকে, বহির্জগৎ থেকে অচঞ্চল জীবনকেন্দ্রে ফিরেছে। নৌকাডুবিতে রবীন্দ্রনাথ ঘটনা-

৪ রাজর্ষি। রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪০১।

ঘনিষ্ঠ আখ্যানের একটি নক্‌শা আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর সমস্ত কাহিনীটিকে অনুধাবন ক'রে ঔপন্যাসিক নিজেই অন্যরকম বলেছেন :

> একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। · ট্রাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ—তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনা-জালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে।[৫]

অধোরেখ অংশটিতে একটু যেন দ্বিধা আছে। প্রকৃতপক্ষে, নৌকাডুবিতে ঘটনা এসে চরিত্রের উপর হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে প্রাপ্য মনোযোগ চেয়েছে এবং অতঃপর শুধু চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রতিমুখী মনোভাবের সংগ্রামই চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে :

> ···যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবন-সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল, তখনি নানা বিরুদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবনগ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া উঠিল।[৬]

রমেশ রবীন্দ্রচরিত্রশালার প্রতিনিধি কোনোমতেই নয়, কিন্তু সে নিশ্চয়ই পাঠকের একটি অন্তরঙ্গ নস্ট্যালজিয়া। রমেশের আকাঙ্ক্ষা ও নির্বাণ, অন্বেষণ নিয়তির মধ্যে শুধু জীবনবোধ নয়, জীবন আছে। এবং সব মিলিয়ে একটি চরিত্র আছে, যা ঘটনার ক্রীড়নক নয়, অন্তর্লীন ঘটমানতায় যা বিবর্তমান। ব্যক্তিবিশেষত্বই তার প্রস্থানভূমি, প্রত্যাবর্তনের নিশানা।

অথচ, ব্যক্তিবিশেষকে ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত ব'লে গণ্য করে না, এবং বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষেরই প্রকাশ, এ-কথা গোরা বলেছে। এটুকু শুনেই যাঁরা গোরা চরিত্রকে ডকুমেণ্টারি তথ্যচিত্রের বাহন হিসেবে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েন, গোরা পড়তে গিয়ে তাঁরা বারংবার প্রতিহত হবেন। অন্ততঃ টমাস এ কেম্পিসের *Imitation of Christ* নামক ধর্মগ্রন্থে মনোনিবেশের চেষ্টা করতে দেখে সুচরিতাকে ব্যক্তিত্ববর্জিত একটি মহিলা হিসেবে মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। বৃহৎ ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ, পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্ট্য গোরা উপন্যাসে আর একটি উপসর্গ নিয়ে এসেছে, সে

৫ নৌকাডুবি, সূচনা। রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), পঞ্চম খণ্ড।
৬ নৌকাডুবি। রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫।

হলো অতিকথন বা over-motivation। কিন্তু ঘটনা এবং চরিত্রের ক্রম-বর্ধিষ্ণু দূরত্বকে মেলাবার জন্যও গোরা উপন্যাসখানি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এর পরে শুধু চরিত্র, শুধুই চরিত্রের অস্তিত্বের সমস্যা।

ঘটনা একটা কোথাও ঘটছে, কিন্তু তা শুধু বহির্দেহলিতে, অন্দরমহলের প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে চরিত্র নিজের মুখোমুখি বসে আছে।[৭]

একালের একজন সমালোচক তাঁর প্রাসঙ্গিক অভিযোগ সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন:

> …গোরার পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা যেন এই তৃপ্তিকর সমগ্রতার সন্ধান পাই না। ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই-একটি রঙিন ও সূক্ষ্মসূত্রকে পৃথককরণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।[৮]

সমালোচক যাকে 'পৃথককরণে'র চেষ্টা বলেছেন, তা সম্ভবত disintegration-এর প্রতিশব্দ। এবং গোরা-পরবর্তী উপন্যাস ঘরে-বাইরের প্রসঙ্গে তৎকালীন একজন সমালোচক সে-কথাই বলেছিলেন, আরো কঠোর ভঙ্গিতে:

> রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিখিলেশকে পরিবারবিমুখ করিয়া, আত্মসর্বস্বময় করিযা, সংকীর্ণতার বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিয়া, তাহার যে-চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের নহে।[৯]

৭ এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা স্বাভাবিক character শব্দটির প্রতিশব্দাযনে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই ব্যক্তির সত্তাস্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দিযেছেন। 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে যিনি কখনো 'চারিত্র' শব্দের ব্যবহার করেছিলেন তাঁরি কাছ থেকে উত্তরকালে আত্মতা, আত্মঘোষণা, স্বভাব, চরিত্ররূপ প্রভৃতি শব্দের অকপট প্রয়োগ পাওযা গেল (দ্র 'রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ'। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ৩-৪)। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি অব্যর্থক উক্তি:

'ইংরেজী ভাষায় ক্যারেকটার শব্দের একটা অর্থ স্বভাব, নৈতিক চরিত্র, আর-একটা অর্থ, চরিত্ররূপ। অর্থাৎ এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য-গোচর হয়।…এইরকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্গুণের চেযে এই ক্যারেকটারের মূল্য বেশি' (যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী উনবিংশ খণ্ড, পৃ ৪৪৩)।

রবীন্দ্রনাটকে অবশ্যই, রবীন্দ্রোপন্যাসের তুলনায়, নীতিচেতন ধীরোদাত্ত চরিত্রের প্রাধান্য।

৮ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ১৪২।

৯ সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃ ২২৯-৩০। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা শীর্ষক গ্রন্থে আদিত্য ওহদেদার অংশটি উদ্ধৃত করেছেন।

নিখিলেশ পরিবারবিমুখ বা আত্মসর্বস্ব না হোক, disintegrated।[১০] সমাজ থেকে যে অবচ্ছিন্ন, ধ্যানধারণার নিঃসঙ্গ মৌলিকতায় তাকে প্রায় সমাজচ্যুত বলা যেতে পারে। সত্যই সে ভারতীয়তার যান্ত্রিক একজন প্রতিভূমাত্র নয়।

এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার এমন কোনো আসক্তি নেই যা তার মানবস্বভাব আচ্ছন্ন করতে পারে :

> আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজী আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ির সুবিধের জন্য ঘরে আগুন লাগাতে রাজী নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে ওটা দুর্বলতার গোঁজামিলন।

নিখিলেশের এই কথাটা যে নিছক অধ্যাত্ম পূর্বসংস্কারের অভ্যাসে বলা হয়নি, তার ভিত্তি যে একান্ত মানবিক সৌন্দর্যচিন্তা ও শিল্পসংবিতের মধ্যে, তার একটি নজির রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' নামক সমালোচনাগ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত করছি :

> সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপর দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে। ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।[১১]

নিখিলেশের চরিত্রের মর্মকথা এখানেই অনুস্যূত হয়ে আছে। নিখিলেশ প্রবৃত্তিকে পুরোমাত্রায় জ্বলে উঠতে দেয়নি, সঞ্চালিত ক'রে দিয়েছে মাত্র। সুতরাং যাঁরা সন্দীপকে প্রবৃত্তি এবং নিখিলেশকে নিবৃত্তি বলেন, তাঁরা বাহির-দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবৃত্তির প্রকাশ্য অত্যাচার নিখিলেশে নেই, এবং

---

১০ ক্ষুব্ধ সমাজতত্ত্ববিৎ নিখিলেশের চরিত্রবিচার করতে গিয়ে সহজেই নিম্নোক্ত যুক্তি স্বানুকূল্যে ব্যবহার করতে পারতেন :

'যে individualism ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়া উঠিল তাহা সমাজের মধ্যে একান্নবর্তী পরিবারকে টিঁকিয়া থাকিতে দিল না। আজ সর্বত্রই সেই disintegration-এর লক্ষণ দেখিতেছি।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত। পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়)।

১১ 'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭।

প্রবৃত্তির অঙ্গার থেকে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গকে সন্দীপের মতো সে প্রশ্রয় দেয়নি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই প্রাণদ উত্তাপটুকুকে সে স্বীকার করে না; স্বীকার সে করেই, কিন্তু তার উপর একটি শর্ত আরোপ ক'রে বলে, 'প্রবৃত্তির সঙ্গে একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায়, তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।'

অর্থাৎ নিখিলেশ আগে থেকে চিহ্নিত হয়ে নেই, তার স্বগতোক্তির স্রোতোরাশি এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের তমঃপুঞ্জ পাঁর হয়ে সে চলেছে এবং চলতে চলতে বুঝেছে, 'ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা।' এই ঝোড়ো রাস্তার অন্য নাম experience যার মধ্যে দিয়ে নিখিলেশ যথার্থ innocence-এ পৌঁচেছে। ঘরে-বাইরে উপন্যাসের প্রথমে যে-নিখিলেশকে দেখি, তার সঙ্গে শেষের নিখিলেশের পার্থক্য নেই তা নয়, শেষের নিখিলেশ অনেক রক্ত অনেক স্বাস্থ্য ঝরিযে কৃশ, ক্লান্ত এবং তার সেই কৃশতা এবং ক্লান্তির মধ্য থেকে তার ভিতরে যে-বিশ্বাস জেগে উঠেছে তাকে বলতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বাস। শান্তরস তার চরিত্রের একটি আপাতলক্ষণ, একটি আবরণ, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ বা চারিত্র নয়। নম্র অবস্থানভূমি নিয়েই নদী বা সমুদ্র শত উপত্যকার উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, ব্যাপ্ত বিশাল ভালোবাসার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সম্ভব— দ্রষ্টা লাও-ৎসুর এইসব নিরীক্ষণের আলোকে নিখিলেশের চরিত্র ছায়াচ্ছন্ন তবঙ্গ তুলে আলোড়িত হতে থাকে।

চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে প্রায় সমকালীন। কালক্রমের বিচারে চতুরঙ্গ ঘবে-বাইরের ঈষৎ আগে লেখা হলেও, ভাবগত আধুনিকতার দিক থেকে তা ঘরে বাইরে অপেক্ষা অগ্রসর ব'লে ঘরে-বাইরে আলোচনার পরেই চতুরঙ্গ-প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করছি। বিশ্লেষণের দিক থেকে সুবিধার্থেও ভাবক্রমটির উপরেই এখানে জোর দিচ্ছি। চতুরঙ্গ, নানা দিক থেকেই, আমাদের সময়ের অন্যতম একখানি আধুনিক উপন্যাস। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষণীতে বলাকা ও চতুরঙ্গ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে পাঠকের কাছে অনেক সংকেত উন্মোচিত হতে পারবে। যে বুনো হাঁসের দল ডিম পেড়েছিল, ঘর বেঁধেছিল, তারা শুধু বলাকায় নেই, চতুরঙ্গেও আছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস বা প্রচলিত নাস্তিক্যে যারা একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনিরুদ্ধ যৌবশক্তিতে চতুরঙ্গে তারাই আবার অন্য কোনো-খানে অগ্রসর। যুক্তিনির্ভর পজিটিভিজ্‌ম থেকে ভক্তিনির্ভর বৈষ্ণব ধর্মের পথিক শচীশ যে শেষ পর্যন্ত কোথাও স্থিত হলো না, স্থগিত হলো না— তার কারণ,

উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এর মধ্যে আরো বিপ্লবী 'হয়ে উঠেছে। 'যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি ক'রে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি'— নিখিলেশ বলেছিল। শচীশের সত্যও অন্তরের সত্য। পার্থক্য, শচীশের আন্তর সত্য অন্তর্জগতে পর্যাপ্ত ও পরিস্ফুট হতে চায়, বাহিরের ঘটনা-পরিবেশকে নিয়ে তার করণীয় কিছুই নেই। শচীশের মধ্যে চরিত্রের বিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি চূড়ান্ত momentum বা গতিরূপ লাভ করেছে। বিবর্তন, না জন্মান্তর বলব? রবীন্দ্রনাথ নিজের উপান্ত্য পর্যায়ের রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন :

> All of us have different incarnations in this very life. We are born again and again in this very life. When we come out of one period, we are as if born again.[১২]

শচীশের মৃত্যু ঘটেছে অনেকবার, জন্মও। ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা শচীশের একখানি মালা। এই মালা যার প্রাপ্য, সেই দামিনীর শত জন্মান্তরও আধুনিক চরিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বিমলা ও দামিনী সতীর্থা, দু-জনেই পরিণামী সমুদ্রের দিকে গেছে, আপেক্ষিক স্বচ্ছন্দ ও সংকীর্ণ ধারণা পার হয়ে হয়ে। কিন্তু দামিনী বিমলার চেয়ে আরো আশ্চর্য, তার তরঙ্গের বেগ ও বিস্তার আরো অনেক বেশী। পঞ্চভূতের 'নরনারী' রচনায় নারীকে 'প্রলয়কারিণী কার্যশক্তি' বলা হয়েছে এবং এ-কথাও বলা হয়েছে, 'রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূ ধূ করিয়া উঠে।' দামিনী বহির্বিপ্লবে যোগ দিয়েছে এবং তার ফলে তার পরিবেশ নয়, তার নিজের জীবনই নিমেষের মধ্যে ধূ ধূ ক'রে উঠেছে। দামিনী সেই মানবী, পুরুষচরিত্রের মতোই যে নিজেকে অনিঃশেষ খুঁজেছে, বিপর্যস্ত হয়েছে এবং যার মধ্যে জীবনজিজ্ঞাসা ও দিব্য অতৃপ্তি মিলে গেছে। তার কাছে পরবর্তী সোহিনীও রক্তাল্পতায় বিবর্ণ।

'সর্বাপেক্ষা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত (fragmentry)' ব'লে যে-বিচারক চতুরঙ্গকে অভিযুক্ত করেন তিনি মানবচরিত্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। মানবচরিত্র, বিশেষত পুরুষচরিত্র সর্বদাই অসম্পূর্ণ এবং অ-নির্ধারিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর শেষের দিকের রচনায় এ-প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন তা তাঁর এই পর্বের উপন্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে :

১২ Forward, 23 February, 1936। প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প গ্রন্থের শেষে পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জি থেকে উদ্ধৃত।

পুরুষের কর্মপথে এখনও তার সন্ধান চেষ্টার শেষ হয়নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানেনি। পুরুষকে অসম্পূর্ণ ই থাকতে হবে।[১৩]

অতঃপর এই নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ চরিত্রায়ণের মুহূর্তে নিজেকেই দিয়েছেন। এবং সৃষ্টিকালে আরো একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা চরিত্রের মসৃণ স্থাপত্যকে ক্ষুণ্ন করতে উদ্যত— সে হলো অবচেতনার সমস্যা। এখানে ফ্রয়েড বা ইয়ুং-এর প্রভাব খোঁজার সুযোগ এসে পড়ে কিন্তু তা তত্ত্ব-তুলনার পর্যায়ে পড়বে ব'লে সে-প্রলোভন সংবরণ করছি। এখানে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসী আধুনিকতা লক্ষ্য ক'রে আমরা শুধু বিস্মিত স্তম্ভিত হতে পারি। প্রতিদিনের নির্মিত ও নির্মীয়মাণ মানবচরিত্রকে অন্ধকার অবচেতনা এসে যে নিরাকার ক'রে তুলতে পারে, নির্বস্তুক উপাদানে ফিরিয়ে দিতে পারে, গিরিগুহাগাত্রে শিলালেখের মতো উৎকীর্ণ ক'রে সেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কয়েকটি অনিবার্য দৃষ্টান্ত :

১ তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে রোঁয়া আছে— এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই— তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।

—চতুরঙ্গ

২ যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। —চতুরঙ্গ

৩ পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটা, আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে

১৩ যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড, পৃ ৩৮৪

তৈমুর জঙ্গিস্ অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল-স্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ যে চাদরে আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন্মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে। কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে। —যোগাযোগ

৪ একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের, সে-জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে এমন মর্মান্তিক ক'রে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল ব'লে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝাবার সময় পায়নি— কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত ক'রে অনুভব করলে। তার গা-কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে, যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে। —যোগাযোগ

শৈবলিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে আবার অনায়াসে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, পক্ষান্তরে, চরিত্রকে অস্তিত্বের সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, নিষিদ্ধ সেই অগ্নিপ্রপাতকে এড়িয়ে তাকে পালাতে দেননি। এমন-কি, বিপ্রদাসের মতো সুস্থ সুন্দর যুধিষ্ঠিরকেও তিনি সংশয় বিদ্ধ করেছেন, বিধিবহির্ভূত চিন্তার নরকে নিয়ে এসেছেন। আর কুমুদিনীকে, তিনি নিষ্ঠুরতম নিয়তির মতো কৌতূহলে, গভীর গুহার দিকে নম্র বেদনায় অগ্রসর দেখেও আশু কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি (যোগাযোগ উপন্যাসের পরিণাম অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সচেষ্ট প্রবর্তনার ফল, কিন্তু ততোক্ষণে কুমুদিনী-চরিত্র সম্পূর্ণ আকার নিয়েছে)। এই সূত্রে একটি কথা অশোভন হবে না। বিপ্রদাস না থাকলেও কুমুদিনী-চরিত্রের মূল সূত্রটি হারিয়ে যেতো না। বিপ্রদাসের কাছে গীতা আর কুমারসম্ভব সে পড়েছে, এবং বিপ্রদাসের সাহায্যেই তার জীবনদর্শন ও মনের গড়নটি দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিপ্রদাস তার অনুজার মুক্তিদাতাও বটে। বিবর্তনের মুহূর্তে কুমুদিনী একা, যেমন একা আশ্রম থেকে স্বনির্বাসিত শকুন্তলা। এবং কুমুদিনী-চরিত্র সেই অস্তিত্বের বিপন্নতার মুখেই ফুটে উঠেছে। তার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তার চরিত্রকে আরো অনেক ঋদ্ধ করেছে, সম্ভাবনায় উন্মীলিত করেছে। সেখানে বিপ্রদাসের কোনো করক্ষেপ নেই। এই প্রসঙ্গটিকে আরো প্রসারিত ক'রে এ-কথা বলা হয়তো সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনায় তাঁর নাটকে চরিত্রের এই স্বাধীন বিবর্তন খণ্ডিত। তাঁর উপন্যাস এই অর্থে অনেক

নাটকীয়। চরিত্রের স্বাধিকার ঘটনার কাছে অভিভূত না হলেও ঘটনাই তার পরিণতি নিয়ে আসে। স্বাধিকার যতো প্রকট, ট্রাজেডি ততোই তীব্র। চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে-কথাই বলেছেন :

> নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয়, চারিদিকের অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষরূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর-একদিকে তার বাহিরের সংবাধ।[১৪]

এলা-অতীনের নিয়তিসংকুল প্রেমের প্রবাহে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ 'চরিত্রের বিশেষত্ব' বলতে কোনো পূর্বনির্ণীত স্থাবর স্বভাবের কথা বলছেন না—অ-সনাক্ত চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্ব ও নিঃশর্ত বিবর্তনের উপরেই জোর দিচ্ছেন। চরিত্রের ঐ অশেষ তিমিরাভিসার ফোটাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক প্রায়ই আখ্যানের পরিণতিকে অগোচরে রাখছেন, ঘরে-বাইরের মধ্য থেকে অগ্রসর চার অধ্যায়ের পাঠকের কাছে এই প্রবণতা অস্পষ্ট নয়। তিনি গল্পের পরিণতি-অংশটুকু সংহরণ ক'রে নিচ্ছেন ব'লে 'এর পরে কী হলো' এই বালক কৌতূহল আর স্বীকৃতি পাচ্ছে না। আরম্ভ-মধ্যভাগ-সমাপ্তির আরিস্টটলীয় ত্রিনীতি এখানে এই অর্থে ক্ষুণ্ণ যে গল্পকার সমাপ্তি-অংশ সম্পর্কে সচেতনভাবেই অনাদরপ্রবণ।

এই কারণেই তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রতিটি অংশের অঙ্গাঙ্গী সংগতি যাঁরা খুঁজেছেন, ভুল বুঝেছেন। নীরজাকে যে-আদিত্য এতো নিবিড় ভালোবেসেছিল, সে কি ক'রে সরলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারল? এবং যদি-বা সেই আকর্ষণ তার মধ্যে জেগে থাকে, তা অতো আকস্মিক কেন, একটি পূর্বাঙ্কুরও তো থাকতে পারত। উত্তরে বলা চলে, চরিত্রের অন্তর্নিহিত অবচেতনের স্মৃতি দুর্মর বেগে জেগে উঠে কি-রকম পরিচিত পরিবেশকে বদলে দেয়, paramnesia নামক মনস্তাত্ত্বিক সত্যে তার পরিচয় আছে। রোমান্টিক কবিদের রচনায় এটি একটা এষণা (motif) এবং রবীন্দ্রনাথ

১৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ৫৪৩-৪৪। তুলনীয় উক্তি: 'Character is made by the interplay of passions and law' (Richard Green Moulton, *The Modern Study of Literature*, p. 286)

সেটিকেই এখানে ব্যবহার করেছেন। মালঞ্চ উপন্যাসের ত্রুটি তবু হয়তো এখানে যে, তার মিতাখ্যান সংযম পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের পথে যতোটা সময় প্রয়োজন তার চেয়েও কম সময় নিয়েছে। অর্থাৎ মালঞ্চ নাটকীয়তায় আক্রান্ত। প্রায় শ্বাসরোধী। মনে হয়, দুই বোন-এ চরিত্রকে ঘিরে নারীত্ব ও মাতৃত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ববিশ্লেষণের যে-তাগিদ, তা থেকে নতুন পথে যাবার জন্যই মালঞ্চ লেখা হয়েছিল।

· এই সময় সংলাপের উপরে যে এতো জোর পড়ল, সে-ও একই কারণে। সংলাপ চরিত্রেরই মুকুর। কিন্তু অনেক সময় প্রতিবিম্ব যেন মুখের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে। আধুনিক কালের উপন্যাসে সংলাপ বা শব্দসজ্জা অত্যন্ত জরুরি একটি প্রয়োজন। একজন সমালোচক তো এমনও বলেছেন:

> Character is merely the term by which the reader alludes to the pseudo-objective image he composes of his responses to an author's verbal arrangments.[১৫]

এতোদূর চরমপন্থী না হয়েও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের চরিত্রেরা শব্দকেই একটি মৌল মূল্যবোধরূপে আশ্রয় করেছে, এবং তাদের ভাষা কাব্য ভাষা বা poetic diction। ভাষাশিল্পী এই চরিত্রগুলি অনেক সময় বাক্‌পটুতায় যুক্তির (reason) পরিবর্তে ওজর (rationalization) পরিচয় দিয়েছে। অমিত রায় এই শ্রেণীরই চরিত্রের পুরোধা।

এই পর্বের চরিত্রেরা জানে যে তারা পূর্ণতার পটভূমি থেকে বিচ্যুত এবং তারা সে-বিষয়ে মর্মান্তিকরূপে সচেতন। মধুসূদনের প্রবৃত্তি এবং অমিতের ধীবৃত্তি দুয়েরই সীমা আছে এবং এ নিয়ে উভয়েরই মন সংকুচিত। 'এতোদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে'— এ-কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে অভীক এই শ্রেণীর চরিত্রেই প্রতিনিধিত্ব করে। সমগ্র থেকে এরা বিচ্ছিন্ন ব'লেই সমস্তকে আঁকড়ে ধ'রে পেতে চায় এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকট রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> Man must realize the wholeness of his existence, his place in the infinite. ...Deprived of the background of the whole his poverty loses its one great quality, which is simplicity...

১৫ Martin Turnell-এর *The Novel in France* গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত C. H. Rickword-এর মন্তব্য।

In literature we miss the complete view of man which is simple and yet great. Man appears instead as a psychological problem, or as the embodiment of a passion that is intense because abnormal, being exhibited in the glare of a fiercely emphatic artificial light.[১৬]

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্ব সম্বন্ধে অনেক সময় এ-অভিযোগ উঠতে পারে যে, সরল মহিমার সেই মানুষটির সাক্ষাৎ সেখানে আর মিলছে না। এ-কথা ঠিক যে abnormal বা অস্বাভাবিক চরিত্রের ভিড় সেখানে বেড়েছে কিন্তু খণ্ডিত চরিত্রের সঙ্গে পূর্ণতার দ্বন্দ্ব সংঘটনই সে-সব স্থলে লেখকের উদ্দেশ্য।

তিন সঙ্গী উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তিনটির মধ্যেই একটি ঐক্যসূত্র আছে এবং এর মধ্যে যে-কোনো দুটি অপরটির উপকাহিনী হতে পারত। এই গ্রন্থের এক-একটি চরিত্র উপন্যাসের চরিত্রের মতোই একটি ব্যাপক পটভূমি নিয়ে গ'ড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, সবশেষে শুধু একটি ছোটোগল্পের চমক রেখে যায়। আরো একটি দার্শনিক সূত্র আছে, empiricism। ইতিপূর্বে তাঁর নায়কেরা সম্পূর্ণতার যে-আস্বাদ ও মুক্তির মধ্যে নিষ্ক্রমণ পেয়েছে, এই পর্বে তার জায়গা জুড়েছে এক রকম ক্ষণসাম্প্রতিক বোধ। তাই নবীনমাধবকে বলতে হয় :

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে চরিত্রের সেই প্রাণসেতু এখানে আর পাওয়া যাবে না। প্রকৃতি এখানে চরিত্রকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তার আপন চৈতন্যের ভরকেন্দ্র থেকে। নবনীমাধব ও অচিরার একটি কথোপকথনের ঈষদংশ :

'আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।'

'তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্যে আমি এই স'রে আসাকে শ্রদ্ধা করিনি, লজ্জা পাই।'

'কেন করেন না।'

'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গ'ড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।'[১৭]

১৬ 'The Relation of the Individual to the Universe', *Sadhana*, pp. 10-11

১৭ তিন সঙ্গী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃ ২৬৪-৬৫

প্রকৃতি ও চরিত্রে নিয়তি ও পুরুষকারের এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কথাসাহিত্যের একটি ফলক্ষণ। তাঁর চিত্রশিল্পে এই দ্বন্দ্ব যে-জায়গা পেয়েছে, এখানে তা পায়নি, কিন্তু তা ব'লে যেটুকু পেয়েছে তা-ও উপেক্ষণীয় নয়।

কোনো এক বিদেশী সাময়িক পত্রের সমালোচক ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে একবার ডস্টয়েভ্স্কির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ঘরে-বাইরে উপন্যাসের সূত্রে তিনি এই প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রে বলেছিলেন :

> শিল্পী হিসেবে যে এ-দু-জনের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য রেখা টানা যায়, তা নয়। এ যেন ক্যাথিড্রাল অর্গানের সঙ্গে একটি বাঁশির তুলনা। তা ছাড়া সেই মহৎ রুশ লেখকের পটভূমিকা হলো একটি গভীর খ্রীষ্টীয় জীবনবোধ। কিন্তু দু-জনেই মূলত প্রাচ্যধর্মী ; মানবিক মহত্বের অন্তর্লীন আদর্শ সম্বন্ধে দু-জনের ধারণায় অনেক মিল।[১৮]

ডস্টয়েভ্স্কির রাজসিক নায়ক চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নায়কদের পার্থক্য অনেকাংশেই দুস্তর ; কিন্তু Absolute বা সম্পূর্ণতার বুভুক্ষায় তারা সবাই সংকীর্ণ পথ ছেড়েছে ; আবার সামাজিক সত্যকে যেমন তারা উপেক্ষা করেছে, তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবন-সত্যকে পাবার জন্য ঝুঁকিও নিয়েছে। অপর সাদৃশ্য, আত্মক্ষয়ী ব্যক্তি-চরিত্রের অহংকে এঁরা কেউ প্রশ্রয় দেননি, দাস্যরসের অশ্রুময়তায় প্রেমের কাছে, পরমের কাছে তার মাথা নত করেছেন। টলস্টয়ের এপিকসুলভ উদাসীনতা এবং—তাঁরই ভাষায় পৃথিবীর মস্ত প্রজাপতির গুটি থেকে নিরাসক্ত প্রজাপতির মতো বেরিয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নেই। তাঁর উপন্যাস, ডস্টয়েভ্স্কির মতোই, জীবনকে ভালোবেসে জীবনের সঙ্গে জড়িত হবার শিল্প।

এখানেই স্তাঁধাল বা প্রুস্ত্-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। খরবুদ্ধির সাহায্যে স্তাঁধালের যে-সব চরিত্র সমাজের বাইরে এসে সমাজকে আক্রমণ করে, রবীন্দ্রনাথের নায়কেরা তা করে না। শেষোক্ত চরিত্রেরা প্রগাঢ় প্রবাসী, কিন্তু স্তাঁধাল— ব্যবহৃত étranger অভিধা তাদের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয়। প্রুস্ত্-এর মতোও তারা আপন অনুভূতির তন্তুজালে অন্তরীণ নয়, অথবা জীবনবিন্যাসের বৃহৎ ব্যাপার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী সময়চেতনার মধ্যে

---

১৮ *The Church Times*, 1.8.1919. A. Aronson-এর *Rabindranath Through Western Eyes* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

বাস করে না। একই সঙ্গে আত্মলীনতা এবং আত্ম-উত্তরণ তাঁর চরিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য অথবা ঈপ্সিত লক্ষ্য।

চরিত্রের এই পরমতা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপহার। শরৎচন্দ্র এখান থেকেই যাত্রা সূচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের ফল-শ্রুতি রসোজ্জ্বল একটি আখ্যানের সমগ্রতা, চরিত্রের নয়। দু-তিনটি সমকালীন উদাহরণ বাদ দিলে, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস চরিত্রের এই বিবর্তনকে স্বীকার করেছে কিনা সন্দেহ। হয়তো শতচ্ছিন্ন আমাদের সময়ের বাসনালোকেও এই পূর্ণাভিমুখী বিবর্তনের জন্য কোনো বেদনা কিংবা প্রত্যাশা নেই। এবং শতধা সমাজের ভঙ্গুর দুর্দশা মেনে নিয়েও যে বিব্রত ব্যক্তিসত্তা পূর্ণপ্রয়াণের পথে ত্বরান্বিত হতে পারে, এমন কোনো প্রবণতা শক্তিমান শিল্পীদের অধিকাংশের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না।

সোফোক্লেস জীবনকে স্থিরভাবে আর সমগ্রভাবে দেখেছিলেন, ম্যাথ্‌ আর্নল্ড বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যও সমগ্র জীবনকে স্থির ও গভীরভাবে দেখা। এবং যেহেতু আত্মসন্ধান এবং জীবনসন্ধিৎসা রবীন্দ্রচরিত্রের মূলসূত্র, তাঁর রচিত চরিত্রাবলীতে তার আভ্যন্তরিক অভিজ্ঞান আছে। এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন, রবীন্দ্রনাথেরই মতো, সমস্ত জীবন ছেঁকে সমগ্রতার স্যমন্তক মণি অর্জন করেছে।

অনুচিন্তা : কালান্তর ও বাংলাদেশ

১৯১০-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে মানবচরিত্র বদলে গেল, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের এই অবলোকন অর্থবহ। বিশ্বাবর্তের অংশীদার আপনার দেশের সঙ্গে সতীর্থের অধিকার পাবার জন্য বাংলাদেশের কবি বা কথাশিল্পীরাও এগিয়ে আসবেন, এটা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ছিল। ১৯১৯-এ ভারতপথিক ই. এম্‌. ফর্স্টার ঘরে-বাইরে উপন্যাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিচলিত কিছু উক্তি করলেন :

> In spite of the beautiful writing and the subtle metaphor and the noble outlook that are inseparable from Tagore's work this strain of vulgarity persists. It is external, not essential, but it is there ; the writer has been experimenting with matter whose properties he does not quite understand. Why should he care to experiment ? Here is a more profi-

table and more difficult question. Having triumphed in *Chitra* or *Gitanjali*, why should he indite a "roman atrois" with all the hackneyed situations from which novelists are trying to emancipate themselves in the West?

এবং নিজেই সম্ভাব্য উত্তর করেছেন :

> These Bengalis—they are an extraordinary people. They are modern and mentally more adventurous than any of other races in the Indian Peninsula. They like trying, and failures do not discompose them, because they have interst in the constitution of the world.[১৯]

রবীন্দ্রনাথ পরিত্যক্ত ত্রিভুজ প্রেমের রোমান্সের রূপকল্পকে, নতুনত্বের চাহিদায় পুনশ্চ ক্লান্ত করেছিলেন, এ-কথা বলার উপায় নেই। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহের সঙ্গে তুলনা করলেই ঘরে-বাইরের নিজস্ব রীতিবৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হবে। মহিম-অচলা-সুরেশ নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের কার্বন তর্জমা হয়েও অনেক বেশি মাত্রায় বহিরাশ্রয়ী। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথাগত ত্রিভুজ ভেঙে গিয়ে পারম্যের সন্ধানে ঋজুরেখায় গভীরে একত্বের অভিমুখে ধাবমান। নিছক আখ্যানগত জটিলতা সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত, কেননা, আত্মতা (essence) আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য। সেই আবিষ্ক্রিয়া তাঁর কাছে মূলত কৌশলী উদ্‌ভাবনার সমস্যা নয় ব'লেই তাঁকে বলতে হয়েছিল :

> *Anna Karenina* পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না— এ-রকম সব sickly বই প'ড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।'[২০]

এই বাক্যে 'বেশিক্ষণ পোষায় না' কথাটি অবশ্য অবধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সারল্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ঔদার্য প্রভৃতি বিশেষণে কোনো অতি সুকুমার পরিবেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন না। বস্তুত যে-কোনোরকম উগ্র উদ্দেশ্যবাদের প্রতি, কথাশিল্পী হিসেবে, তাঁর স্পৃহাশূন্যতা প্রখর।

ফর্স্টর চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরিরা যেন ঘরে-বাইরের রূপকথা পরিহার ক'রে মুক্ততর প্রকরণ (freer form) গ্রহণ করেন। তাঁর এই ভবিষ্য-

১৯ 'Two Books by Tagore'. *Abinger Harvest*

২০ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৪

বাসনা অন্য অর্থে চরিতার্থ হয়েছিল। কল্লোলীয় শিল্পীরা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের অব্যবহিত আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে সর্বগ মুক্ত রীতির পোষকতা করলেন। এঁদের একজন অগ্রণী প্রতিনিধি লিখছেন :

> ইউরোপে কথাসাহিত্য Scott, Dickens, Thackeray ছাড়িয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। George Meredith, Henry James, Thomas Hardy, Robert Louis Stevenson, H. G. Wells প্রভৃতি কৃতী লেখক কথাসাহিত্যে নূতন নূতন পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। Zola, Guy de Maupassant, Anatole France, Gautier, Tolstoy, Turgenev, Dostoevsky, Maeterlinck, Ibsen, Bjornson, Strindberg, Bernard Shaw প্রভৃতি কৃতী লেখক নানা দিক দিযা কথা ও নাট্য সাহিত্যের বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্পাদন করিতেছেন। বর্তমান যুগের বাঙালি কথা-সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই সব নূতন ধারার সঙ্গে সুপরিচিত। তাহাদের কলাবিকাশ তাহাদের আদর্শ, তাহাদের ভাব-প্রেরণা ইঁহাদের ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করিতেছে। কাজেই আজকার উপন্যাস যে গতযুগের বাংলার উপন্যাস হইতে ভিন্ন হইবে সে আব বিচিত্র কী? ··· বাংলা কথাসাহিত্যের সঙ্গে এইরূপ বিশ্বসাহিত্যের একটা অঙ্গাঙ্গিযোগ সাধিত হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি [শরৎচন্দ্র] পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিষ্য যে তিনি তাহাদের নিকট পাইয়াছেন চিত্রাঙ্কনে এক কঠোর সত্যনিষ্ঠা।[২১]

যাকে নরেশচন্দ্র 'কঠোর সত্যনিষ্ঠা' (সত্যানুগত্য ?) বলছেন তা প্রকৃত প্রস্তাবে বিমিশ্র তথ্য ও ভাবনার আপাত মুক্ত সমাহার। এমন বলা যেতে পারে, বাংলা উপন্যাসে 'প্রকৃতিপন্থা' (naturalism) পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দেবার প্রবণতা থেকে সঞ্জাত। পরবর্তী পর্বে যাঁর মধ্যে প্রকৃতিপন্থা একটি কৌণিক সামঞ্জস্য পেয়েছিল সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের রচনায আজ আমরা এই অর্থে কল্লোলোত্তীর্ণ প্রাজ্ঞতা লক্ষ্য করি যে পর্যবেক্ষণের তদন্তবিবেকের সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রকথাসাহিত্য থেকে নিঃসৃত রোমান্টিকতা যথোচিত মাত্রায় মেশাতে পেরেছিলেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায স্বরচিত পাত্রপাত্রীর নিয়ামক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অন্য মেরুতে দাঁড়িয়ে রযেছেন। সেদিক থেকে সম্ভবত বিভূতিভূষণ

২১ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র', যুগপবিক্রমা, পৃ ২২৫-২৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ধারাবাহী নন। যেখানে তিনি উচ্চারিতরূপে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, সেখানেও রবীন্দ্রচরিত্রের স্বাধিকার কি-রকম স্পষ্ট, একটি দৃষ্টান্তে সেটি ব্যক্ত :

> সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ মিশ্রিত—এমন-কি মায়ের মৃত্যু সংবাদ যখন সে তেলিবাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস,…একটা বাঁধন ছেঁড়ার উল্লাস—অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একি, সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য! মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?[২২]

বিভূতিভূষণ ব্যক্তিচরিত্রের ট্র্যাজেডিকে এপিকের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্ত করেছেন। যিনি একটিও এপিকোপন্যাস লেখেননি সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে এপিক-প্রণেতা বিভূতিভূষণের অন্যতম ঋণ বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তির অনিশ্চিত অভি-যোজন সমস্যার অঙ্গীকার। 'ট্রাজেডি সংশয়ের যুগে যেমন থাকতে পারে না, এপিকের অস্তিত্বের পক্ষেও তেমনি কোনো সদর্থক বিশ্বাস চাই'—নীৎশের এই বক্তব্য স্মরণীয়। সংশয়ের যুগেই এপিক রচনা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র-নাথের 'ছিন্নপত্র' এবং কথাসাহিত্য থেকে এই পাঠ নিয়েছিলেন যে বেঠিক-পথের পথিক ভেঙে যেতে-যেতে বড়ো একটি দিগ্‌বলয়ে আশ্রিত হয়। পক্ষান্তরে অপর এপিক-কথক তারাশংকরকে যখন বলতে শুনি, 'সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা শুভ উদ্দেশ্যের আশা করব, অন্তত যখন তারা সমাজের পক্ষে ব্যক্তির পক্ষে, বিপজ্জনক উপাদান নিয়ে সৃষ্টি করবেন, তখন', অনুভব করি, সর্বতোভদ্র চরিত্র এবং স্বৈরবৃত্ত চরিত্রের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান বেড়ে চ'লছে যা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটি প্রতীপসাম্য পেয়েছিল। উপন্যাসের বর্তমান মুহূর্তের বাংলা কথাশিল্পে চরিত্র নন্দনতত্ত্ব এবং আদর্শবাদের দ্বৈতে আত্মিক প্রস্থানভূমি হারিয়েছে।

হেগেল মহাকাব্যের কাছে যে বস্তুময় সমগ্রতা (totality of objects) আশা করেছিলেন, রবীন্দ্রোপন্যাসে তারি সম্পূরক আত্মসামগ্র্য (subjective totality) দেখা গিয়েছে। সে-ই সম্ভবত বাংলা উপন্যাসের উত্তরণপথ।

২২ অপরাজিত, পৃ ১২৯

ভক্তিরসের কবিতা

পতিতা সোনিয়া অথবা ফাদার জোসিমার জ্যোতির্বলয় যাঁর প্রতিভায় মাটির পৃথিবীতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, রজোগুণের মহত্তম শিল্পী সেই ডস্টয়েভ্স্কির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমাদের দৈনন্দিন জগতের প্রাকৃত পরিসরে যাঁরা অব্যবহিত হয়েও কিছুটা স্বতন্ত্র, তেমন দু-জন কথকের বর্ণনাংশ মনে করা যাক। একজন, সমারসেট মম্, তাঁর স্বৈরিণী নায়িকাকে গল্পের শেষে আসন্ন প্রত্যূষের পথে এনে দাঁড় করালেন, ছোটো নদী আর ধানের খেতের কিনারে কুহেলিবিদারী সূর্যোদয় দেখালেন। অন্যজন, গ্রেহাম গ্রীন, তাঁর নায়ককে চরম দুর্যোগে, নীরন্ধ্র কলুষ রাত্রে দুটি মোমের মধ্যবর্তী একটি অব্যক্ত নিরঞ্জন মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করালেন।

অথচ 'ভক্তি' কথাটা শুনলেই আজ আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। যেন গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমাদের এখনই প্রথানুমোদিত কাঁসর ঘণ্টা ঝুলতে থাকা একটা পবিত্রতা মার্কা প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাবে, কুসুমাঞ্জলি দানে প্ররোচিত করবে। এ-রকম একটা সন্ত্রস্ত সংস্কারের জন্য দায়ী নিশ্চয়ই সেই সব ভক্তসম্প্রদায়, যাঁরা মন্দিরবাহিরে, মধুপর্কের তৃপ্তিতেই নিমজ্জিত থেকে গেলেন।

যতোদূর মনে পড়ছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই[১] 'ভক্তি' শব্দের প্রথম উল্লেখ ঘটেছে, দেবতাকে যেমন ভক্তি করবে, গুরুকেও তেমনি করবে— এইরকম একটি নির্দেশ সেখানে ছিলো। শব্দটির সংজ্ঞা এখানে না থাকুক সংকেত দূরবিস্তারী। দেবতা বা গুরু, কেউই ঠিক লৌকিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ বা অন্তর্ভূর্ত নন, তাঁরা ব্যতিক্রম, তাঁরা পরাতত্ত্বের প্রান্তস্পর্শী। দ্বিতীয় চিন্তায় মনে হবে, দেবতা তো অনেক অচেনা, অনেক অনন্তে; আর গুরুর উপস্থিতি তো ঠিক ততোটা পরপারের কুয়াশায় নয়— বরং তিনি নাতিনিকট ও অনতিদূর, অস্মিতা এবং ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যদি তাঁর মন গলাতে পারি, তবে আমি আত্মসামীপ্য পাব, স্বোপলব্ধি ঘটবে আমার। সবচেয়ে আশ্চর্য, যিনি তুরীয় সিন্ধুসিদ্ধান্তে নিজেকে মেলানোর কথা ভাবতে পেরেছিলেন, সেই শঙ্করাচার্যও ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোনো লোভনীয় মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দিলেন না, শুধু বললেন ভক্তি হলো শুধু নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে চলা, 'স্বস্বরূপানুসন্ধান'।

---

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।২৩

তাহলে নিজেকে খোঁজা মানেই উপাস্যকেও খোঁজা। আর তার মানেই, নিজেকে যেমন কখনো পাবার উপায় নেই, তেমনি, ঈশ্বরকে পেয়ে যাওয়া কিম্বা পেয়ে গিয়ে দ্রবীভূত হয়ে পড়ার মধ্যেও তেমন-কোনো কৃতিত্ব কিংবা গৌরব নেই। নিজেকে যদি একবার কোনো মৌহূর্তিক সৌভাগ্যে অর্জন করাও যায়, পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে বিভক্ত ক'রে আস্বাদন করার চেষ্টা। ভক্তের কাজই বিভক্ত হওয়া, পুনর্মিলিত হওয়ার বাসনা বা হতে না পারার যন্ত্রণাটা অবশ্যই সেখানে আমাকে জাগিয়ে রাখছে, জ্বালিয়ে রাখছে— কিন্তু সেটা নিঃশর্ত প্রেরণা, মোক্ষ নিয়ে অবশ্য অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে। এইসব কবিতার পর্যায় প্রদর্শন করতে গিয়ে কেউ-কেউ এর নাম রেখেছেন অদ্বৈত মরমিয়াবাদ (Unitive Mysticism)। সূফী কবি অত্তারের 'পাখিদের সংলাপ' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। যখন উপকূলচর একটি পাখিকে আর-সব পাখিরা প্রশ্ন করলে, রাজার প্রাসাদে যাবার রাস্তাটা কতো লম্বা, তখন পাখিটা বললে সাত-সাতটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে সেখানে সকলকে যেতে হয়, কিন্তু যেহেতু কেউ-ই সেখানে গিয়ে আর ফিরে আসে না, আমরা সে-পথের রোমাঞ্চ বা দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। অত্তার অবশ্য সপ্তম উপত্যকাটিকে বললেন 'অহংধ্বংসের উপত্যকা'— যেখানে জীবাত্মা গিয়ে বিশাল অর্ণবে মাছের মতো ডুবে যায়।[২] কিন্তু ঐ সিন্ধুতে না মিশে গিয়েও আরেকরকম মরমী মার্গ থাকতে পারে, আছে। তার নাম 'মরমিয়া পরিণয়' (Epithalamium Mysticism)[৩]। বিবাহের প্রথম কথাটি হলো ব্যক্তিত্বের পার্থক্য এবং অতঃপর এই পার্থক্যের উপরেই একটি অন্বয়ের সাধনা। দু-জন যদি প্রথমত বিচ্ছিন্ন না হয়, মিলবে কিসের ভিত্তিতে? দাম্পত্য সংরাগে যদি অভিমানের লেশমাত্র না থাকে, যদি ভুল বুঝবার এতোটুকু সুযোগ না থাকে, তবে সে কেমন বিবাহ? কোনো মরমী দার্শনিক একেই বলেন 'ব্যক্তিত্বের পুনর্বিন্যাস' অথবা অন্তরের কোরকে (Gemüt) পরমের সঙ্গে সসীমের মিলন।[৪]

২ Evelyn Underhill-এর *Mysticism* (পৃ ১৫৬-৫৭)।

৩ Askesis ও Agape এই দু রকম পন্থা অনুরূপ আরেকটি ভাগ। দ্রষ্টব্য: Denis de Rougemont-এর *Love In the Western World* (পৃ ৬১-৬২)। অনুবাদ: Montgomery Belgion

৪ Rudolph Eucken-এর উক্তি। Evenly Underhill-এর *Mysticism* গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

নিজেকে নতুন ক'রে নেওয়ার তাগিদেই যথার্থ ভক্তিরসের কবিতার জন্ম। ঈশ্বরের সঙ্গে সমীকরণ এর পক্ষে সবচেয়ে নির্মম বিড়ম্বনা, অবান্তর অন্তরায়। এমন-কি, এ-কথাও বলবো, ঈশ্বরও ভক্তিরসের কবিতার উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বরের নাম ক'রে আমাদের সংসক্ত মনের অনেক অপরিশীলিত ভাবাবেগেই আমরা চালিয়ে দিই। কিন্তু এ-রকম কবিতা যদি ভক্তিরসাত্মক হয়, তবে নিছক জৈব আবেগমাত্রই ভক্তিরসান্বিত! একটি উদাহরণ:

পশ্চিমা হাওয়া, বইবে কখন জোরে?
ঝিরিঝিরি জল নামাবে কখন, ভাবো?
যীশু, তাকে যদি ফিরে পাই বাহুডোরে
তাহলে আবার শয্যায় ফিরে যাবো।[৫]

এখানে যীশুর কোনো ভূমিকা নেই। বরং, এক্ষেত্রে, বিদ্যাসুন্দরের পৃষ্ঠপোষিকা দেবীর কিছু করণীয় ছিল। এবং বিদ্যাসুন্দর, সমাজশোধনী বা সমাজবিরোধী কোনো প্রবণতার নিন্দা বা প্রশংসা করছি না—আর যাই হোক, ভক্তিরসের কাব্য নয়। রবীন্দ্রনাথ তবু কেন সমাজপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, আলোচ্য বিষয়ে তার তাৎপর্য প্রচুর ব'লেই, তাঁর কথাগুলি স্মরণ করছি: 'বৈষ্ণব কবিরা ··কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে। বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে-সুরঙ্গমধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই।'[৬] অন্তার-কথিত 'রাজার প্রাসাদ এবং রবীন্দ্রোক্ত 'সমাজের প্রাসাদ' এ-দুয়ের মাঝখানে আরো একটি প্রাসাদ আছে, সে হলো ব্যক্তিহৃদয়—যা ভক্তিরসের অন্তস্পট। ভক্তিরসের কবিতার নায়ক কবি নিজে। প্রবৃত্তি থেকে স্বভাবে, স্বভাব থেকে স্বরূপে তাঁর নিঃসীম যাত্রা।

৫ Chambers ও Sidgwick সম্পাদিত *Early English Lyrics* থেকে উদ্ধৃত ও অনূদিত।
৬ 'গ্রাম্যসাহিত্য', লোকসাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৬, পৃ ৬৪৭

নব্য-বৈষ্ণব ধর্মে এই চিন্তাটিই 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে'র নাম নিয়ে আশ্চর্য ধরা দিয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের ভেদও বটে, আবার এর মধ্যে সব মিলিয়ে যে-ব্যঞ্জনা, সেটি অচিন্ত্য অর্থাৎ চিররহস্যাবৃত। এর সবচেয়ে বড়ো কবি-প্রতিভূ গোবিন্দদাস। তিনি বর্ষা রাত্রে অভিসারিকাকে ঘরের বাইরে আনেন, তাঁকে অমীমাংসিত অথচ মহান্ মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেন :

সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানসসুরধুনী পার॥

যদি সুরধুনীর ওপারে থাকতেন, তাঁর কাছে কোনোক্রমে যাওয়া যেত। কিন্তু মানসসুরধুনীর পরপ্রান্তে যিনি অব্যয়, নিশ্চল— তাঁর কাছে কী ক'রে যাওয়া যাবে? মাঝে-মাঝে হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু তখন তাঁর হয়ে আবার জেগে-থাকার পালা শুরু :

মম হৃদয়বৃন্দাবনে কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।

এবং এখানেই গোবিন্দদাস প্রমাণ করলেন, কৃষ্ণপ্রাপ্তি এমন-একটা কিছু সাধ্য-বস্তু নয়, প্রেমের প্রহরী অর্থাৎ কবির ঐ তৃপ্তিহীন জাগৃতিটুকুই মহার্ঘ সম্বল, সেই বেদনাই ভূমা, নাল্পে সুখমস্তি। বাইবেলের Job, গীতার অর্জুন এই বেদনার ভূমানন্দ জেনেছিলেন।

গোবিন্দদাসকে নিয়ে গল্প আছে, তাঁর কঠিন অসুখ যখন আরোগ্য হলো তখনই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেন, কবিতা লিখতে শুরু ক'রে দিলেন। লীলাশুক, তুলসীদাস থেকে আরম্ভ ক'রে হ্যেল্ডারলিন বা পাস্তেরনাক পর্যন্ত শতেক যুগের ভক্তিরসের শিল্পীদের নিয়েই কোনো আঘাত বা অসুখের, কোনো প্রাকৃত বা উদ্ভাসক এ-রকম কোনো-কোনো ঘটনা এবং কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তা থেকে এই কথাটা নিষ্পন্ন হয়, ভক্তিরসের মূলে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত শ্রুতিলিখন নেই, 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' না থাকলে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা' নেই, রতি না থাকলে আরতি নেই। সাধক-কবি রূপ গোস্বামী এই কথাটি প্রণিধান করেছিলেন। তাই তাঁর সম্পাদিত 'পদ্যাবলী'র মতো ভক্তি-কবিতার সংকলনে সুবন্ধু, ভবভূতি, অমরু, রুদ্রট বা ক্ষেমেন্দ্রের মতো উচ্চারিতরূপে রতিরসোচ্ছল কবির কবিতাও স্থান পেয়েছে। রূপ গোস্বামী সেই সব কবিতার নরনারীর নাম পাল্‌টিয়ে পদাবলীর নায়ক-নায়িকার নাম বসিয়েছেন, এ-ছাড়া আর-কোনো অদল-বদল করেননি। যেখানে ছিল 'রাম', সেখানে বসলো

'রাধা' (শ্লোক সংখ্যা, ১৯০), যেখানে 'সুন্দর', সেইখানে এল 'মাধব' (শ্লোক সংখ্যা ২১৯), যেখানে ছিল 'কান্ত', সেখানে এল 'কৃষ্ণ' (শ্লোক সংখ্যা, ৩৭২)।[৭] এই নামান্তরেই কি কবিতাগুলি ভক্তিরসাস্পদ হয়ে উঠল? তা নয়। আসলে সংকলিত এবং ঈষৎ পরিবর্তিত এই কবিতাগুলির মধ্যে মূলত একটি তীব্র দাহ ছিল, যাকে একটু মোচড় দিয়েই দীপ্ত দ্যুতিতে পরিণত করা হয়েছে। আসলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যাকে একদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, লৌকিক কবিতা, অন্যদিক দিয়ে দেখলেই তাকে ভক্তিরসের কবিতা ব'লে চিনে এ-কালের একজন অগ্রণী কীর্তনজ্ঞ শিল্পী[৮] বর্তমান লেখককে স্বয়ং ভক্তিরসের রসরাজ রবীন্দ্রনাথের কৃত একটি রসাভাস দেখিয়েছিলেন। বিদ্যাপতির 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ' এই পংক্তিটির মধ্যে 'কাম' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সংস্কারকে পীড়িত করেছিল; তাই তিনি ঐ শব্দের স্থলে 'বিরহ' শব্দটিকে আরোপ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সংস্কারবশত লক্ষ্য করেননি, 'বিরহ' শব্দটি ওখানে একেবারে নিস্তেজ, এমন-কি 'রক্তাল্প' হয়ে পড়ত। বিদ্যাপতি তা করেননি। ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ কবিতায় শ্লীল-অশ্লীল, শুদ্ধ-জৈব, যৌন-চিন্ময়—সবই একটি অভিন্ন ধাতুদ্রাবী চিৎপাত্রে গিয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। তাই :

এই ব্রজের রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী
নিজকরামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥[৯]

এই অংশ যেমন ভক্তিরসোজ্জ্বল, নিম্নোদ্ধৃত দুটি অংশও তেমনি :

১. কোথায় লুকালে তুমি,
আমাকে কাঁদাবে ব'লে
পালালে হরিণ যেন,
পাগল অট্টরোলে।
তোমাকেই ডাকি তুমি চলে গেছো আজ দূর জঙ্গলে ॥

৭ সুশীলকুমার দে পদ্যাবলী বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই নামান্তরের সমস্যায় আলো ফেলেছেন।

৮ হরিদাস কর।

৯ ললিতমাধব থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত ভাবানুবাদ (অন্ত্যলীলা-২৯)

২.		কুমারী চলেছে পথে-পথে
গর্ভে গোপন শব্দ তার,
এসেছে তোমারি মনোরথে
নেবে না কি তাকে ঘরে তোমার ?[১০]

আবার হেরিকের

রেশমী শাড়িতে যখন আমার জুলিয়া চলে,
মনে হয় যেন মধুর মধুর প্রবাহ গলে
তার বসনের তরলিমা তার বসনতলে।[১১]

এই ছবিটির বিশ্লেষণকালে যে-সাহসে পণ্ডিত আবারক্রম্বি বলেন যে 'হেরিকের জুলিয়া সবার জুলিয়া হয়ে গেছে'[১২] তেমনি চণ্ডীদাসের

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর

অথবা

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়

ইত্যাদি পঙ্ক্তিতেও সেই ঈপ্সিত ব্যাপ্তিবেগ আমরা খুঁজে পেতে পারি। আত্ম-বিশ্লেষণ ভক্তিকবিতার একটি অঙ্গ। বিদ্যাপতি থেকে মানসী-যুগের রবীন্দ্রনাথ, জন ডান্ থেকে আন্দ্রে-জীদের দিনপঞ্জীতে যে-অনুতাপের পুষ্পায়ন ঘটেছে, তা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। এই অনুতাপের শেষ শান্ত রসে। শান্ত রসে ভক্তির প্রক্রিয়া না থাক, পরিণাম আছে। অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুধ্যান, খেয়ার পর গীতাঞ্জলি, রাত্রির পর উষা, সন্তাপের পর শান্ত মুখচ্ছবি। পর পর তিনটি অণিমা-সিদ্ধ কবিতা মনে আনা যাক :

১.	সংঝা-গহিঅ-জলঞ্জলি-পডিমা-সংকন্ত-গোরি মুহ-কমলং।
অলিঅং চিঅ ফুরিওট্‌ঠং বিঅলিঅ-মন্তং হরং ণমহ॥
নমো হে নমো! গৌরীমুখকমল দেখে জলের অঞ্জলিতে
মন্ত্র ভুলে গেছেন শিব, ওষ্ঠ কাঁপে, আসন্ন নিশীথে॥[১৩]

১০ St. John of the Cross-এর 'দিব্য শব্দ' কবিতাটির অনুবাদ।

১১ Herrick-এর 'when as in silk' থেকে।

১২ Lascelles Abercrombie—'The Idea of Great Poetry'

১৩ সাতবাহন নরপতি হালের 'গাহাসত্তসঈ' প্রাকৃত কবিতা সংকলনের শততম কবিতাটির অনুবাদ।

২. বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরন্ দূরপ্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধাস্যসি।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোর ব্যাজ্জগন্তি স্ফুর
দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয় গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্ত ভাবং স্মিতং ॥
'বাছা, যখন বনপাহাড়ে গুহায় যাবে হিংস্র পশু দেখে
ভয় পেয়োনা, ভাগ্যপুরুষ নারায়ণের নাম গোপনে নিয়ো'
যশোদার এই কথা শুনে কৃষ্ণের অধরে গোপনীয়
স্মিত হাসির ছটায় যেন সারা জগৎ রহে নিরুদ্বেগে।[১৪]

৩. রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভোদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়াম্মসৃণ যমুনাতীরবাণীরকুঞ্জে
রাধাকেলী ভরপরিমল-ধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥
রত্নচ্ছায়াখচিতসাগরে দ্বারকার মন্দিরে
নিবিড় পুলক লাগে কৃষ্ণের, আশ্লেষে রুক্মিণী,
তবু শ্রীরাধার সুবাস বেতসকুঞ্জে যমুনাতীরে
ভেবে মূর্চ্ছিত মুরারি ; বিশ্ব রক্ষা করুন তিনি।[১৫]

এইসব কবিতা সমুদ্রে চন্দ্রোদয়ের মতো। বিবেকের পীড়নে যে-সংকটের শুরু, বিস্ময়ের সুষমায় তার তর্পণ।

তাই ভক্তি-কবিতার ভাষায় সচেতন আত্মগুঞ্জরণ। গীতার ভাষায় বলতে পারা যায় আত্মশ্রুতি। যিনি উপনিষদের ভাষায় 'অবাঙ্মনসোগোচর', চর্যাপদের ভাষায় 'বাক্‌পথাতীত', না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে বিরাজিত সেই ভাবনাটিকে নিয়ে কবীর বলেছিলেন :

বোল অবোল মধ্য হৈ সোই

কবীর আরো বলেছিলেন :

মসি কাগদ তো ছুয়ো নহিঁ কলম গহী নহিঁ হাথ।
চারিহু জুগন মহাত্ম জেহি কবিকে জনায়ো নাথ ॥ ৫৪
কাগজ কালি কলম ছাড়া নিপুণ ভগবান।
সৃষ্টিপথে করেন সদা নিজের গুণগান ॥

১৪ শ্লোকটি অভিনন্দের, পদ্যাবলীতে সংকলিত (শ্লোক সংখ্যা ১৫০)।
১৫ উমাপতি ধরের কবিতা ; পদ্যাবলী থেকে উদ্ধৃত ও অনূদিত।

ঈশ্বর স্বভাবকবি হতে পারেন। কিন্তু মানুষ দৈবাৎ এক অখণ্ডমণ্ডলাকার অনুভূতি লাভ করলেও তাকে প্রকাশ করার সময় 'কালি কলম মন, লেখে তিনজন'। তিনজন না হোক, অন্তত দু-জন। চেতনায় একটি রশ্মি এসে লাগল, এ হলো মনের একটি স্তর। সেই আলোক রেখাটিকে অক্ষুন্ন পৌঁছে দিতে হবে —এটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। নির্গুণ মরমী হিন্দি কবিদের 'সাখী' ও 'শব্দ', সুফীদের 'কুদরৎ' আর 'হিকমৎ'[১৬] বা 'ফনা' ও 'সমা'[১৭] হলো এই দুটি স্তরেরই নানা প্রতিশব্দ। 'সমা' শব্দের অর্থ শ্রবণ। সুন্দর ধ্বনি শুনলে ঈশ্বরের দিকে যাওয়া যাবে, এই হলো তাৎপর্য। চণ্ডীদাসের নায়িকা নিজেকে দেখতে, দেখাতে ভালবাসেন না, শুনতে শোনাতে ভালোবাসেন। সমস্ত জগৎকে তিনি শ্রবণে পরিণত করেন। নামের নেশা থেকেই নামসংকীর্তন, নির্জন থেকেই জনাকীর্ণ হয়ে ওঠা। তাই ভক্তিরসের কবিতা সাংকেতিক হলেও সার্বজনিক। কিংবা, কথাটা ঘুরিয়ে বলি, আধুনিক সাংকেতিক কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তিরসেরই কবিতা, তবে সংবৃতকে সঞ্চারিত করা নয়, সঞ্চারিতকে সংবৃত করাই তার লক্ষ্য। রিল্‌কের 'দেবদূত' বা র‍্যাঁবোর 'বৈতালিকবৃন্দ' স্বীকরণে যতোটা উদ্‌গ্রীব, সাধারণীকরণে ততোটা ইচ্ছুক আদৌ নয়।

কয়েকটি ভক্তিরসের কবিতার অংশ মনে পড়ছে :

১. আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
... ...
বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে। (গীতিমাল্য ৭৭)

২. প্রশান্ত না কৃষ্ণ বেরিং ভারত মেরুসাগর তাকে বলে,
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে

১৬ C. D. Barthwal—The Nirguna School of Hindi Poetry.

১৭ John Murphy—The Origins and History of Religions.

একটি ঘোড়া সূর্য হয়ে জলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে ;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিল।

(পৃথিবী, জীবন, সময় । জীবনানন্দ)

৩. হয়তো ঈশ্বর নেই , স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলাব অভিব্যক্ত হ্রাসে ;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে ,
জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত।

... ...

অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপ :
আমার শাস্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তাব অবরোহী পাপ ॥

(বিপ্রলাপ, 'সংবত' । সুধীন্দ্রনাথ)

৪ নীরন্ধ্র এই বন্যাঘাত,
হাল্কা তবু হাওযার পাত।
কানে কানেই ঝরে বাঁশি
সেখানে কেউ নেই।
মধুকোবকে মুকুলরাশি
কমলদল নেই ॥

(দিঘি, 'পালা-বদল' । অমিয় চক্রবর্তী)

যুদ্ধ, যুগমুহূর্ত ও আমরা

চার লাইনের একটি কবিতায় ব্রেশ্‌ট্‌ লিখেছিলেন :

সাধারণ লোকে ঠিকই বুঝতে পারে
যুদ্ধ কখন আসছে।
নেতারা যখন রেগে যুদ্ধের শাপ-শাপান্ত করে
যুদ্ধ তার ঢের আগে বেধে গেছে, সৈন্যসাঁজোয়ায়, নৌবহরে।

কবিতাটির নিহিতার্থ যদি ঠিক বুঝতে পেরে থাকি, সাধারণ মানুষের একটি স্নায়ব বোধি রয়েছে, কেননা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সে তার স্বেদরক্তের প্রত্যক্ষতা দিয়ে ছুঁয়ে আছে। জীবনযুদ্ধ অথবা যুদ্ধ বিষয়ে নিকটতম প্রতিক্রিয়া তার হৃদয়েই ঘটে। সাধারণ মানুষ এই কারণে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় যে তার কাছে যথাযথ অনুভূতিগুলি পাওয়া যাবে— যে-স্বাভাবিক ঝর্ণাতলায় বারাংবার ঘট ভ'রে নিতে আসতে হবে কবি, কথাশিল্পী, পটুয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক নেতা এবং আর সবাইকেই। যদি ঐ আবহমান উৎস থেকে জল ভ'রে নেওযার কাজে কখনো অবসাদ আসে তবে সেটা গভীর দুর্ভাবনার বিষয়। তখনি প্রশ্ন জাগে, জল কি ফুরিয়ে এল, নাকি ঘটের ভিতরেই ঘুণ ধরেছে ? কিন্তু জল কি কখনই ফুরিয়ে আসে ?

সাধারণ মানুষ বলতে গৃহস্থ মানুষকেই বুঝি। শিল্পীর নিবিড়তম যোগ তারি জীবনযাপনের বিন্যাসের সঙ্গে। শিল্পী বা অসাধারণ মানুষ সেই বিন্যাসের পৌত্তলিক উপাসক হয়েও একটি প্রাতিভাসিক বিচ্ছিন্নতা বরণ ক'রে নেন, 'পথিক যেমন চ'লে যায় গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।' তথা-কথিত পলাতক শিল্পব্রতীরও উপায় নেই সেই মহতী ধারাকে একেবারে এড়িয়ে যাবার, কেননা সেই তো অনন্তকালের মন্দাকিনী যাকে ঘিরে সমস্ত সময় শিশুর হাসির ছাঁদ, নারীর মুখের ডৌল, পিছন-ফেরা, দরোজার কাছে বাতি ধ'রে নিজস্ব পুরুষকে ঘরে-আনা, পুরুষের মেলা, হাঁটুতে মুখ গুঁজে ক্লান্তি, ভয়াবহ বঞ্চনা, পবিত্র ঈর্ষা, কৈশোরের প্রথম আবির, সেঁজুতি ব্রতের আল্‌পনা এবং অজস্র অনুভাব রণিত হচ্ছে। যদি ঐ অনুভাবপুঞ্জ তিনি পরিহার করেন, তার চেয়ে গর্হণীয় কোনো মৃত্যুই মানুষের থাকতে পারে না। আর যদি দ্বিতীয় হাতে

ঘুরে আসা উপকরণ দিয়েই তিনি কাজ চালিয়ে নিতে যান. তবে নিরাপত্তা তাঁর আত্মাকে হত্যা করবে। জীবন ও শিল্পকর্মের মাঝখানে শিল্পীর পক্ষে কোনো মধ্যস্থ গোমস্তা অথবা দালাল নিয়োগ করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেকটি অনুভূতি গৃহী মানুষের কাছ থেকে অর্জন ক'রে নিতে হবে। প্রত্যেকটি অনুভূতির হাজার লক্ষ যুগ বয়স হয়েছে, এবং প্রত্যেক গৃহী মানুষের সংসারের তোরণে তোরণে শিল্পী সে-সব অনুভূতির জাগর ধারারক্ষী। কেননা, গৃহস্থেরা যেমন নিজ নিজ অভিজ্ঞতার পাত্রে সেগুলিকে বহন করেছেন তেমনি অজস্রবার অবহেলায় অতি-ব্যবহারে অথবা অপপ্রয়োগে সে-সব নষ্ট ক'রে ফেলতেও তিনি সক্ষম, এই ঘটনা নিয়ত দেখা গেছে। গৃহীর সঙ্গে গৃহীর বিবাদ শরিকী স্বত্ব নিয়ে, কিন্তু এমন কোনো-কোনো বিষয় আছে যা একজনকে না দিয়ে অপরজনকে দিতে হয়, অথবা কাউকে না দিয়ে আলাদা ক'রে রেখে দেওয়া হয়। ঐ আলাদা ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে একটি tab বা চিহ্ন এঁকে, তাই তার নাম taboo, জানি না কোন্ কৌমকোবিদ এই taboo বা মাঙ্গলিক নিষেধাজ্ঞা প্রথম আরোপ করেছিলেন। তাঁর সম্ভ্রান্ত উদ্দেশ্য পুরুৎ-পাণ্ডার হাতে অসদুপায়ে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তিনি পূজনীয়। শস্যক্ষেত্রের উপরেও ঐ পবিত্র ও প্রতীকী নিষেধ আরোপ করতেন তিনি এবং ফসলের ঋতুতে তা প্রত্যাহার ক'রে নিতেন, কেননা, তা না হলে যে যখন খুশি নিজের অন্যায্য ইচ্ছা অনুযায়ী শস্যক্ষেত ব্যবহার করবে। অনুভূতির বিষয়গুলি এইভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ। শিল্পীর কাজ কখনো নিষেধ রচনা কখনো নিষেধ তুলে নেওয়া। প্রবৃত্তি ও প্রেম, রিরংসা ও আনন্দদান, কপটাচরণ ও সৌজন্য, হিংসা ও প্রতিযোগিতা, আত্মনিগ্রহ ও অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি প্রায় বিপরীতার্থক—প্রায়-বিপরীত বলছি, কেননা, সভ্য মানুষের মনে এদের আনুপাতিক মিশ্রফল কখনো কখনো ঘটা স্বাভাবিক—অভিপ্রায়ের দ্বৈতত্ব নিপুণভাবে রক্ষা করা তাঁর প্রধানতম কর্তব্য।

এ-জন্য কখনো বা তাঁকে ছদ্মবেশ পরতে হয়, অজ্ঞাতবাস নিতে হয়। কিন্তু সেই অজ্ঞাত অবস্থান কোনো অভিসন্ধি, পালিয়ে বাঁচা অথবা অনচ্ছ আবরণের দ্বারা চোলাই-করা হলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। ১৯০৫-এর বিপ্লবের প্রাক্‌মুহূর্তে এক রুশ শিল্পী-সংস্থা দ্বিতীয় নিকোলাসের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য মিস্টিক প্রবণতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন 'নীল গোলাপ'। বিষয়বস্তু নির্বাচনে সমকালীনতা বর্জিত হলো, অতিপ্রাকৃত ও

প্রকৃতির সমাবেশ ঘটল। এই ছদ্মবেশ এই দিক থেকে মন্দের ভালো যে, টিকে থাকাই যেখানে সমস্যা সেক্ষেত্রে চালাকি ক'রে— যেন কিছুই হয়নি, এই ভঙ্গিতে —বেঁচে থাকা এর দ্বারা সম্ভব ; কিন্তু এই চাতুর্য, পক্ষান্তরে, আত্মঘ্ন। সুন্দরের তপস্যার কোনো শর্ত নেই। এবং দ্বিতীয় সুন্দরকেও সুন্দর বলা চলে না। তাছাড়া মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকে সুন্দর যদি জন্ম নেয়ও, সেই সুন্দর বিকলাঙ্গ।

অনৃত শিল্পের চেয়ে আপাত-শিল্পহীনতা ভালো। সমগ্র গ্রাহকব্যূহ যেখানে ভুল বুঝতে ব্যগ্র এবং 'সুসাম্প্রদায়িকতা' (partinost) ও 'ব্রাত্য অবিবেক' এই দুই সুবিধেজনক শিবিরের মধ্যে শেষোক্ত শিবিরে বিবেকী শিল্পীকে নিক্ষেপ করতে উদ্যত, তখন শিল্পীর কোনো জবানবন্দীর প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না ; বরং যারা ভুল বুঝছে এবং অপরাধীর মার্কা এঁকে দিচ্ছে তাদের প্রতি শোভন অবজ্ঞাই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবাদ। রুশ সাহিত্যে এই প্রবণতার প্রথম ও সর্বান্ত্য স্তম্ভ যথাক্রমে র‍্যাডিশেভ ও পাস্তেরনাক। ফরাসি সাহিত্যে এর অপর উদাহরণ,— বলা বাহুল্য এখানে স্বনির্বাচনের প্রভূত অবকাশ রয়ে গিয়েছিল— আন্দ্রে জিদ। জিদের বিশ্ববিদিত la disponibilité বা অশরণপন্থা এই অসহায় যুগে ব্যক্তি মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সৌর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কিন্তু যুদ্ধ মানুষমাত্রের এমন এক অভিজ্ঞতা যা আমাদের প্রস্তুত হওয়ার সময় দেয় না। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমরা হয়তো প্রস্তুত হই, সহিষ্ণু ইস্পাত হয়ে উঠি। আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সুন্দরের ললিত পুষ্পল ধারণাগুলি আরো অনেক শিকড়স্পর্শী, অপর্ণ ও সত্যতর হয়ে ওঠে। উদাহরণ, উনগারেত্তির কবিতা হেমিংওয়ের উপন্যাস। দু-জনেই যুদ্ধজীবনের উপাদান শিল্পকাজে ভ'রে নিয়েছেন এবং মৃত্যু ও জীবনকে মিলিয়ে নতুনতর একটি আয়তনে উপনীত হয়েছেন। উনগারেত্তির যতিচিহ্নহীন একটি কবিতায এই অনর্পিত, সপ্রতিভ সাহসিকতা তীব্র নিখাদে ঝংকার দিয়েছে :

বরং ধ্বংস হয়ে যাও যথা সিন্ধুসারস
মরীচিকা সন্ধানে
কিংবা যেমন ভারুই পাখিটি
সাগর পেরিয়ে
পড়ে গিয়ে শুরু ঝোপের সারিতে
কারণ চায় না সে তো

আবার উড়তে আর
তবু না কভু না কান্নায় বেঁচে থাকা
সোনালি অন্ধ গাইয়ে পাখির মতো

আবার পুরুষকার, কীভাবে সর্বস্ব খুইয়ে ঈশ্বর অথবা প্রেমের অনতিরিক্ত বোধে ফিরে এসেও সর্বগ্রাসী মৃত্যুর সামনে আশ্চর্য নিরভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়, 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' উপন্যাসের উপসংহারে তার ভীষণ সুন্দর আলেখ্য আছে। 'এ যেন অকম্পিত মূর্তিটির কাছে বিদায় নেওয়ার মতো'—হেমিংওয়ের আঁকা এই শব্দচিত্র প্রমাণ করছে অসাড় পৃথিবীতে চৈতন্য শুধু আছে মানুষেরই, এবং সেইজন্য সমূহ পরাভবের মধ্যেও তার জিৎ।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভালেরি সন্দেহ করেছিলেন চৈতন্যকেও বজায় রাখা যাবে কিনা। কেননা তারপর 'আমরা জানি না, আর কী নতুনের জন্ম হতে পারে, তাই ভবিষ্যৎকে আমাদের ভয়। এমন-কিছু চিরদিনের মতোই নষ্ট হয়ে গেছে যা কোনো যন্ত্রের পরিবর্তনসাধ্য অংশের মতো নয়। সবচেয়ে অনপনেয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষের মন। নির্দয় আঘাতে সেই মন জর্জরিত হয়েছে। তার নালিশ বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে। নিজের উপরে সে শোচনীয় দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করছে, নিজেকেই শোচনীয়ভাবে সন্দেহ করতে শিখেছে সে।'

দেকার্তে যে সন্দেহ করতে শিখিয়েছিলেন তা বৃহত্তর বিশ্বাসের প্রতি, প্রতিটি অনুভূতি ও মননের মুহূর্তের প্রতি উন্মুখ। কিন্তু ভালেরিকথিত এই সন্দেহ চূড়ান্ত নাস্তিক্যের নৈরাজ্যে অর্থাৎ মনোহীনতায় বিপন্ন। এই মনোহীনতার অভিসম্পাত থেকে নিখিল মানুষকে বাঁচানো আজ কোনো শিল্পীরই সাধ্য নয়, কেননা অধুনাতন সমাজব্যবস্থায় শিল্পীর স্থান বড়ো জোর একটি অলংকারের মতো। কিন্তু দায়িত্ববোধ চৈতন্যেরই নামান্তর, সেই বোধ পরিবেশের কাছে হোক না যতোই অবান্তর। শিল্পীমাত্রকেই সেই দায়িত্বের বেদনায় বিদ্ধ হতে হবে।

কিন্তু প্রকরণ নামক একটি অনিবার্য অন্তরাল রয়েছে। সভ্যতার স্তর-পরম্পরা ও শিল্প-সংস্কৃতির অতীত পর্যায়গুলি পেরিয়ে মানুষ আজ যেখানে এসেছে সেই উপস্থিত মুহূর্তের একটি ভাষা বা ভঙ্গি আছে। অপসৃত যুগের কোনো মহাকবির ভাষা পুনরুক্ত করলে আজকের কবি মহান্ আখ্যা পাবেন না, যেমন সাম্প্রতিক চিত্রকার মুঘল রাজপুত কাঠামো কিম্বা অনতি-অতিক্রান্ত পশ্চিমী 'ভবিষ্যমার্গে'র চলচ্চিত্রণ নিপুণতম উপায়ে অনুকরণ করলেও শিল্পীর

অভিধা কথনোই অর্জন করবেন না। আজকের মানুষের কাছে আজকের ভাষায় কথা বলতে হবে। বহিঃশত্রু ঘরের দরজা ভেঙে ফেললে চারণ কবি মুকুন্দদাসের প্রেতাত্মার প্রতি আকস্মিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ক'রে গীতিকবিতা রচনার প্রয়াস পেলে বিদেশীকে যেমন তাড়ানো যায় না, স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যঐতিহ্য সম্পর্কেও কোনো যুক্তিশীলিত ভালোবাসা প্রকাশ করা হয় না। বস্তুত, মালার্মের কবিতা ও রবীন্দ্র-সংগীতের প্রেম-পূজা-প্রকৃতি ও স্বদেশের চতুষ্কোণী সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রবর্তনার পর মানুষের ভাষা বহির্বিষয়ের দ্বারা অধিকৃত হ'তে পারে না। এই মুহূর্তে স্বদেশ-বিষয়ক কবিতায় রঙলালের রাংতায় মোড়া কঙ্কপত্র নিক্ষেপ করলে কোনো অভীষ্টই সিদ্ধ হবে ব'লে মনে করি না। সুতরাং, দৃশ্যত 'স্বদেশী' পদ্যপ্রবন্ধ অপেক্ষা মূলত দেশাত্মবোধক কবিতা এখন আরো শক্তিশালী হ'তে পারে। শেষোক্ত রচনার নজির দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল-অতুলপ্রসাদের মতো আউল-বাউল-ভাটিয়ালির গানেও মিলবে, কেননা বঙ্গসংস্কৃতির মিশ্র নকশাটির মধ্য দিয়ে পরোক্ষে সে-সব ক্ষেত্রে দেশের মাটির জন্য আতি প্রকাশ পেয়েছে, যেমন প্রচ্ছন্ন অথচ সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে, জীবনানন্দের রূপসী বাংলার সনেটপ্রবাহে। ইন্দ্রিয়ের পরাগে পরাগে ঘ্রাণ স্পর্শ স্মৃতি শব্দের মিলিত মন্দিরায় যে-দেশের নাম হৃদয়ে হৃদয়ে বেজে রয়েছে তাকে আজ আর অন্যভাবে বাইরে থেকে উদ্রিক্ত করা অনৈতিহাসিক। এমন কয়েকটি কবিতার নাম মনে পড়ছে যেগুলি ঐ সুনিহিত উৎসে প্রার্থিত আঘাত করেছে: পিছু-ডাকা (ছড়ার ছবি, রবীন্দ্রনাথ), প্রবাসী (অমিয় চক্রবর্তী) সুচেতনা (জীবনানন্দ দাশ), জল দাও (বিষ্ণু দে), ১৯৪৫ (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), অন্ত্যতনী পদ্য (অজিত দত্ত), ভৌগোলিক (প্রেমেন্দ্র মিত্র), সমর্পণ (বুদ্ধদেব বসু), ছয় ঋতু সঞ্চয় করি (অরুণ মিত্র), সালেমনের মা (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) শুকনো মুখ উস্কোখুস্কো চুল (মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়), স্বপ্নকোরক (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) ভিসা অফিসের সামনে (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), তোমারো আমারো (জগন্নাথ চক্রবর্তী), আমার মাকে (সিদ্ধেশ্বর সেন), সেই বোষ্টমের ছেলে (অরবিন্দ গুহ), প্রাচীন নিখিল (শঙ্খ ঘোষ),— এক আঁচড়ে আঁকা মানচিত্রের এই সব দৃষ্টান্তস্থল আমার এই বক্তব্য প্রমাণ করছে যে কার্যত আজ পরোক্ষ স্বদেশ-কবিতাই প্রত্যক্ষতম প্রয়োজন মেটাতে পারে। সামগ্রিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের নাম স্বদেশ এবং তারি কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশাত্মবোধক ব'লে চিহ্নিত হ'তে পারে।

ঈসকাইলাস একই সঙ্গে ম্যারাথনে লড়েছিলেন এবং চিন্তাজীবী মনুষ্যত্বের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁর এপিটাফ সেই তাঁর অমরতার শিলালেখ হয়ে রয়েছে। আমরা স্বভাবতই খণ্ডিত। আজ সেই অর্থে কোনো সব্যসাচী শিল্পীর জন্মের আশা দুরপরাহত। এবং ইতিমধ্যে আমার দেশ জুড়ে যে মানসিক ক্ষতি ঘটে গিয়েছে তা অচিরে পূরণ করার সাধ্য ঈশ্বরেরও নেই। অন্তত দেশ-বাসীর মন থেকে যে-সব চিন্ময় অনুভব নষ্ট হয়েছে, হতে চলেছে, সেগুলিকে ধুয়ে মুছে পূজার থালায় সাজিয়ে তুলবার ঝুঁকি নিতে পারলেই আমরা বিবেকের কাছে অনপরাধ হতে পারব।

শ্রোতৃসাযুজ্য

সত্য সূচিত হয় দু-জনকে নিয়ে। —নীৎসে

সবাই তো জানে হলুদ, কমলা আব লাল রং বলতে আনন্দ আর প্রাচুর্য বোঝায়। —দলাক্রোয়া

সমস্ত শিল্পের মধ্যে নাটকই সবচেয়ে বেশি সাযুজ্য (communication) খোঁজে। তুলনায় আর-সব শিল্পধারাই অনেক বেশি আত্মগত। অথচ অত্যন্ত একটি স্বগত নাটকেরও লক্ষ্য প্রধানত একটি জনঘনিষ্ঠ অডিটোরিয়াম বা শ্রোতৃসমাজ। ঐ সমাজের তাৎক্ষণিক অনুমোদন না পেলে নাট্যশিল্পীর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে যায়। আর ঐ মুহূর্তমায়া পর্যাপ্তরূপে সম্পন্ন হলেও অনতিভবিষ্যতেই সাযুজ্যের স্তরগুলি অনেকাংশে ম্লান হয়ে আসে। এই অর্থে গ্রীক নাটক রোমক সমাজে তার অখণ্ড তাৎপর্য হারিয়ে ঝাপসা হয়ে এসেছিল।[1] আজ আমরা সাহিত্য-মনীষার সাহায্যে সেই নাটকের মহান্ কি রহস্যময় পটভূমি যতোই আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি না কেন, সময়ের ক্ষমাহীন ব্যবধানে গোটা ব্যাপারটা বড়ো জোর একটা বিষণ্ণ মর্যাদা লাভ করে, তার বেশি কিছু নয়। একজন সমালোচক ঈস্‌কাইলাসের 'তর্পণ-সেনাদল' (কোয়িফোরয়) নাটকের মর্মার্থ অনুধাবনের জন্যে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সেই যুগে পশ্চিম ইয়োরোপে প্রচলিত ধর্মাচারগুলি ভালো ক'রে বুঝে নিতে হবে।[2] কিন্তু লুপ্তপ্রচল রিচুয়্যালের পর্যালোচনা কোনোক্রমেই কতোগুলি ক্ষতি পুরিয়ে দিতে পারে না। সমাধিস্থ আগামেম্নেনের আত্মিক শক্তি নষ্ট হয়নি, কিংবা মন্ত্র আবৃত্তি করার সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত মানুষ বেঁচে ওঠেন, এই ধরনের সংস্কার সচেতনভাবে যতোই কর্ষণ করা যাক, ধ্রুপদী নাটক আজকের জগতে তার প্রত্যাশিত অভিঘাত কখনোই আনতে পারবে ব'লে মনে হয় না।

তা সত্ত্বেও যুগজয়ী নাটক কালান্তরে সাড়া জাগায়। নাট্যকার যদি অমোঘ

১ শিমলায় ১৯৬৭তে অনুষ্ঠিত *Modernity and Contemporary Indian Literature* শীর্ষক সেমিনারে শম্ভু মিত্রের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ঐ নামে প্রকাশিত সংকলনের ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, ঈসকাইলাস, ১৯৪৩, পৃ ৭৩।

একটি ইডিয়াম বা শিল্পভাষা রচনা করতে পেরে থাকেন, সেই স্বরলিপির উপর পরবর্তী পরিচালক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, যদিও সেই প্রাণ নতুন প্রাণ। সেই কাঠামোর ভিত্তিতে শক্তিশালী অভিনেতা অনুবাদকের মতো নতুন স্বর আরোপ করেন আর দর্শক সেই স্বরায়ণ থেকে নিজের কালোচিত স্বভাবস্নায়ু অনুযায়ী একরকম মানে ক'রে নেন। যেখানে ভাষার কাছ থেকে কোনো সহায়তা পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থান্বয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছু বিপত্তি ঘটতে পারে। আমাদের প্রাচীনতম নাট্যনমুনা 'কংসবধ' অভিনয়কালে— মহাভাষ্যের মতে—গ্রন্থিকেরা দু-দলে বিভক্ত হতেন: কৃষ্ণ আর তাঁর দলের নটেরা তাঁদের মুখ লাল রঙে রাঙিয়ে নিতেন, কংস আর তার অনুচরবর্গের মুখ থাকত কালো রঙে আবৃত। এই বর্ণ প্রলেপের ব্যবহার থেকে যখন কীথ্‌ গ্রীক নাটকের অনুষঙ্গে এতোদূর অনুমান ক'রে বসেন যে এ আসলে দারুণ শীতের বিরুদ্ধে গ্রীষ্ম কিংবা বসন্তের জয়ের প্রতিভাস, আমরা বিপন্ন বোধ করি। অথচ এই ধরনের দূরান্বয়ী ব্যাখ্যা অসংগত হলেও অস্বাভাবিক নয়।[৩] যে-নাটকে প্রাকৃত মুদ্রা ভাষার চেয়ে অধিক প্রাধান্য পায় তার গূঢ় ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ গলদঘর্ম হয়ে ওঠেন ব'লে তাঁদের অপরাধী করা চলে না।

কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি যে এক অর্থে দুরূহ তার কারণ তাদের মুদ্রার দুর্গমতা নয়, ভাষার প্রাণময় জটিলতা। লোপ দে ভেগা, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথের নাটকের অজস্র সঙ্কেত আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। স্পেনীয়, ইংরেজ ও বাঙালি এই তিনজন নাট্যকারের ভাষাতেই তাঁদের এক একটি নিজস্ব সংস্কৃতির বোধ শব্দশরীর নিয়ে বলয়িত হয়ে রয়েছে। যদি এই তিনটি সংস্কৃতির পুঞ্জিত উত্তরাধিকার অঙ্গীকার ক'রে নেওয়া যায় তাহলে হয়তো এঁদের নাটকগুলি আমাদের সংবেদন স্পর্শ করতে একদিন সক্ষম হবে। তার বদলে আমরা সহজাত অনুভূতি কিংবা টিপ্পনী মণ্ডিত বিশ্লেষণ করলেও এই রচয়িতাদের ভাববিশ্ব নিরূপণ করতে পারব না।

বিংশ শতাব্দীতে অবশ্যই সদ্যকথিত এই সরলীকরণ ততোটা অনিবার্যতা নিয়ে আসে না। আজ শুধু নাট্যকারের স্বদেশসংস্কৃতি বা তাঁর দেশজ ভাষায় আধারিত মূল্যবোধ বুঝতে পারলেই তাঁর নাটকের রহস্যোদ্ধার দর্শকের পক্ষে

৩ William Ridgeway, *The Drams and Dramatic Dances of Non-European Races in special reference to the origin of Greak Tragedy*, 1915, p. 140

সম্ভব নয়। বরং এ-রকম একাধিক সার্থক আধুনিক নাটক আমাদের চোখের সামনে রয়েছে যেগুলি সেই সব নাট্যকারের স্বভাষাভাষী অঞ্চলে ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন না ক'রে অন্য ভাষাঞ্চলে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অ্যাল্‌বির 'জু স্টোরি' লেখার এক বছরের মধ্যেই প্রথম জর্মানিতে এবং তারও মাস ছয়েক পরে আমেরিকায় অভিনীত হয়। এই সূত্রে অ্যাল্‌বি মন্তব্য করেছেন 'এর পর থেকে আমার ক্রমাগত মনে হয়েছে আমি জানি না এমন সব ভাষাতেই আমার নাটক একটি মর্ম নিয়ে পৌছতে পেরেছে, ইংরেজি ভাষায় ততোটা নয়।'

বস্তুত আজ নিখিল সংস্কারমুক্তির শতকে এই ধরনের সাযুজ্য অবাস্তব নয়। কিন্তু সারা জগতে যোগাযোগের মাত্রা যতোই গভীর, ব্যাপক ও ত্বরান্বিত হচ্ছে, আজকের মানবচরিত্র সেই অনুপাতেই তার নিকটপরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ হারাবার উপক্রম করেছে। সন্দেহ নেই, নিরাপত্তা/অভ্যস্ততা প্রভৃতি কিছু জৈব হেতু এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ তার নিকট পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই পরিবেশের সঙ্গে একাত্মক সাযুজ্য সে চিরদিনের মতো হারিয়েছে। তাই এই যুগের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে প্রাণিক বিনিময় অসম্ভব নয়, কিন্তু ভীষণ কঠিন তার চিরপরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগ রচনা। বেকেটের নাটকে আমরা এই সমস্যার সার্থকতম শিল্পায়ন দেখেছি। এই পর্যায়ের নাটকে প্রায় একই ভাষার পৌনঃপুনিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে দু-জন পরিচিত বা দৈবাৎ-ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যে খুব আস্তে একটি সংযোগসেতু গ'ড়ে উঠতে থাকে। মন্ত্রের ধ্রুবতা না থাকলেও এখানে মন্ত্রেরই সম্মোহ থাকে যার ফলে পরিবেশের সমস্ত অর্থ-শূন্যতার মধ্য থেকে যেন একটি নিহিতার্থ ক্রমশ ক্ষোদিত হতে থাকে, হয়ে ওঠে। এই সূত্রে বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' থেকে সীতানাথ-শরদিন্দুর একটুখানি সংলাপ :

সীতানাথ ॥ তেরো বছর আগে জীবনের আরম্ভ। আর জীবনের শেষ। আবার নতুন অর্থ খোঁজা। আবার নতুন প্রতিজ্ঞা খোঁজা। নতুন জীবনের আরম্ভ। রাশি রাশি ছাত্র সারি বেঁধে ব'সে আছে। সারি সারি বেঞ্চি। বেঞ্চিতে সারি সারি ছাত্র। অধ্যাপকের দিকে চেয়ে আছে। কতো অধ্যাপক।

শরদিন্দু ॥ আমিও কলেজে পড়াই। আশ্চর্য! আজ তেরো বছর হলো।

সীতানাথ ॥ তেরো বছর ধ'রে রাশি রাশি ছাত্র। সারি সারি বেঞ্চিতে

রাশি রাশি ছাত্র। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। একই বেঞ্চি। একই বক্তৃতা। নতুন মুখ। পুরনো মুখ। যেন একই ছাত্র। বছরের পর বছর। এক বছর। দু বছর। কণার সঙ্গে দেখা।

শরদিন্দু॥ দু বছর?

সীতানাথ॥ এগারো বছর আগে কণার সঙ্গে দেখা। স্কুল টীচার কণা।

শরদিন্দু॥ স্কুল টীচার? বাসন্তীও স্কুলে পড়াতো।

সীতানাথ॥ স্কুল টীচার কণা। রাশি রাশি ছাত্রী। সারি সারি বেঞ্চিতে বসা রাশি রাশি ছাত্রী। অথচ কণা তরুণ। অথচ কণা সজীব। কণা উজ্জ্বল। কণা উৎসুক। কণা জীবনের অর্থ। নতুন জীবনের অর্থ। ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থ...

শরদিন্দু॥ বাসন্তী! (উত্তেজনায়) এ তো—এ তো আমার গল্প!! বাসন্তী!

পিণ্টারের চরিত্রেরা অনেক সময় বিচ্ছিন্ন, অর্থহীন বাক্যাংশ কিংবা বাক্যের মাধ্যমে অসহায়ভাবে পরস্পরের কাছাকাছি উঠে আসে, দুই চরিত্রের শব্দসন্ধান (যা আপাতদৃষ্টিতে প্রথাশ্রিত নাট্যভাষার অভাব) দর্শকদের মধ্যে বিস্তারিত হতে থাকে, চরিত্র ও দর্শকের মধ্যে সংবদ্ধতার অভাব এবং উদ্বেগ যেন সমানুপাতে বিভাজিত হয়ে যায়, অনিশ্চয়তার মুখে পারস্পরিক সাযুজ্যই একটি নতুন প্রমূল্য হয়ে ওঠে।[৪]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংক্রান্তিকাল থেকেই এই নতুন ভঙ্গির সাযুজ্য নাটকে জায়গা জুড়েছে। ১৯৪০-এ ইয়োনেস্কোর জর্নালের এই অংশ প্রসঙ্গত স্মর্তব্য :

> তারাই শুধু কথা বলবার কিংবা লিখবার যোগ্য যাদের কিছু কথা বলার আছে। প্রত্যেকেরই কিছু বলার রয়েছে। আমি প্রত্যেকে, অথবা আমি প্রত্যেকের অন্তর্গত। আমার কিছু বলার আছে। এটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়। যারা শুধুই আর সকলের মতো তাদের কিছুই বলার নেই, কারণ সবাই তো তাদের কথাই বলছে। আমাদের প্রত্যেকের অর্ধেকটা যেন সবাই, আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, আমাদের মধ্যে একটি অংশ নিশ্চয় আর-সবাই; অর্ধেক অন্য-সকলে, অর্ধেক আমরা নিজেরা। আমাদের ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে হবে। অন্য মানুষদের সঙ্গে বৈষম্যের মধ্যেই আমার পরিচয়, আমার সঙ্গে বৈষম্যেই অন্য সবার অস্তিত্ব। আর এই প্রত্যক্ষ

৪ Richard Schechner, 'puzzling Pinter', *British Theatre* 1956-66, p. 177

সামীপ্য (confrontation) এই সাম্যাবস্থায় আমার ব্যক্তিগত সত্তা রচিত হতে থাকে।[৫]

বিজ্ঞানজগতে ব্যক্তি ও শ্রোতার মধ্যে এই যোগাযোগ প্রায় গত একশো বছর ধ'রে যেন একটা পরিকল্পিত বিন্দুর দিকে বিবর্তিত হয়েছে। ১৮৭০-এ টেলিফোনের সাহায্যে দূরান্তরে স্বর প্রেরণের সূচনা ; ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার ; বেতারযোগে সম্প্রচার ১৯২০ ; ফিল্মে শব্দসংযোজনের সাফল্য : ১৯২০ ; টেলিভিসন : ১৯৩০ ; চৌম্বক টেপরেকর্ডিং : ১৯৪০ ; ভিডিও-টেপরেকর্ডিং : ১৯৫০।[৬] এই ক্ষিপ্র অগ্রগতির ইতিহাসে নাটক দৃশ্যত পিছিয়ে থাকলেও বিবিক্ত হয়ে থাকেনি। বিশ্বসাহিত্যের গত তিন দশকের নাট্যকারদের ভাষা-জিজ্ঞাসার মধ্যেই স্বরপ্রক্ষেপ, ব্যক্তিত্বের অভিক্ষেপ, যান্ত্রিকতা, সংগীতের পরিমিত যাথার্থ্য প্রভৃতি প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষ একটি চেতনা দেখা দিয়েছে যা ইতিপূর্বে ছিল না। নাট্যভাষা এতোদিন বোধগম্যতার স্তরেই প্রধানত আবদ্ধ ছিল। আধুনিক কবিতা, ছবি ও গানের ফলশ্রুতি নিয়ে বিশ্বনাট্য এখন ভাষার অন্তঃশরীরে তার ব্যঞ্জনাকে গচ্ছিত রাখতে চেষ্টা করছে। সম্ভবত টেনেসি উইলিয়ামস্-এর মতো আর কেউই আধুনিক কবিতার কাছে নাটকের এই নতুন নন্দনতত্ত্বের অস্তিত্ব-ঋণ স্বীকার করেননি। আর্চিবল্ড ম্যাকলীশের 'a poem shall not mean but be' সূত্রটি ব্যবহার ক'রে লেখা তাঁর 'ক্যামিনো রিয়্যালি' নামক প্রায় অ্যাবসার্ড নাটকটির শেষে কিল্‌রয়ের আর্তির উত্তরে জ্যাক বলছে : 'আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, ভাই'। এই বুঝে নেওয়া ব্যাপারটা ঘটছে যেন মূকবধির বিনিময়ের পরিবেশে, যখন একজন তার আপেক্ষিক ব্যক্তিত্বকে বৃহৎ ব্যক্তিত্বের কাছে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছে এবং গহন ভাষা ও আচরণ বিধির মধ্য দিয়ে। বর্তমান বস্তুবিশ্বের যাবতীয় অসংগতিকে এক ধরনের আপাত-বিশৃঙ্খল ইডিয়মের সাহায্যে তছনছ ক'রে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জীবনের একটি ইঙ্গিতসংকুল তাৎপর্যকে ধারণ করাই আজকের এই নব্যনাট্যের অভিপ্রায়।

মানবসংলাপের ব্যবহারিক (behaviouristic) মূল্য আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি। কিন্তু মানবব্যবহারে আজ অর্ধমনস্ক সপ্রতিভতার সঙ্গে অন্তর্মুখিতার মিশ্রণ নানা মাত্রায় প্রকট। সুতরাং কোনো অর্থলুব্ধ দর্শক যদি

আজকের কোনো নাটক দেখতে এসে অভিধা-অর্থ খুঁজে না পান, তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। স্ট্রিণ্ডবের্গ বা মেটারলিঙ্কের নাটকের কবিত্বনিবিড় সাংকেতিকতা সত্ত্বেও একটি সুবিধে ছিল তাদের পুরাণপ্রতিমা কিংবা কথাবস্তুর সাবয়ব বিন্যাস। প্রাচীন নো-নাটকের দর্শকের হাতের কাছে থাকত নাটকের প্রতিলিপি যার সাহায্যে অর্থোদ্ধার তার পক্ষে সহজতর হতো। আধুনিক নাটক সে-রকম কোনো নির্দেশপঙ্ক্তি দর্শকের হাতে তুলে দেয় না, কারণ ব্যবহৃত সমস্ত অর্গলকীলক ইতিমধ্যে অব্যবহার্য হয়ে এসেছে। আজকের যেকোনো নিরীক্ষাবাদী নাট্যকার / প্রযোজকও এ-কথা জানেন যে কোনো প্রচলিত তত্ত্ব কিংবা বক্তব্য দিয়ে দর্শককে 'শিক্ষিত' করার চেয়ে তার সঙ্গে একটি সমগ্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমবেত একাকিত্ব সত্ত্বেও একযোগে অনধীত জীবননিয়তির সতীর্থ শিক্ষার্থী হতে পারাই যথার্থ গৌরবের। তাঁকে মনে রাখতে হবে, এই সমানুভূতির মধ্য থেকে একটি অর্থঘন বস্তু খুঁজতে গিয়ে সর্বক্ষণ তাঁর প্রতিটি জটিল চলন-বলন অব্যর্থ উচ্চারণ ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে, ভাষ্য ক'রে বুঝিয়ে দিলে চলবে না।